আঁটসোলা বেলা

নীলকণ্ঠ

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ছয়

কর্তৃক প্রকাশিত। ৯ বাবুবাগান স্ট্রীট কলকাতা ৬

●

নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কসের পক্ষে শ্রীকালীপদ নাথ
কর্তৃক মুদ্রিত। ৬ চালতাবাগান লেন কলকাতা-৬

●

দাম সাড়ে ৬ টাকা

টেনিস বলটা এসে পড়ল এপাড়ার সব চেয়ে নির্জন, সব চেয়ে সুন্দর, সব চেয়ে নাম করা বাড়ি 'আইসোলা বেলা'র বিরাট লন পেরিয়ে বস্তির মধ্যে। বাড়ির পেছনে লন; তার দেওয়ালের পর দারুণ সরু নর্দমা-গলি। তারপর এপাড়ার সব চেয়ে হাল্লাটে সব চেয়ে নাম করা বস্তি ঝিদের। বলটা নিতে এল যে বল-কুড়ুনিয়া বাচ্চা ছোঁড়া একটা, সে ফিরে গেল খালি হাতে।

কি রে বল?

দিলে না—

কে?

একটা পাজি, বজ্জাত মেয়ে—

তার বলার ধরনে বোঝা যায় এবাড়ির টেনিস বল কুড়ুনিয়া গোবিনের প্রেস্টিজে দারুণ লেগেছে। আইসোলা বেলার টেনিস লনের বল কুড়োয় সে। সেই বল দিতে মুখের ওপর না বলে দিতে পারে বস্তির একটা নেহাৎই বাচ্চা মেয়ে, গোবিনের পক্ষে এতই অভাবিত, এত অপ্রস্তুত, এত ছি ছি ব্যাপার যে তার মুখখানা নীলবর্ণ শেয়ালের মুখের মতো লাগছিল।

আইসোলা বেলা-য় টেনিস র‍্যাকেটের, বলের এবং আনুষঙ্গিক কিছুরই অভাব হবার কথা নয়; অভাব ছিলও না। তবু লনে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে সব চেয়ে বয়সে ছোটো, আইসোলা বেলার একমাত্র ভবিষ্যৎ, যাকে সবাই তার ডাকনামে ডাকে, প্রিন্স বলে, সে ফস করে গেট পেরিয়ে যেতে যেতে বললে, গোবিন আয় তো আমার সঙ্গে।

বস্তির মধ্যে পা দিয়েই থেমে গেল প্রিন্স। সেই পাজি মেয়েটা দাঁড়িয়ে। গোবিন পেছন থেকে চেঁচাল ; ওইতো, ওইতো লুকিয়ে রেখেছে বল—

দেখো না, কোথায় লুকিয়েছি—, বুকের ওপর থেকে শাড়ি সরিয়ে নেয় মেয়ে আসামী। একুশ বছরের প্রিন্সের চোখে পৃথিবীর রং পালটায়। লজ্জায় আর উত্তেজনায় টকটকে লাল হয়ে যায় তার মুখ। রক্তের আর লজ্জার রং লাল।

বস্তির ভেতর থেকে আধা বুড়ি একজন বেরিয়ে আসে চেঁচামেচিতে। এসেই প্রিন্সকে দেখে বলেঃ দাদাবাবু তুমি! বুড়িটাকে প্রিন্স বাড়িতে কাজ করতে দেখেছে। গোবিন তাকে দেখে বলেঃ দাদাবাবুর বল লুকিয়ে রেখেছে—

বুড়ি সেই বজ্জাত মেয়েটার দিকে ফিরে বলেঃ দিয়ে দে বল আগে, তারপর তোকে দেখছি আজ—

না, না। ওকে কিছু বোলো না। একুশ বছরের প্রিন্সের গলা গোলাপের মতো নরম হয়ে আসে। বজ্জাত মেয়েটা প্রিন্স আর গোবিনের দিকে পিঠ দিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর ব্লাউসের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বার করে আনে বল। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুড়ে দেয় প্রিন্সের দিকে সেটা।

হাতে এসে পড়তে প্রিন্সের মুখ আবার লাল হয়। টেনিস বলটা মেয়েটার বুকের ঘামে ভিজে গেছে।

হৈ হৈ করতে করতে আইসোলা বেলার লনে এসে ঢুকল গোবিন। লেখাপড়া না করেও শুধু রিডার্স ডাইজেস্ট পড়বার মতো অক্ষর পরিচয় থাকলেও গোবিন বলতে পারতঃ ভিনি, ভিডি, ভিসি। তার বদলে বলটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লুফতে লুফতে বলল: ঠিক হয়েছে! যেমন পাজি—

কি ঠিক হয়েছে?

মেয়েটাকে খুব ঠেঙাবে বলেছে ওর মা। যাই দেখে আসি

গিয়ে—চোখের পলক পড়বার আগেই আইসোলা বেলার লনের গেট টপকে গোবিন্দ হাওয়া।

সারা রাত ঘুমোতে পারল না প্রিন্স আইসোলা বেলায় তার তিন-তলার নীল আলো জ্বালা রবীন্দ্র সঙ্গীতে লালিত ঘরে যে ঘরকে প্রিন্সের মেয়ে বন্ধুরা বলে ব্লু এঞ্জেল। সব নীল ঘর। দেওয়ালের আর পর্দার গা সোফার পিঠ আর বসবার জায়গা নীল রংএ ঢাকা। মধ্যরাত্রির নিশীথ নীল আকাশের এক টুকরো এই ঘর।

দক্ষিণ সমীরে ফুলের গন্ধে উতলা সেই ঘরে দম আটকে এল আজ প্রিন্সের। বস্তির সেই ঝিয়ের মেয়েটা। কি সরু কোমর, কি উদ্ধত বুক তার। পেছন ফিরে যখন দাঁড়িয়েছিল তখন ওর নিতম্ব যেন ওর বুকের জবাব। রক্তে উত্তেজনার জোয়ার এনেছে প্রিন্সের ওই অনবদ্য শরীরের উচ্ছ্বসিত আমন্ত্রণ। ওই মেয়েটির তুলনায় তার সমাজের সুন্দরী মেয়েরা কি আশ্চর্য নিষ্প্রাণ। ওই বস্তির তুলনায় এই ঘরের মতো। নোংরা নর্দমার জল বয়ে যাওয়া অন্ধকার অপরিচ্ছন্ন ওই বস্তি ঢের বেশি জ্যান্ত। এই ঘর মেক আপ করা। মেক-বিলিভ। ওই বস্তি ছাড়া মেয়েটাকে ভাবা শক্ত প্রিন্সের। সূর্যরিক্ত অরণ্য ছাড়া হিংস্র শ্বাপদের সঙ্গে সাক্ষাৎ যেমন অর্থহীন। এমন উদ্দাম প্রাণবন্যাকে সমাজের চারদেওয়াল দিয়ে বাঁধবে কে? বুনো ফুলকে যেমন মানায় না সুন্দর ফুলদানির খাঁচা, ড্রয়িং রুমে তেমনই ধরে না বস্তির উদ্দাম উল্লাসকে। কি যে মেয়েটার নাম, তাও জানে না প্রিন্স। শুধু জানে, এই মুহূর্তে তার মতো যন্ত্রণায় আর জানে কে, পেতে হবে ওকে। ওই সরু কোমর, উদ্ধত বুক, ওই পেছনে উঁচু ঢিবি,—দুর্বার কামনায় রক্ত তোলপাড় করে দেওয়া দুরন্ত ওই দামাল নদীতে নামতেই হবে প্রিন্সকে। দেখতেই হবে ওর তল খুঁজে পাওয়া যায় কি না।

কিন্তু কি অছিলায় বস্তিতে আবার যাওয়া যায়, ভেবে পায় না প্রিন্স। ড্রয়িং রুমের ফুল হলে যত মহার্ঘ ড্রয়িং রুমই হোক, যতই

নিষেধের কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে থাক দুর্লভ কোনও ডালিয়া, তাকে তুলে আনব মনে করলে তুলে আনতে পারে প্রিন্স, প্রিন্স তা জানে। বাপের টাকা, নিজের চেহারা আর রমণী মৃগয়ায় দারুণ লাক তার এ খেলায় মাতবার প্রথম দিন থেকেই। আজ থেকে দুবছর আগে তার প্রথম মৃগয়ায় যে হরিণ স্বেচ্ছায় তার জালে জড়িয়েছে, প্রিন্সদের বেহালার বাড়িতে ভাড়া থাকে সে। তার নাম ডলি। প্রিন্সের চোখে ডলিই প্রথম পড়েছিল তার মনের খবর। প্রথম মেঘের প্রতীক্ষায় চাতকের ছটফট করা লক্ষ্য করেছিল ডলি অনেকদিন। কিছু বলেনি সে। প্রিন্সের বয়স তখন উনিশ। ডলির সাঁইত্রিশ।

তারপর একদিন। একতলার অন্ধকার ঘরে নির্জন মধ্যাহ্নে, প্রিন্সের একটা ছেলেমানুষির চেষ্টার প্রায় শুরুতেই হাত দুটো ধরে ফেলেছিল ডলি। বলেছিলঃ তুমি তো ছেলেমানুষ নও প্রিন্স। বুকের মধ্যে হাজার হাতুড়ির ঘায়ে হাঁফাচ্ছিল প্রিন্স। তবুও কোনও রকমে বলেছিলঃ ছেলেমানুষ নই বলেই তো—।

আকাশের নীল নয়নের কোণ হঠাৎ ভরে গিয়েছিল জলে। ডলি প্রশ্ন করেছিল অন্ধকার নির্জনে; তুমি কি আমায় ভালোবাসো প্রিন্স ?

হ্যাঁ। প্রিন্সের গলা কাঁপছিল। ভয়ে নয় কেবল। শুধু উত্তেজনার কারণেও নয়। এত বড় মিথ্যে তার চেয়ে বয়সে অনেক বড় ডলিকে বলতে তার বাধছিল। ডলির বলে নয়, ডলির চেয়ে বয়সী শরীরও তখন প্রিন্সের কাছে তুচ্ছ নয়। নিষিদ্ধ কৌতূহল নিবৃত্তির রক্তিম মরীচিকা সেই হাতছানি দিয়েছে প্রথম উনিশ বছর বয়সে। 'না' বললে যদি সেই মরীচিকা মিলিয়ে যায় শূন্যে, তাই ভয়ে তাড়াতাড়ি বলেছিল, হ্যাঁ!

ডলি কেন, যে কোনও বারো বছরের মেয়ের কাছেও প্রিন্সের 'হ্যাঁ' যে মিথ্যে, দারুণ ঘৃণ্য জঘন্য মিথ্যে, তা বুঝতে এতটুকু দেরি

হবার কথা নয়। তবু ডলি তা মিথ্যে মনে করেনি। প্রথম যুগের বিখ্যাত বাঙলা উপন্যাসের নায়িকার সংলাপের প্রতিধ্বনি করেছিল তৎক্ষণাৎ, তাহলে আমরা দুজনেই ডুবলাম।

ডলিই প্রিন্সের প্রথম অভিজ্ঞতার উদ্যোগ পর্ব না হলে অর্থাৎ দুবছর পরের প্রিন্সের অন্যতম খেলনা হলে, প্রিন্স হেসে ফেলত ডলির মুখের ওপরেই, ডলির মুখে ওই উনবিংশ শতাব্দীর ক্লাসিক সংলাপের অনিবার্য অবিমৃষ্যকারিতায়।

ডলি এসেছিল প্রিন্সদের বেহালার বাড়িতে নোয়াখালি দাঙ্গার পর রিফ্যুজি হয়ে। প্রিন্সের বাবাকে পড়াতেন ডলির স্বামী। প্রিন্সের বাবার চেয়ে দু এক বছরের বড় ডলির স্বামী। ডলির সঙ্গে তার বয়সের তফাত প্রায় আঠার-উনিশ বছরের। বাচ্চা ছিল তিনটে যখন প্রিন্সের বেহালার বাড়িতে প্রিন্সের বাবা দয়া করে থাকতে দেন গুরুপত্নীকে। ডলির চেয়ে ডলির স্বামী তখন ঠিক বয়সে যত বড়, প্রিন্স তখন ডলির থেকে ঠিক ততখানি ছোটো!

বেহালার বাড়িতে ডলি আসবার পরও প্রিন্সের মনে কোনও দিন ঝড় ওঠেনি। ঝড় ওঠবার কথাও নয়। ঘোমটা দেওয়া, ডিসফিগার্ড, জড় পুতুলের চেয়ে ডলিকে তার বেশি কিছু মনে হয়নি কোনওদিন। একদিন একেবারেই অ্যাকসিডেন্টালি ডলি র কোলে শোয়া বাচ্চাকে আদর করতে গিয়ে গায়ে হাত লেগে যায় প্রিন্সের। হাত সরিয়ে নেবার আগেই, ডলি তাকায় তার বড় বড় দুটো চোখ তুলে প্রিন্সের দিকে।

ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল প্রিন্স প্রথমে। ডলি হেসেছিল, তার বড় বড় সাদা ঝকঝকে মাজা দাঁত বার করে হেসেছিল। প্রিন্সের ঘামে ভিজে ছোট হাতের চেটো তুলে নিয়েছিল নিজের কর্কশ বাঘের থাবায়। চাপ দিয়েছিল অল্প একটু। আশ্বস্ত হয়েছিল প্রিন্স। জীবনে প্রথম উত্তেজনার আশ্বাসে সাংঘাতিক দিগ্বিজয় মনে হয়েছিল ব্যাপারটা। যদিও তখনই কিছু গড়ায়নি আর ঘটনা। দুটো দিন

আরও অপেক্ষা করতে হয়েছিল প্রিন্সকে। কখনও মনে হয়েছিল পুরো ব্যাপারটাই তার কল্পনা। কখনও মনে হয়েছিল, না, ডলি তাকে নিরাশ করবে না কিছুতেই। দারুণ উত্তেজনায় কেটেছিল আটচল্লিশ ঘণ্টা। শেষে সেই অঘটন ঘটে যাবার পর প্রিন্সের যতখানি খুশি হবার কথা কেন যে তার তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর মনে হয়েছিল অভিজ্ঞতাকে আজ বস্তির মেয়েটাকে দেখে তার জবাব এতদিনে খুঁজে পেয়েছে সে। সমুদ্রের সঙ্গে পুকুরে স্নানের যে দুস্তর ব্যবধান এই বস্তির মেয়েটার সঙ্গে প্রিন্সের পৃথিবীতে কেবল ডলি নয়, ডলির পর আর যারা এসেছে আর গেছে তারা কেউ আজ বিকেলের আলোয় দেখা ভয়ঙ্কর তাজা দলমলে শরীরের চনমনে চোখের ধারে কাছেও * দাঁড়াতে পারে না। বহু খুঁতসুদ্ধ টাটকা আস্ত একটা ফুলের সঙ্গে ফুলদানিতে সাজানো প্রায় আসলের মতো দেখতে কাগজের ফুলের যে বোঝানো-অসম্ভব ফারাক, গাঙ্গুলীদের বেচে দেওয়া পাঁচ নম্বর বস্তির আশ্চর্য আবিষ্কারের তুলনায় এতদিনের অভিজ্ঞতার মিলিত যোগফল তার চেয়েও অনেক কম।

কিন্তু কাগজের ফুল ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখা যায়। একটাকে ফেলে দিয়ে আনা যায় আরেকটাকে। পরের বাগানের ফুল তুলে আনা যায় না অত চট করে। সে বাগান যদি ফ্লাওয়ার শো-র উপযুক্ত না হয় তাহলে যাওয়াও যায় না সেখানে। লোকে বলবে কি!

মনে মনে কল্পনার রঙ্গমঞ্চে রিনির সঙ্গে মুখোমুখি হলো প্রিন্স। রিনি তার টেনিস ডাবলসের একঘেয়ে পার্টনার। সাউথ ক্লাবে তাদের ডাবলস-ক্রাউন একদিন বড় বড় খেলাতেও বাঁধা হতে পারে, বহু অন্য জোড়ার এমন ভয় খুব অহেতুক নয়। প্রিন্সের ঘরে বাইরে রিনির সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ অবশ্যম্ভাবী জড়িত, এ ধারণারও নড়চড় হবার এখনও পর্যন্ত কোনও কারণ ঘটেনি। সেই রিনি যখন জানবে তখন? তখন কি বলবে রিনি আজ রাতে নীল আলোর চেয়েও নরম গলায় তা যেন শুনতে পাচ্ছে প্রিন্স।

—তোমার একটু আটকালো না একথা কনফেস করতে? বস্তির ওই মেয়েটা? নো, নো। ইটস নট ট্রু। আমাকে ভালো না লাগে, দ্যাটস পার্ফেক্টলি ওল রাইট। কিন্তু? ঝিয়ের মেয়ের সঙ্গে রোমান্স? লোকে কি বলবে? তোমার বাবা, কাজিনস্, রিলেটিভস্। নো, নো। আই বেগ হা অফ য়ু। ডোণ্ট ডু দিস, প্রিন্স। আমার এই একটি কথা তুমি রাখো। প্লিস—। তুমি কথা বলছ না কেন? হোয়াই কাণ্ট য়ু সে,—ইয়েস? ফর গডস সেক, গিভ মি ইয়া ওয়াড, য়ু ওণ্ট সি হা গেন—

কান্নাকাটি ভালো লাগে না প্রিন্সের। তাই সে নাটকীয় দৃশ্য এড়াবার জন্যে হয়ত সে বলবে, হয়ত কেন নিশ্চয়ই সে বলবে: তোমার মাথা খারাপ, কে তোমার কানে এসব কথা বলেছে? সি অ হি ইস এ ড্যার্টি ড্যামড লায়া।

তখনকার মতো জোড়াতালি দিয়ে গোঁজামিলে নিষ্পত্তি একটা হবে। রিনিকে আবার আদর করবে সে। গলে যাবে ভেতরে কাঁপা ওপরে জমাট সেন্টিমেণ্টের বরফ। চিকচিক করে উঠবে হালকা হাসি আবার, সেই একটু কলের জলের চেয়েও সস্তা চোখের জলে ভিজে দুটো কোণ।

তার আগেই মাসতুতো বোন কেয়ার সঙ্গে হয়ে গেছে এক রাউণ্ড কথাকাটাকাটি থেকে অনিবার্য কান্নাকাটি। কেয়া মুখ খোলবার আগেই প্রিন্স নরম করবার চেস্টা করেছে যথাসাধ্য: আরে ও মেয়েটার সঙ্গে সত্যি কিছু হয়নি আমার। কেন, শুধু শুধু—

শুধু, শুধু? কই এতদিন তোমার নামে শুধু শুধু কেউ কিছু বলেনিতো—

এখনও বলবে না, যদি তোমরা চুপ করে যাও একটু।

চুপ করে থাকতে পারছি না আর। যেখানেই যাচ্ছি ওই এক কথা, বস্তির মেয়েটার হাত থেকে তোমার ভাইটাকে বাঁচাও।

তারা কারা?

তারা যারাই হোক তাদের নিয়েই আমাদের সমাজ। তাদের বাদ দিয়ে এক মুহূর্ত আমাদের চলে না। এটা ভুলে যাও। তুমি যাকে খুশি বিয়ে কর। হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান, পার্শি,—কিন্তু বস্তির একটা ঝিয়ের মেয়ের সঙ্গে, তুমি মিশতে পার না। ইটস ট্যু মাচ—

অনেকদিন ধরে একই অভিযোগ শুনতে শুনতে লেগে গিয়েছিল প্রিন্সের। একবার ফোঁস করে উঠেছিল ও।

—এক মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠেছিল সেঃ ও' তাহলে বস্তিতেই যত আপত্তি।

—হ্যাঁ। এটা না বোঝবার মত বোকা তুমি নও—

—বোকা তো নিশ্চয়ই আমি, নাহলে একটা বস্তির মেয়ের জন্যে এত কথা শুনতে যাব কেন?

—ত্থাটস ইট, ও মেয়েটা যদি উর্বশীও হয়, ওর সঙ্গে তুমি মিশতে পার না, কারণ—

—কারণ, ও বস্তিতে থাকে। ও ঝিয়ের মেয়ে, এইতো?

—এক্স্যাক্টলি সো—

—থ্যাংক য়ু ফ ইয়া সাউণ্ড য়্যাডভাইস। কিন্তু একটা কথা আমাকে বলতে পারো—

—একশোটা কথা বলতে পারি যদি ওই রটন মেয়েটার কথা না বল আর।

—একজনের সঙ্গে বিয়ে হবে। আমি ভাবব আরেকজনের কথা। আমার স্ত্রী মনে মনে কামনা করবে আরেকজনের সঙ্গ, তবু কেউ কাউকে বলব না, পাছে লোকে কি বলে, এই ভেবে, যে, আমাকে রেহাই দাও,—এতে তোমার-আমার সোসাইটিতে কোনও আপত্তি করবার নেই কেউ, না?

—কেন আপত্তি করবে? মানুষের মন চিরকাল এক জায়গায় বাঁধা থাকতে পারে না। থাকা উচিত নয়। তার জন্যে ডিভোর্স

আছে, সেপারেশন আছে। তোমারও রাইট আছে, তোমার স্ত্রীরও বিবাহ বাতিল করে আছে বেরিয়ে যাবার অধিকার। কিন্তু সে আমাদের সমাজের বলে কথা নয়, কোনও ভদ্রসমাজের যে কেউ নয় তাকে নিয়ে তোমার নাম জড়িয়ে কথা উঠবে কেন?

একদমে এতগুলো কথা বলে হাঁফাতে থাকে তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা।

প্রিন্স জানে এ সমাজের মনের কথা। ঝিয়ের মেয়ের সঙ্গে বজ্জাতি করতে পার। কোনও গোলমাল হয়ে গেলে বৈজ্ঞানিক সাহায্য নিতে বিবেকের বাধা নেই। অবাঞ্ছিত শিশুকে সরিয়ে ফেলা মায়ের পেট থেকে বিজ্ঞানের কৃপায়, টাকার জোরে, এখন ছেলে খেলার চেয়েও অনায়াসসম্ভব। বিবাহিত লোকেরও বাধা নেই এ সমাজে আসা, ঝি কিংবা আরও সহজলভ্যার সঙ্গে গোপনে অথবা প্রকাশ্যেই নোংরামো করে বেড়ানোয়। কিন্তু ভালো লেগে যায় যদি দৈবাৎ এদের কাউকে, যদি ভালোবাসো এই সমাজে প্রবেশ-নিষিদ্ধদের কাউকে, যদি মনে কর এরই মধ্যে একজন বদলে দিতে পারে বেঁচে থাকার একঘেয়েমি, জীবনের পরিধি দিতে পারে বাড়িয়ে, এদের কেউ একজন যদি তোমার সঙ্গী হতে পারে যথার্থ, এদের কারুর শরীর শুধু যদি তোমার কাম্য না হয়, এদের মনের ছোঁয়া যদি তোমার মনে রং ধরায় তাহলে অশুদ্ধ হয়ে গেল মহাভারত।

রিনি নয় কেবল। প্রিন্সের কাজিনরাই নয় শুধু। গোটা সমাজটার কথাই ওই এক। হুবহু এক। নীচের তলার মেয়েদের নিয়ে ফূর্তি কর। ফূর্তি করবার মধ্যে ছুঁড়ে দাও দুএক টুকরো রুটি যেমন ছুঁড়ে দিতে হয় চুরি করবার আগে কুকুরের মুখ বন্ধ করতে। ফুর্তি হয়ে গেলে ভুলে যাও মানুষটাকে কালবেলার খবরকাগজকে যেমন ভুলে যাও এক কাপ চায়ের উত্তাপের পর। সব সমাজেরই এই এক রা। ওপর তলায় যারা আছে তাদের অনেকের পরিচয়ই

ঝিয়ের মেয়ের জন্ম পরিচয়ের চেয়েও অনেক বেশী দূষিত। পঙ্কিল। তা হোক। তবুও পাসপোর্ট যারা পেয়ে গেছে একবার এ সমাজে প্রবেশের, কেবলই টাকার জোরে, তাদের প্রেডিগ্রী নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না কোনও দিন। কারণ এ সমাজে অল্পবিস্তর ঘা সকলেরই অঙ্গে বিগুমান। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবার সম্ভাবনা যে সমাজে সব চেয়ে বেশি প্রিন্স সেই সমাজকে জন্ম থেকে জানে। এখানে প্রত্যেকেরই বাস কাচের ঘরে।

মাসতুতো বোনের মুখ সরে যায়। পরবর্তী দৃশ্যে উঁকি মারে ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে বিশিষ্ট চাঁচাছোলা পাকা আমের মতো ফেটে পড়া রংএ বাবার মুখ। মুখ দেখেই বুঝতে পারে প্রিন্স, বাবা কি বলতে চায়। প্রিন্সের বাবা হচ্ছেন প্রিন্সের দৃষ্টিকোণ থেকে সেই জাতের প্রগ্রেসিভ যারা অন্য কোনো বাড়ির ছেলে ঝিয়ের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করলে বলে থাকেন এতে দোষের কি আছে বুঝি না। কাউকে ভালো লাগাটাই বড় কথা; ভালোবাসাই সব। সকল মানুষের জন্মের জন্যে যে দায়ী তার জাত নেই কোনো'ও, সেই জীবনবিধাতার। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান, বড়লোক গুরিবলোক এসবই মানুষের অপকীর্তি। ম্যানমেড লসের বিরুদ্ধে মানুষেরই প্রতিবাদ করবার জন্মগত অধিকাব আছে। ঝিএর মেয়েতে আর রাজকন্যায় ঈশ্বরের চোখে তফাত নেই; কোনও মানুষের চোখে যদি রাজকন্যার চেয়ে ঝিয়ের মেয়েকে ধরে বেশি তাহলে বলব তা ঈশ্বর ইচ্ছাতেই হয়েছে। ওতে বাধা দেবার রাইট যদি কারুর থাকে তবে তা রং প্রমাণ করবার রাইটও বাকী সকলের না থাক, কারুর কারুর নিশ্চয়ই আছে।

'কিন্তু' আছে একটা মস্ত, প্রিন্সের বাবার কথার মধ্যে। ওপরে উদ্ধৃত কথাগুলো বাবার মুখ দিয়ে বেরুবে জ্বলন্ত সিগারেটের মুখ দিয়ে ধোঁয়ার মতো অনর্গল যদি ওই কাজগুলো অন্য কারুর ছেলে করে। নিজের. ছেলে করলে তার আর মার্জনা নেই। তাই প্রিন্সের বেলায়

তার বাবার মন্তব্যই কেবল কঠিন হবে যে তা নয়, ভয়ও দেখাতে নিরস্ত হবেন না প্রিন্সের বাবা প্রিন্সকে। সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবার ভয়। বাড়ি থেকে বার করে দেবার হুমকি। একের পর এক এগুলো আসবে ছবির পর্দায় যেমন দৃশ্যগুলো আসে, তার চেয়ে ঈষৎ শ্লথগতিতে কিন্তু সুনিশ্চিত পদক্ষেপে।

প্রিন্সের বাবার মুখ ভারি কঠিন দেখাচ্ছিল। চোখ তীক্ষ্ণ, চোয়াল তীক্ষ্ণতর। হাতের মুঠি পাকানো। কণ্ঠস্বর অসম্ভব চাপা। প্রিন্সকে বললেন সোজাসুজি: এসব কি শুনছি, পেছনের বস্তিতে যাতায়াত করছ তুমি, সত্যি। প্রিন্স চুপ করে থাকলেও বিপদ; না থাকলেও। তবু প্রিন্স তার বাবাকেই বলতে দেয়: খুব বেশি ইংরিজি বই পড়ছ, না, ছবি দেখছ? কোনটা। নভেল পড়; সিনেমা দেখ। কিন্তু কোনোটারই নায়ক সাজতে যেও না—

অমি ছবি খুব কম দেখি,—প্রিন্স জবাব দেয় এতক্ষণে।

বই পড় বেশি। ও দুইই সমান খারাপ, যদি ওসব পড়ে তোমার মাথা খারাপ হয়—

মাথা খারাপের কি প্রমাণ পেলে তুমি?

সবটাই মাথা খারাপের সাইন। বস্তির একটা বাজে বজ্জাত মেয়ে—

বস্তিতে থাকলেই কেউ বাজেও হয় না, বজ্জাতও হয় না।

আমি ইচ্ছে করেই বাজে আর বজ্জাত কথাটা য়ুস করলাম তোমার রি-য়্যাকশন দেখতে। ডিসায়ার্ড ইফেক্টই হয়েছে দেখছি। তোমার মাথায় ওই মেয়েটা ছাড়া আর কিছু নেই। মেয়েটা বাজেও নয়, বজ্জাতও নয়। তাহলে তোমার মতে মেয়েটা কি? সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী-র মতো মহীয়সী কেউ?

সীতা, সাবিত্রী হতে হবে প্রত্যেককে কে বলেছে? ওরা ছাড়াও ভালো মেয়ে আছে।—প্রিন্সের গলা উত্তেজনায় একটু কাঁপে।

নিশ্চয়ই আছে। কে বলছে নেই? কিন্তু তারা বস্তিতে থাকে

না। সীতা-সাবিত্রীও, পার্ডন মি ফ সেয়িং সো, বস্তিতে থাকতে বাধ্য হলে, আই মিন কোলকাতার স্লামে থাকলে ভালো থাকতেন না। ভালো থাকতে পারতেন না—

কেন ?

কারণ বস্তির আবহাওয়া ভালো থাকার অনুকূল নয়—। প্রিন্সের বাবা ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, তিন ভাষাতেই সমান কম্পিটেন্ট। বস্তি কাউকে ভালো থাকতে দেয় না—

রূঢ় থেকে আশ্চর্য নরম হয়ে আসেন প্রিন্সের বাবা। দুর্দান্ত ক্রোধের রৌদ্ররাগে অপত্য স্নেহের মেঘ একটু ছায়া ফেলে। অনেক দূরে নিবদ্ধ-দৃষ্টি প্রিন্সের বাবা প্রিন্সের পিঠে হাত রাখেন : জীবনীতে যা পড়, জীবনে তা ঘটে না। পৃথিবীতে যেমন মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে, কোথায় কোন দ্বীপে গিয়ে দূষিত রোগে মারা গেছে তাই শুনেই আমরা তার ছবি কিনি, কবিতা পড়ি, বলি এ নাহলে আর আর্টিস্ট কিসের। এদের কারুর ছবি, গান, কবিতা, এই কিংবদন্তী ছাড়া কানাকড়ি দিয়েও কিনত না কেউ। আমরা কেউ আর্টকে ভালোবাসি না। ভালোবাসি আর্টিস্টকে—

তুমি বলতে চাও, শিল্পের জন্যে যারা সংগ্রাম করেছে তাদের অলৌকিক জীবনের সবটাই অলীক ?

না। তবে বেশিটাই বানানো—

ভ্যান গগ তার কান কেটে পাঠায়নি উপহার ?

পাঠিয়েছে হয়ত—

তবে ?

সেই কানকাটার গল্প শুনেই আমরা ভ্যান গগের ভক্ত। ভ্যান গগের ছবি তার জীবদ্দশায় যেমন, তার মৃত্যুর পরেও তেমনি চোখে পড়ে না আমাদের। মধুসূদনের কাব্য নয়, মাইকেলের জীবনকাব্যই আমাদের মুগ্ধ করে। মাইকেল খ্রীশ্চান হয়েছিলেন, রেবেকাকে বিয়ে করতে পারেননি, মদ খেতেন, সংসার চালাতে পারতেন না,

দাতব্য হাসপাতালে মারা গেছেন মাইকেল,—ছ্যাটস্ অল ! মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য কে ছোঁয় আজকে, কলেজে পড়াতে বাধ্য হওয়া নির্বোধ অধ্যাপক এবং পড়তে বাধ্য হওয়া হতভাগ্য ছাত্র ছাড়া ? তুমি মধুসূদন পড়েছ ?

না।

মাইকেলকে তোমার কেমন লাগে ?

খুব ভালো !

কেন জানো ? ওই মাইকেলের মদ খাওয়া, খ্রীশ্চান হওয়া, চ্যারিটেবল হসপিটালে মারা যাবার জন্যে।—প্রিন্স একটা অভিযোগেরও উত্তর খুঁজে পায় না।

অথচ, মধুসূদন যে পড়েছে সে জানে, মাইকেল কেউ নয়, মধুসূদনকেই মনে রাখার কথা—

কিন্তু, ওই জীবন যাপন না করলে মাইকেল কি মধুসূদন হতে পারতেন ?

না।

তবে ?

কিন্তু তুমি তো মধুসূদন নও, ভ্যান গগ নও, দস্তয়েভস্কি নও—

তাহলে ও জীবন আমাকে আকর্ষণ করে কেন ?

নও বলেই। বক্সিং যে জন্যে নিরীহ ভদ্রলোকদের সবচেয়ে প্রিয় উত্তেজনা—

ঘড়ির বুকে চারটে হাতুড়ি পড়ে। কাল্পনিক সংলাপ কেটে যায়। আবার শুরু হয় প্রিন্সের সেই যন্ত্রণা। বস্তির ওই মেয়েটা। চব্বিশ ঘণ্টা আগে, আজ সকালেও যার অস্তিত্ব সম্পর্কে এতটুকু অবহিত ছিল না সে, এখন সে-ই সব। আর সবই অর্থহীন। কিন্তু কি করে দেখা হয় একবার ? আরেকবার।

গাঙ্গুলীদের বেচে দেওয়া পাঁচ নম্বর বস্তির একখানা ঘরে তখনও কুপিতে আলো জ্বলছিল। কাঁথা, ছেঁড়া লেপ, যত রাজ্যের কাপড়ের

ভলায় কাঁপছিল আইসোলা বেলার বুড়ি ঝি সরলা। আর সেই গন্ধমাদনের ওপর উঠে বসেছিল জীবন্ত বিশল্যকরণী, সরলার চোদ্দ বছরের নাতনী ঝুমা। তবুও কাঁপছিল সরলা। দাঁতে দাঁত লেগে ঠক ঠক করছিল সে। সমস্ত শরীরটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছিল জোর করে চেপে-বসা ঝুমার বেশ ভারী শরীরটাকে। আর কি করা যায় ভেবে না পেয়ে ঝুমা জিজ্ঞেস করল: মাসীকে ডাকব? বস্তির মালিক হচ্ছে বুড়ি বেশ্যা মালিনী। তাকে সবাই মাসী ডাকে। গাঙ্গুলীদের কাছ থেকে গড়িয়ার শীলেরা কিনে নিয়েছিল এই বস্তি। তাদেরই বড় ছেলে বীরু শীলের বাঁধা মেয়েমানুষ ছিল মালিনী। এই বস্তিটার মালিকানা মরবার আগে উইল করে দিয়েছিল মালিনীকে বীরু শীল। জীবনে ওই একটাই ভালো কাজ করেছিল শীলেদের বড় ছেলে। বাকী সময়টা মদে ডুবে থাকত। তবে, মালিনী ছাড়া আর কোনও মেয়ের কাছে কখনও যায়নি বীরু। একটা দুঃখ নিয়ে সে মরেছিল। মালিনীর কোনও বাচ্চা হয়নি।

ঝুমা ছিল মায়ের চেয়ে মালিনী মাসীর অনেক বেশি। মাসীকে ডাকতে হলো না। ঝুমার কথা শেষ হবার আগেই ঢুকতে দেখা গেল মাসীকে। হাতে তার দামী কম্বল একটা।

ভোর রাতের দিকে কাঁপুনি থেমে গেল বটে কিন্তু ঘাম হতে লাগল অসম্ভব। গলগল করে ঘাম নামল মাথার চুল থেকে পায়ের নখে। মুখ, বুক, পিঠ, পেট, উরু, পা, পায়ের পাতা ভিজে জবজবে হয়ে গেল দেখতে দেখতে। মুছিয়ে দেবার আগেই আবার ভিজে একশা সারা গা। ঘরের একটা জানলা খোলা। দরজা হাট করা। গায়ের ওপর থেকে সব সরানো। তবুও ঘাম বন্ধ হয় না।

ঝুমার মাসীর মুখ গম্ভীর। ঝুমা ঈষৎ উল্লসিত গলায় বলে, জ্বর ছেড়ে গেছে বোধ হয়—

হ্যাঁ—

তাহলে তোমার এ রকম কেন?

কাঁপুনির পর এত গরম ভালো নয় বাছা।
দিদিমা কি বাঁচবে না মাসী ?
কি অলক্ষুণে কথাই বলতে পারিস ঝুমা—
না, তুমি বলো—
আমি তো আছি। তোর ভয় কি ?
মাসীর কোলে মাথা রেখে ঝুমা ঘুমিয়ে পড়ে।

সকাল আটটা বাজবার পরেও প্রিন্স উঠল না বিছানা ছেড়ে। সমস্ত রাত ঘুমোতে না পেরে, ক্লান্তিতে ভোরের দিকে চোখের পাতা আটকে এসেছিল তার। গোবিন উঠে এল তেতলায়। ঘুমন্ত প্রিন্সকে ডাকবার দুঃসাহস আইসোলা বেলায় এক তারই আছে। গোবিনের সাত খুন মাফ সব সময়েই প্রিন্সের কাছে। অনেক ডাকাডাকি, অনেক হাঁকাহাঁকির পর প্রিন্স বলল : কিরে? চা,—জবাব দিল গোবিন। কটা বাজে? আটটা। এঃ দারুণ বেলা হয়ে গেছে তো! প্রিন্স উঠে পড়ে অ্যাটাচড বাথরুমে চলে যায় মুখ ধুতে। গোবিন চা আর ব্রেকফাস্ট রেখে যায় সেণ্টার পিসের ওপর। চা খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির মুখে যাকে দেখে, সমস্ত রাত তারই জন্যে ঘুমোতে পারে নি প্রিন্স।

তুমি?

দিদিমার বড়ো অসুখ—তাই আমি কাজ করতে এসেছি।

প্রিন্সের মনে হয় শুধু, ঈশ্বর আছেন।

খুব মার খেয়েছ তুমি? প্রিন্স জিজ্ঞেস করে গতকাল বিকেলের কথা মনে করে।

কেন, মার খাব কেন? কে মারবে?

তোমার দিদিমা যে কাল বিকেলে বল আনতে গেছিলাম যখন, তখন বলল।

ওঃ, হ্যাঁ, বেশ মেরেছে দিদিমা, তাইতেই তো জ্বর এলো অত। দিদিমা আমাকে মারবার পর কাঁদে। আর কাঁদলেই জ্বর হয়—

তোমার কাজ শেষ হবে কখন?

এই সিঁড়িটা মুছে দিয়েই বাড়ি চলে যাব। দিদিমা একা আছে—

তোমার আর কেউ নেই ?

না, মাসী আছে—

মাসী তোমার নিজের ?

কি বোকা তুমি ? মাসী আবার পরের হয় নাকি ? মাসী আমাকে দিদিমার চেয়েও ভালোবাসে। দিদিমা আমাকে মারে, তারপর কাঁদে। মাসী কখখনো মারে না—কেবল হাসে। বলে, ঝুমা তোকে বস্তিতে মানায় না। তোর বিয়ে হবে রাজবাড়িতে—

দ্বিতীয়বার, ঈশ্বর আছেন, মনে হয় প্রিন্সের। প্রিন্সকে তুমি বলতে রিনির লেগেছিল পাঁচ মাস। এ মেয়েটা তুমি আর আপনির তফাত জানে না তাই তুমি বলেছে, প্রিন্সের তা মনে হয় না যে তা নয়। তবুও তুমি শুনে তার মুখে আকাশ আশ্চয নীল দেখায়, আজকের সকালে সূর্য ওঠা সফল হয় এ পৃথিবীতে প্রিন্সের একার।

তোমার নাম বুঝি ঝুমা ?

হ্যাঁ। আমার আরও নাম আছে। তবে মাসীর দেওয়া নাম ঝুমা, ওই নামই আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। ওই নামেই আমাকে ডাকে সবাই—

ঝুমা, তুমি কাজ শেষ হলেই বাড়ি চলে যেও না—

কেন ? আবার দুটো ভীষণ কালো চোখে বিনা মেঘে বিদ্যুৎ চমকায়।

কি বলবে কিছুতেই ভেবে পায়না প্রিন্স। বাঁচিয়ে দেয় প্রিন্সের বাবা। নীচে থেকে তার রাশভারী গলা উঠে আসে সিঁড়িতে পা না দিয়েই : কার সঙ্গে কথা বলছ প্রিন্স ?

আমি ঝুমা—

ঝুমা কেরে ?

প্রিন্স জবাব দেয় ঝুমার হয়ে : সরলার নাতনী। সরলার অসুখ, তাই ও কাজ করতে এসেছে—

প্রিন্সের কথার ওপরেই নেমে যায় ঝুমা সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে।

হাতে তার ময়লা, নোংরা কাপড় আর তার চেয়েও ময়লা, তার চেয়েও নোংরা, কালো জলের বালতি।

চলে-যাওয়া ঝুমার দিকে তাকিয়ে, প্রিন্সের মনে হয়, খুব রিডিকুলাস চিন্তা, তবুও মনে হয় প্রিন্সের, উর্বশীর পায়ে নূপুরের বদলে যদি ঘা থাকতো! দূষিত আর দুরারোগ্য!

প্রথম দিনের মতোই আরেক অপরূপ বিকেল। তেমনই আলো ম্লান হয়ে এ.সছে আকাশের অলিন্দে। বস্তির অন্ধকারে পাড়ার হোমিওপ্যাথ বরদা কাঞ্জিলাল এসে বসেছে ঝুমাদের ঘরে। আগের দিন রাতের মতই হাড়কাঁপানি শীতের পরেই সরলার সর্বাঙ্গ বয়ে এখন নেমেছে অনর্গল ঘামের ঢল। ঝুমার মাসী জিজ্ঞেস করলঃ কিছু বুঝতে পারছ ত বলো, ভুল চিকিচ্ছে করে মেরে ফেললে, ঝেঁটিয়ে তোমার বিষ ঝেড়ে দেব, আমাব নাম মালিনী, মনে রেখ—।

ঘরের বাইরে জুতোব আওয়াজ শুনে সরলা বলল ঝুমাকেঃ কে দেখ তো—। কথা শেষ হবাব আগেই ঘরে ঢুকল যে আগের দিন বিকেলের মতোই তাকে দেখে সরলার মুখ দিয়ে বেরুলঃ দাদাবাবু তুমি?

তোমার অসুখ হয়েছে নাকি?

ও কিছু নয়—

না, না, কিছু নয়কি? এই দেখো কাকে ধরে এনেছি—

ওমা, ডাক্তার বাবু!

রঞ্জন ডাক্তার আইসোলা বেলার ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান নয় শুধু। পরিবারের সব চেয়ে বড় বন্ধুও বটে। প্রিন্স ঠাট্টা-করে বলেঃ ফ্রেণ্ড ফিলসফার এণ্ড মিসগাইড অব আইসোলা বেলাস বোসেস। রঞ্জন চৌধুরীকে ডাকলে পাওয়া যায় না। না ডাকলে আসে। যতক্ষণে যমে-মানুষে লড়াই না হয় ততক্ষণ রঞ্জন ডাক্তারের পাত্তা নেই। রঞ্জন ডাক্তার আসবে তখনই কেবল, যখন কেস রীতিমতো

খারাপ হয়ে গেছে। এবং রঞ্জন ডাক্তার এলে নেহাত নিয়তি না টানলে রোগীর সাধ্য নেই মরে।

রঞ্জন ডাক্তার বসবার আগেই মালিনী মাসী পাড়ার হোমিওপ্যাথ কাঞ্জিলালকে বলেঃ আপনি এস বাছা এবার—। কাঞ্জিলাল উঠে পড়ে। তার কালো মুখ বেগনে এখন; প্রিন্সের দিকে একবার, আরেকবার ঝুমার দিকে তাকাতে তাকাতে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। সে দৃষ্টি যেমন কালো তেমনই কুৎসিত।

সরলাকে রীতিমতো পরীক্ষা করতে দেখে রঞ্জন ডাক্তারকে প্রিন্স ঘাবড়ায়। কেস গোলমেলে, এবিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

মিক্সচার লিখে একটা হাতে দেয় প্রিন্সের। তারপর বলে রঞ্জন ডাক্তারঃ রাত করে একবার চেম্বারে এস।

বুঝতে বাকী থাকে না প্রিন্সের। সরলাকে বাঁচানো শক্ত হবে। রঞ্জন ডাক্তারের মুখ দারুণ থমথম করছে।

রঞ্জন ডাক্তার বেরিয়ে যায়। প্রিন্স থাকে। মালিনী জিজ্ঞেস করেঃ ডাক্তার বাবু কিছু বলল না তো?

রাতে দেখা করতে বলল সে আমায়. তখন বলবে। এখন এই ওষুধটা আনতে হবে যে—

ঝুমা মোড়ের দোকান থেকে নিয়ে আসবে—

না। ওখানে পাওয়া যাবে না।—প্রিন্স হাসেঃ আমি পাঠিয়ে দেব ওষুধটা। ঘর থেকে বাইরে পা দেয় প্রিন্স বেরুবার জন্যে, ঝুমা আসে সঙ্গে।

কাল তোমায় থাকতে বললাম, চলে গেলে কেন?

বারে, চলে গেলাম কখন? তোমার বাবা ডাকল যে—

কি বলল বাবা—

ঘরে নিয়ে গেল।

কেন?

ছবি আঁকবে বলে—

কার ছবি, তোমার?

হ্যাঁ।

এঁকেছে ছবি?

আমি দেখিনি। আমাকে বসিয়ে দাঁড় করিয়ে, জানলার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল এইখানে চুপ করে দাঁড়াও দেখি। তারপর পেনসিল নিয়ে কাগজের ওপর একটু হিজিবিজি করল। তারপর সেসব ছেড়ে দিয়ে আমাকে কাছে ডেকে আদর করল অনেকক্ষণ। তোমার বাবা লোক ভাল নয়—

সপাং করে চাবুক মারলে মুখের ওপর দুহাতে মুখ ঢাকে যেমন লোকে, প্রিন্স তেমনই দুহাতে আড়াল করে মুখ, দ্রুত চলে যায় ঝুমার কাছ থেকে বস্তি ছেড়ে।

ঝুমার কথা কিন্তু তখনও শেষ হয়নি। প্রিন্সের বাবা তাকে পাঁচটা টাকা ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল: ঝুমা কাউকে বলিসনে—

কি?

এই যে তোকে আদর করলাম, টাকা দিলাম—।

প্রিন্স যেকথা বলতে এসেছিল ঝুমাকে সেকথাও বলা হলো না।

আজ সকালে ঝুমা আইসোলা বেলায় সরলাব বদলে কাজ করে আসবার পরেই একশো টাকার একটা নোট, প্রিন্সের বাবার ঘরে একটা বইয়ের মধ্যে গোঁজা ছিল, আর পাওয়া যায় না। কথাটা কানে আসা মাত্রই প্রিন্স একটু খোঁজার অভিনয় করেই নিজের পকেট থেকে একশো টাকার নোটটা বার করে দেয়, যেন বইয়ের ভেতর থেকে টেবলের পেছনে পড়ে গেছিল,—বলতে চায় প্রিন্স।

সেই কথাটাই ঝুমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছিল যে মার অসুখে ডাক্তার, ওষুধ, আর খাওয়া-দাওয়ার জন্যে যদি টাকার দরকার ছিল, তো, প্রিন্সকে বলল না কেন?

বাড়িতে গেল প্রিন্স, টলতে টলতে। তখনও মাথার মধ্যে ঘুরছে, ঝুমার মুখ থেকে এইমাত্র বেরুনো একটুকরো বিষ,—'তোমার বাবা

লোক ভালো নয়'! বাড়িতে পা দিয়েছে কি দেয়নি, গোবিন্দ চেঁচায়ঃ দাদাবাবু—

কিরে?

পাওয়া গেছে—

কি পাওয়া গেছে?

একশো টাকার সেই নোটটা, নতুন চাকরটা জানলার ধারে আলোয় ধরে দেখছিল, একশো টাকার নোট দেখেনিতো কখনও—

ভীষণ রাগ হলো প্রিন্সের।

নতুন চাকর রামু বসেছিল চাকরের ঘরে। চতুর্দিকে তার জিনিসপত্তর ছড়ানো। প্রিন্স গিয়ে তার চুলের মুঠি ধরল। তারপর জুতো পরা পায়ের এক লাথি মারল। যন্ত্রণায় একটা বীভৎস আওয়াজ করল রামু—অওর নেহি করেগা—করেছিলি কেন, বল আগে। কথা বলে আর থাপ্পড়, কিল, লাথি চালিয়ে যায় সমানে।

প্রিন্স?

বাবা দাঁড়িয়েছিলেন। বারান্দায় প্রিন্স বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। ওপরে আসতে বাবা বললেনঃ মারছ কেন ওকে?

চুরি করবে কেন? চেয়ে নিল না কেন?

চাইলে কেউ দশ পয়সা দেয় না বলে—

আমি দিতাম—

ও তা জানবে কি করে?

চেয়ে দেখতে পারত—

অনেকের কাছে চেয়ে না পেয়েই জেনেছে, চাইলে কেউ পয়সা দেয়না, মুখ খারাপ করে গাল দেয়। তাছাড়া দোষ ওর নয়, আমাদের—

কেন?

কারণ টাকা আমরা ওদের চোখের সামনে ছড়িয়ে রাখি, ক্ষুধিত

লোকের সামনে খাবার রেখে দেবে, অথচ চাইলে খেতে দেবে না, সে চুরি করে খাবে না?

আরও চাকর আছে বাড়িতে, কই তারা তো—

তারাও চুরি করে, তবে অল্প অল্প করে সরায় তাই টের পাও না। তারা চোর—এলোকটা চোর নয়, তাই একেবারে একশো টাকায় হাত বাড়িয়েছে—

এ চোর নয়?

না। চোর কখনও চোরাই মাল দিনের বেলার আলোয় দেখতে যায় না মালটা দেখতে কেমন।

তাহলে কি করব?

যে একশো টাকার নোটটা, কাকে বাঁচাবার জন্যে জানি না, তুমি রিপ্লেস করেছিলে, সেটা থেকে কুড়িটা টাকা ওকে দাও এখনই, আর গিভ হিম নাদা চান্স—

আরেকবার সপাং করে চাবুক পড়ল প্রিন্সের মুখে।

জানলার ধারে বসেছিল ঝুমা। প্রিন্সের বাবার আদর করা তার কাছে নতুন নয়। ঝুমা যেদিন থেকে ফ্রক ছাড়ব ছাড়ব করছে তারও আগে থেকে মাঝবয়সী লোকদের হ্যাংলার মতো তার সর্বাঙ্গ চোখ দিয়ে লেহন করার অভিজ্ঞতা এখন অনেক পুরোনো হয়ে গেছে। বরদা কাঞ্জিলালের চোখ থেকে সেই হ্যাংলামি তো এখনও এক বিন্দু কমেনি। বরদা কাঞ্জিলালের বয়স অন্তত পঁচাত্তর হবে। বছর দুই আগে, বরদার কাছে মাসীর জন্যে ওষুধ আনতে গিয়েছিল। ঝুমা গিয়ে দাঁড়াতেই চৌকো মুখ রবীন কমপাউণ্ডারকে কোথায় পাঠিয়ে দিয়েছিল বরদা। তারপর পাশের ছোট্ট অন্ধকার ঘরে চলে গিয়েছিল পর্দার ওপাশে। একটু বাদে শোনা গিয়েছিল বরদার গলা : ঝুমা এদিকে আয়তো—

এক মিনিট দাঁড়িয়ে ঝুমা গিয়েছিল তৎক্ষণাৎ সেই অন্ধকার ঘরে।

এই পাউডারটা এই শিশিতে ঢালতো—রবীনটা আবার কোথায় গেছে—

বারে তুমিই তো ওকে পাঠিয়ে দিলে বাজারে এখখুনি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভুলে গেছি, তোকে দেখলে আমার সব ভুল হয়ে যায়।

কথা শুনতে শুনতে প্রথমে মনে হয়েছিল এমনই। তারপর ঝুমা বুঝলো, না, বরদা ইচ্ছে করে গায়ে হাত লাগাচ্ছে।

ওষুধটা হাতে দেবার সময় আঙুলের মুখ দিয়ে বরদা ঝুমার আঙুলের মুখে বেশ চেপে ছুঁল। পিন বেঁধানোর মতো করে। বরদা কাঞ্জিলালের আঙুলের বড় নখ কি এই জন্যেই? ওষুধটা ধরিয়ে দিয়েও হাত সরায়নি বরদা, বলেছিল : কাল এসে খবর দিস, এই সময়ে, মাসী কেমন থাকে—।

কিন্তু প্রিন্স, কার জন্যে বস্তিতে ডাক্তার নিয়ে আসে? রাজপুত্তুরের মতো দেখতে, মস্ত বড়লোকের ওই একমাত্র ছেলে? মালিনী মাসী কাল থেকে ঠাট্টা শুরু করেছে। দিদিমার জন্যেই এত, মেয়ের অসুখ করলে তাহলে কে আসবে বিলেত থেকে কোন সাহেব দাক্তার!

চমকে ঘাড় ফিরিয়েছে ঝুমা।

তুমি?

পঞ্চু দারুণ তাড়া দেয় : সিনেমায় যাবে না?

না।

কেন?

দিদিমার অসুখ—

দিদিমা অনেক ভালো আছে নাও, নাও, দেরি হয়ে যাচ্ছে—

হাত ধরতে যায় পঞ্চু। এক ঝটকায় সরে যায় ঝুমা।

কি হচ্ছে কি?

ভালো হচ্ছে না বলছি—

মালিনী মাসী এসে দাঁড়ায়ঃ কি হয়েছে পঞ্চু.?

এই দেখো না, সিনেমায় যাবে বলেছিল, এখন বলছে, যাবে না।

ও আর কোনওদিনই তোমার সঙ্গে যাবে না বাছা—

কেন?

তোমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি?

না, না, এতদিন গেছে, আর কোনওদিন যাবে না বলছ, তাইতেই জিজ্ঞেস করছি, কেন?

ওর মুখ থেকেই শুনবে—

মাসী বাঁকা হেসে বেরিয়ে যায়।

যাবে না সত্যিই আমার সঙ্গে আর কোনওদিন?

চলো, যাব—

ঝুমা হঠাৎ কেন মত বদলায় পঞ্চু বোঝে না, কিন্তু খুশি হয়। মাসী বোঝে; কিন্তু খুশি হয় না।

প্রেক্ষাগৃহে একটাও কথা বলে না ঝুমা। ঝুমার হাতটা দুএক বার টেনে নেয় বটে পঞ্চু, তবে সে যেন মরা হাত। ঠাণ্ডা, শক্ত, সাড়হীন।

পঞ্চু একবার জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে। ঝুমা তার জবাব দিল না। ছবির শেষে বাইরে বেরিয়ে এসেই ঝুমা দাঁড়িয়ে গেল। কি হয়েছে? পঞ্চু ঝুমার চোখকে অনুসরণ করে গিয়ে উঠল ঝকঝকে, সিত্রোয়ঁার ড্রাইভারের সিটে, যেখানে প্রিন্স বসেছিল পাশে রিনিকে নিয়ে। পঞ্চু খোঁচা না দিয়ে পারল না; আসমানের চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে লাভ কি ঝুমা? তুমি বস্তির মেয়ে, আর আমি মিস্তিরি—

আমি বস্তির মেয়ে নই,—

না। তুমি রাজকন্যে!

দুচারজন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল উত্তপ্ত সংলাপ কানে যেতে। ঝুমা তাড়াতাড়ি পা চালাল। পঞ্চুর দিকে পেছন ফিরে একবার তাকালও

না। ফাঁকা, সেকেণ্ড ক্লাস ট্রাম। অন্ধকার গড়ের মাঠ থেকে বেশ হাওয়া দিচ্ছে। গঙ্গার ওপর আলোর মেলা। চৌরঙ্গির নিওন আলো জ্বলছে নিভছে। চা পড়ছে কেটলি থেকে কাপে। লিপটনের বিজ্ঞাপন। ঝুমার মনে হয় গাড়িতে করে একদিন চৌরঙ্গি দিয়ে সে যাবে। সঙ্গে কুত্তার মতো থাকবে দামী জামাকাপড় পরা পঙ্কুর দল। পঙ্কুতে আর প্রিন্সে তফাত কি? মিস্তিরি আর রাজপুত্তুর? দুজনেরই আকর্ষণ তো ঝুমার শরীর। উদ্ধত বুক, শরীরের খাঁজ, উদ্দাম নিতম্ব। এই শরীরের সিঁড়ি বেয়েই সে একদিন উঠবে সেই চূড়োয় যেখান থেকে হাত বাড়ালেই মুঠোয় ধরা যায় আকাশের চাঁদ। একটু অসাবধান হলেই সেখানে ভয় থাকে তারার আলোয় চুলে আগুন ধরে যাওয়ার সেই উঁচুতে উঠবে সে এই তার প্রতিজ্ঞা। সেখান থেকে পঙ্কু আর প্রিন্সে কোনও তফাত নেই। উড়োজাহাজের চোখে পাহাড়ের চূড়ো আর উই ঢিবিতে ফারাক কি? কতটুকু?

পঙ্কুর এক ধাক্কায় স্বর্গ থেকে পতন হয় ঝুমার। বাড়ির কাছে এসে গেছে তারা।

রিনির পাশে নিঃশব্দে বসে গাড়ি চালাচ্ছিল প্রিন্স। কি হয়েছে তোমার, জিজ্ঞেস করে জবাব পায়নি রিনি অনেকবার। সিনেমার অন্ধকার থেকে প্রিন্সের পাশে বসেও বিন্যস্ত বেশে এবং অবিপর্যস্ত চুলে বেরিয়ে আসা কোনও মেয়ের এই প্রথম। প্রিন্স বেপরোয়া। ধৈর্য নেই। যে মেয়েকে তার চোখে ধরে সে মেয়েকে তার চাই। দুএক দিনের মধ্যে তার সঙ্গে আলাপ এবং আর দুএক দিনের মধ্যে তাকে নিয়ে ছবি দেখতে যাওয়া, মেয়েদের বেইজ্জত করা। তারপর ভুলে যাওয়া, প্রিন্সের জীবনের রুল অব থ্রি।

রিনিকে নিয়ে প্রথম যেদিন বেরিয়েছিল প্রিন্স সেদিনও এর ব্যতিক্রম হয় নি।

আর আজ? আজ প্রিন্স ছবিঘরের অন্ধকারে রিনির

হাতখানাও তুলে নেয়নি নিজের হাতে একবার। কেন? নতুন কোন মেয়ে এসেছে বহুবল্লভ প্রিন্সের জীবনে? ভুল নেই তাতে। সে কে?

বাড়ির মোড়ে এসে ঝুমা আসতে দিল না পঙ্কুকে। কিছুতেই না। পঙ্কু বলল: তুমি ভুল করছ ঝুমা। করো। তেলে আর জলে, বড়লোকে আর গরিবলোকে, আইসোলা বেলা আর বস্তিতে এক হবে না কখনও—

চমকে চোখ বড় করেছিল ঝুমা। তারপর আর দাঁড়ায়নি পঙ্কু। মোড়ের বাঁকে তার দীর্ঘ মজবুত কালো শরীর মিশে গিয়েছিল অন্ধকারে।

তীব্র তীক্ষ্ণ মোটরের ইলেকট্রিক শঙ্খের ভর্ৎসনায় আরেকটু হলে পেভমেন্টের কানায় লেগে পড়ে গিয়েছিল ঝুমা। তাকিয়ে গালাগালি দিতে গিয়ে থেমে যেতে হলো তাকে। গাড়িতে বসে প্রিন্স। পাশের সিট খালি। গাড়ির দরজা খুলে যায় প্রিন্সের হাতে—

ভেতরে এস—

না—

কেন?

আমি তো চোর—

তুমি চোর?

হ্যাঁ। একশো টাকার নোটটা তোমার বাবার বইয়ের ভেতর থেকে আমি নিইনি?

কে বলল এসব কথা তোমাকে?

যেই বলুক, আপনার তো তাই ধারণা—

তুমি থেকে আপনার একলাফে আপনিতে উঠে যাওয়া কানে বাজে প্রিন্সের। একটুখানি চুপ করে থেকে সে বলে: গোবিন বলেছে তোমাকে এই সব?

হ্যাঁ। গোবিন বলেছে। যান এখনই বাড়ি গিয়ে তাকে মারুন। কিল, চড়, ঘুষি। তারপর যে একশো টাকা আমাকে বাঁচাবার জন্যে গুঁজে দিয়েছিলেন বাবার বইতে, যার থেকে কুড়িটা টাকা ছুঁড়ে দিয়েছেন মারধোরের পর নতুন চাকরটাকে, তারই থেকে কুড়িটা টাকা আরও ছুঁড়ে দেবেন গোবিনকে। না। তিরিশটা টাকা ছুঁড়বেন বরং। গোবিন হাজার হলেও আপনার পুরোনো চাকর তো—

দাঁড়ায় না ঝুমা। বস্তির অন্ধকারে পা চালায় অসম্ভব দ্রুত।

গাড়িতে স্টার্ট দেয় প্রিন্স। আওয়াজ করে ওঠে যন্ত্র প্রিন্সের হাতে। যেন বলতে চায়—ঝুমা—বিনি নয়।

মাল খাচ্ছিল রাত সাড়ে আটটায় ঘরের সামনের নর্দমা আর ঘরের মধ্যেকার জায়গায় ভাঙ্গা চৌকির ওপর বসে চার-পাঁচজন। আজ হপ্তা পেয়েছে বসন্ত। তারই পয়সায় ধেনোর স্রোত বইছে চৌকিতে। গান হচ্ছে বেসুরো গলায়, ছোটিকে ছোটি সে—

হীরালালের ছেলে দৌড়ে এসে চীৎকার করেঃ বসন্তকাকা ওপরে এস—

কেনরে ?

মাকে মারছে বাবা—

যা, যা, মৌজ নষ্ট করিস নে। ওতো রোজই লেগে আছে—

ওই ঝুমা বলে ছুঁড়িটার সঙ্গে আবার বেরিয়েছিল বুঝি তোর বাবা ?

মাকে মেরে ফেলবে যে—

বাজে বকিস নে, তোর মাকে মেরে ফেলবে যে সে এখনও পয়দা হয়নি।

হীরালাল তখন অশ্রাব্য গালাগাল দিচ্ছে আর কৃষ্ণভামিনীর মাথাটা মেঝের ওপর দারুণ জোরে থেঁৎলাচ্ছে। হীরালালের বড় মেয়ে চুনী একবার ছাড়াতে এসেছিল বাবাকে। এক ঝটকায় উল্টে গিয়ে পড়েছে ঘরের আরেক কোণে। বঁটির ওপর গিয়ে পড়েছে কনুই। আর্তনাদ করে উঠেছে সে,—বাবা গো। রক্তে ভেসে গেছে বস্তির কাঁচা মেঝে। হীরালালের ভ্রূক্ষেপ নেই। বউয়ের মাথা মেঝেয় ঠোকে আর বলেঃ শালী, আজ তোকে খুন করব, তবে আমার নাম হীরালাল। কাঁচা খেয়ে ফেলব তোকে দেখ—

কপালের ওপর থেকে ঘাম মুছবার জন্যে একটুখানি হাত আলগা দিয়েছিল হীরালাল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উল্টে দিয়েছে কৃষ্ণভামিনী, এতক্ষণে মরে গেছে বলে মনে হয়েছিল যাকে। তবে দেখ মিনসে, কে কাকে খায়—

দশাসই চেহারা কৃষ্ণভামিনীর। গায়ের জোরে ভীমভবানী হার মানে।

ঠিক উল্টো দৃশ্য আরম্ভ হয়ে যায় বস্তির মেঝেয় এবার। কৃষ্ণ-ভামিনী ওপরে, হীরালাল নীচে। হীরালালের মাথাটা হীরালাল যেমন থেৎলেছিল তার চেয়ে অনেক জোরে আছড়াতে লাগল মাটিতে। আর বেটাছেলের গলায় প্রায় কৃষ্ণভামিনী তার মুখ খুলে চলেছে সমানে। পিচকিরির মুখে ফিনকি দিয়ে রং বেরুবার স্পিডে বলা যায় না এমন গালাগাল ঘরের বাতাসকে পর্যন্ত বিষাক্ত করল: উল্লুকের বাচ্চা। তোর চোদ্দপুরুষের দেব আজ, দাঁড়া—

কতদূর গড়াত সত্যি সত্যি সেদিন বলা সম্ভব হতো না কারণ একটি ধমকে ঘরোয়া লড়াই থেমে গেল এক মিনিটে।

ওঠো।

দুজনেই দরজার দিকে তাকায়। মালিনী মাসী।

দুজনেই উঠে পড়ে। হীরালাল নেমে যায় নীচে।

ছবিটার দিকে তাকিয়ে আশ মেটে না ঝুমার। তার নিজের ছবি। প্রিন্সের বাবার আঁকা। ফ্রেমে আটকানো ছিল।

চেনা যাচ্ছে ঝুমা বলে? প্রিন্সের বাবা জিজ্ঞেস করেন। মুখে পাইপ।

হ্যাঁ।

খুশি হয়েছ?

খুব।

সত্যিই খুশি হয়েছিল ঝুমা। প্রথম দুতিন দিন মনে হয়েছিল

হিজিবিজি। তাকে এই ছুতোয় আদর করবে বলে যাতা কাগজে আঁকিবুঁকি কাটছে বুড়ো মনে হয়েছিল। আজ মনে হচ্ছে, না, লোক ভালো নাহলেও প্রিন্সের বাবা ভালো আঁকেন।

তাহলে কি দেবে এই ছবিটার জন্যে ?

চুপ করে থাকে ঝুমা! বোঝে বুড়ো এবার টানাটানি শুরু করবে। দরজার দিকে এগোয় একপা একপা করে। ভয় হয়, খপ করে বুড়ো এই বুঝি ধরে। চোখ বুজে ঘরের বাইরে পা দিয়েই দৌড় দয় ঝুমা। পেছনে ঘরের ছাদ ফাটানো হাসি ভেঙে পড়ে প্রিন্সের বাবার। দুহাতে কান চেপে ধরে সে। তালা লেগে যাবে নইলে।

প্রিন্সের বাবাকে ভয় করার কারণ আছে ঝুমার। সেই কারণ হচ্ছে, আরেক বুড়ো। তাদের বস্তিতেই থাকে, তার নাম হীরালাল। আজ থেকে মাস দেড দুই আগের ঘটনা মনে আছে ঝুমার এবং এবস্তির সবায়ের। হীরালাল তখন তার জাঁদরেল বউ নিয়ে বস্তির একেবারে পেছনের দুখানা ঘরে এসে উঠেছে। বস্তির লোকের একটু অবাক লেগেছিল। ঝুমার দিদিমা জিজ্ঞেস করেছিল মাসীকেঃ দুখানা ঘর কেন? মালিনী মাসী জবাব দিয়েছিলঃ চার-পাঁচটা ছেলে-মেয়ে। রোজগার ভালো যে।

কি করে লোকটা দিদি ?

জাহাজে কাজ করে কি যেন।

মাইনে বেশি বুঝি ওকাজে—

উপরি আছে বোধ হয়, মদ খায় খুব—

ওবাবা, তাহলে তো সব গুণই আছে !

ওই তোমার এক দোষ সরলা, সারাদিন খাটবে, মদ খাবে না বেটাছেলে, মদ খায় যারা তারা লোক ভালো হয় জানিস ?

সেই হীরালাল একদিন মাটি থেকে শূন্যে তুলে নিয়ে ঝুমাকে সকলের সকলের সামনে আদর করল।

ঝুমা তখনও ফ্রক ছাড়েনি রীতিমতো। দু একবার শাড়ি পরে মার জ্বালায়। সুবিধে পেলেই ফ্রকে বেরোয় এদিক ওদিক। পাড়ার কাছেই কোথায় যেন গিয়েছিল পঞ্চুর সঙ্গে ফিরছিল একা। পঞ্চুর সঙ্গে তার সাংঘাতিক ভাব বস্তির অন্য ছেলেদের ভালো লাগে না। ওর মধ্যে সব চেয়ে পাজি যেটা সেটার নাম ভণ্টু। ঝুমার ফ্রক ধরে টেনেছিল একদিন। ঝুমা কামড়ে দিয়েছিল হাতে কটাস করে। আঙুলের এক পো রক্ত বেরিয়ে গিয়েছিল এক কামড়ে।

সে রাগ ভণ্টু ভোলেনি। ঝুমা বাড়ির কাছ বরাবর আসতেই শেকল থেকে একটা কুকুরকে ছেড়ে দিয়েছিল। লেলিয়ে দিয়েছিল ঝুমার পেছনে। কুকুরটা তেড়ে এসেছিল বাঘের মতো। পেছনে পেছনে শঙ্করের সাঙ্গপাঙ্গ। শিস, হাততালি আর চীৎকার: ঝুমা! ঝুমা!

ঝুমা প্রাণপণ দৌড়চ্ছিল দিগ্‌বিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে। হঠাৎ একটা দাড়িওলা লোক মাঝখানে পথ আটকে দিল। দুহাতে তুলে নিল ঝুমাকে। তারপর দুগালে আওয়াজ করে আদর করল সকলের সামনে। শিস, আবার হাততালি, আবার আওয়াজ উঠল: ঝুমা! ঝুমা!

লোকটার দাড়ি ধরে জোরে টান দিল ঝুমা। হীরালালের চীৎকার পৌঁছল সদর রাস্তা পর্যন্ত: মাইরি আর কি! তোমায় ছেড়ে দেবে ভেবেছ?

আবার আদর করত হীরালাল। তার দাড়িসুদ্ধু মুখটা নামিয়ে এনেছিল ঝুমার লাল গালের ওপর। পেছন থেকে মালিনী মাসী হাঁকল: হীরালাল—। হীরালাল ছেড়ে দিল ঝুমাকে মুহূর্তে। ধপ করে মাটির ওপর পড়ল বাড়ন্ত শরীর একটা প্রায় চোদ্দ বছরের মেয়ের।

হীরালালের মতোই প্রিন্সের বাবারও দাড়ি আছে! প্রিন্সের বাবাকে ঝুমার বেশি ভয় ওই দাড়ির জন্যেই। দাড়িওলা লোকগুলো

একটুও ভালো হয় না, ঝুমা জানে। বিয়ে পয়লায় কেবল আদর করতে চায়।

প্রিন্সের বাবার ঘরে ঝুমার ছবিটার ডেলিভারি নিতে এসেছিল হ্যারলড ডবসন-এর কলকাতা শাখার সেলস-ম্যানেজার। হ্যারলড ডবসনের নাম দুনিয়া জুড়ে। ক্যালেণ্ডারের জন্যে সুন্দরী মেয়েদের ছবি তুলে জগদ্বিখ্যাত তারা। প্রিন্সের বাবার কাছে তারা তখনই আসে কেবল যখন কেউ আঁকা ছবিতে ক্যালেণ্ডার চায়। এবারও ঝুমার যে ছবি এঁকেছিলেন প্রিন্সের বাবা, তা তাদেরই ফরমাশে। একটি কোল্‌ড ড্রিংকের ক্যালেণ্ডার তৈরি হবে এই ছবি থেকে। গত কবছর ধরে বাচ্চা মেয়ে থেকে পরপর বয়সের একটি সিরিস ছবি দিয়ে ক্রমশ প্রকাশ্য এই ক্যালেণ্ডারে এবারে দেখা যাবার কথা দুর্নিবার সেক্সের বিস্ফোরণ। ঝুমাকে মডেল করে প্রিন্সের বাবা সেই সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটিয়েছেন তুলিতে। ফিনিশড প্রোডাক্টটির কল্পনায় মশগুল হ্যারলড ডবসন-এর কলকাতার সেলস ম্যানেজার জর্জ জিজ্ঞেস করেন: এমেয়েকে তুমি কোথায় পেলে?

বস্তিতে। জবাব দেন প্রিন্সের বাবা।

ভেনাস ইন এ স্লাম? পাওয়া যাবে একে?

ফ হোয়াট?

নো, নো, খারাপ কোনও উদ্দেশ্যে নয়,—হেসে ফেলে জর্জ।

খারাপ উদ্দেশ্যে তো আসলে নিশ্চয়ই, নাহলে আগে থেকেই তুমি প্রোটেস্ট করবে কেন?—হেসে ফেলেন প্রিন্সের বাবাও। তারপর বলেন: পাওয়া গেলে কি করবে, চাকরি দেবে?

এখনই মাসে চারশো টাকা প্লাস কনভেয়ান্স পাবে, সময় দিতে হবে রোজ নট মোর দ্যান—ফো আওয়ার্স—ক্যান য়ু গেট হা ক আস?

দাঁড়াও,—প্রিন্সকে ডাকতে পাঠান প্রিন্সের বাবা। গোবিন্দ

এসে জানায় প্রিন্স বাড়ি নেই।—ওল রাইট, আমি আমার ছেলের সঙ্গে পাঠিয়ে দেব ঝুমাকে। ফিক্স হা আপ—

থ্যাংক য়ু! সেণ্ড হা ইন এ ডে অ টু—

আই শ্যাল—

সেণ্ট্রাল অ্যাভেন্যু আর বউবাজারের মোড়ে এডিনবারা রেস্তোরাঁর ম্যানেজার, খদ্দের, বয়, ওয়েট্রেস, মশা, মাছি পর্যন্ত চেনা মোটারের হর্নে উতলা হয়। কেবল ঝুমা ছাড়া। ঝুমার দিকে সবাই তাকায়। সে ভ্রূক্ষেপও করে না। অন্যদিন প্রিন্স কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে আসে। চার নম্বর ক্যাবিন খালি থাকলে সেইটেয় বসে। নাহলে যেকোনোটায়। খালি না থাকলে নীচে অপেক্ষা করে। তখন অন্য মেয়েরা ঝুমাকে খোঁচায়; যাও, তোমার সাহেব যে হেদিয়ে মরে গেল। ক্যাবিন থেকে প্রিন্স যখন বেরিয়ে যায় তখন টাকা তিনেকের খাবার পড়ে থাকে আনটাচড বাই হ্যাণ্ড। এডিনবারা রেস্তোরাঁর ম্যানেজার জানে ঝুমা সুখের পায়রা, বেশি দিন নয়। তাই একটু রসালো খদ্দের হলেই, ক্যাবিনে অর্ডার নিতে যাবে ঝুমা; —এই তার স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার।

আজ অবশ্য প্রিন্স ওপরে এল না, হর্ন দিল শুধু আরেকবার। ঝুমা বেরিয়ে এল একটু বাদে। প্রিন্সের সঙ্গে বে[illegible]বে বলে ছুটি নিয়েছে সে আজ সন্ধ্যেটা।

হ্যারলড ডবসনের কলকাতার সেলস ম্যানেজার জর্জ ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিল। ছটা পঁয়তাল্লিশে প্রিন্সের আসার কথা, মেয়েটাকে নিয়ে। এখন ওলরেডি ছটা সাতচল্লিশ। সাতটার সময় প্রায় জর্জ যখন অফিস ছেড়ে উঠব উঠব করছে, তখন এল প্রিন্স। সঙ্গে ঝুমা।

সরি, উই য়া লেট—

ছাটস ওল রাইট, টেক ইয়া সিট।

দুজনে বসল জর্জের মুখোমুখি। কনট্রাক্ট টাইপ করা পড়েছিল টেবলের ওপর।

ওকে টার্ম এণ্ড কাণ্ডিশনটা বুঝিয়ে দাও প্রিন্স—

সব বলেছি ইন ডিটেল—

সো, শি এগ্রিস ?

ফুললি—

দেন, আসক হা টু সাইন হিয়া—

একটু অপ্রস্তুত হয় প্রিন্স। ঝুমা বাঙলাতেও সই কবতে জানে না। টিপ সই নেওয়া হয ঝুমাব। উইটনেস থাকে প্রিন্সের স্বাক্ষর।

জীবনে স্বর্গেব সিঁডিতে ওঠাব প্রথম ধাপে পা দেয় ঝুমা।

বস্তিতে ফিরে গিয়ে মাসীকে জডিযে, চুমু খেয়ে পাগল কবে দেয ঝুমা।

আমি কাজ পেযেছি মাসী,—চাবশো টাকা মাইনে—

সত্যি—

এই দেখো সই কবা কাগজ।

কি করতে হবে তোকে ?

আর গিয়ে জিজ্ঞেস কবতে হবে না,—চাযেব সঙ্গে কি খাবেন ? —এখন শুধু গিয়ে দাঁডাতে হবে, বসতে হবে—আর আমার ছবি তুলবে—

কে করে দিল কাজটা ?

প্রিন্স—

তবে কি বলেছিলাম ঝুমা, তুই মানুষ চিনিস না—

প্রিন্সও তো আমাকে চেনেনি, ভেবেছিল আমি চুরি করেছি, ভাবেনি ?

কেন ভেবেছিল জানিস ?

কেন ?

এই বস্তির জন্যে,—এখানে থাকা তোর চলবে না, নতুন বাড়িতে উঠে যেতে হবে—

প্রিন্সও এই কথা আমায় গাড়িতে আসতে আসতে বলেছে—

বলেছে তো ?

হ্যাঁ—প্রিন্স বলেছে, বস্তি থেকে বড় হওয়া যায়, কিন্তু—বস্তিতে থেকে কেউ বড় হয় না।

কারখানা থেকে বেরিয়ে গেছে মিস্ত্রিরা ; খোঁয়াড় থেকে জানোয়ার। কাজের খোলস ছেড়ে খবর কাগজে, চটের থলিতে মুড়ে আনা ধোপদোরস্ত, আধা-ময়লা জামাকাপড় বার করে পরে নিয়েছে বাবুয়া, কালো, ওয়াজেদ, হানিফ, মোতিলাল, খোকা, বাচ্চু, সবাই। পাশের পকেট থেকে চিরুনি বার করে মাথাব চুলে চালাতে চালাতে জোর কদমে বেরিয়ে পড়েছে হৈ হৈ করতে কবতে বগুেল রোডের ঘাম আর ময়লা আর গরম আব ধোঁয়া আব একরাশ অন্ধকারের জ্যান্ত নরক থেকে বাবো ঘণ্টার জন্যে মদ আর মেয়ে আর সিনেমা আর আড্ডা আর বাজার আর গান আর ঘুমের স্বর্গে ফিরে গেছে তারা। শূন্য অডিটরিয়মের মতো খাঁ খাঁ করছে কারখানার শেড। ওভারটাইম বন্ধ। দ্বিতীয় শিফট বাতিল হয়েছে গত সপ্তাহ থেকে। য়ুনিয়ানের সেক্রেটারি বরখাস্ত মিস্ত্রি রুস্তমের হয়ে লড়ায়ের নোটিশ দেবার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে। যার যার গাড়ি পড়ে আছে কারখানার গড়ের মাঠ জুড়ে। আর্জেণ্ট গাড়ি চাই যাদের তাদের দুনো দাম দিতে হচ্ছে মেরামতের। একটা অর্ডিনারি কেসে, চারগুণ। পাঁচগুণ বিলের মওকাও মিলেছে একটা আধটা। ওভারটাইমের লোকসান নেই। দ্বিতীয় শিফট বাতিল হবার লস পুষিয়ে লাভ উপচে পড়ছে বিলে, বিল ছাড়া কালো টাকার বেনো জলের ধাক্কায় থৈ থৈ করছে বসাকস অটোকিওর।

এক একার জমি জুড়ে পঞ্চু আজ একা। মালিকদের পেয়ারের লোক দুজন। একজন পঞ্চু। আরেকজন গেটে আছে বাহাদুর।— বন্দুক হাতে আর কোমরে কুকরি। আর পেছনের ঘরে বসে আছে

পঞ্চু। তখনও তার গায়ে কয়লার চেয়ে কালো ছেঁড়া গেঞ্জি। খাঁকি হাফ প্যাণ্টের রং চেনা যায় না ভালো করে। গায়ের ঘামে, তেলে, ধুলোয় ভর্তি পঞ্চু বসে আছে চুপ করে। মালিকরা গেছে বাগান-বাড়িতে। মাইফেলের জন্যে নয়। আজ রাতে জরুরি অধিবেশন। একস্ট্রা এমার্জেন্ট মিটিং ডিরেকটর্স বোর্ডের। আসন্ন স্ট্রাইকের সঙ্গে মোকাবিলা করার মহড়া হবে সেখানে। য়ুনিয়ানের শিরদাঁড়া অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বাচ্চা জয়েস আর তার দুহাত,—ওয়াজেদ আর খোকা, এই তিনজনের কোমর ভেঙ্গে দিতে হবে এবার। শুধু ওয়াজেদ আর খোকাকে নিয়ে য়ুনিয়ান হলে বসাকস অটোকিওর কেয়ার করত থোড়াই। ওই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বাচ্চাই রুট অব ওল ইভিলস। হিন্দু মুসলমান, দুদলই ওর হাতের মুঠোয়। জাদু জানে [illegible] অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ম্যাজিক। কিছুতেই হিন্দুকে মুসলমানদের সঙ্গে লড়িয়ে দেবার রাস্তা নেই, ওই এক জয়েসের জন্যে। দুদলই জান দিতে রাজি। কোন রাস্তায় জয়েসকে মীরজাফর প্রমাণ করা যায় তারই ফিকির পয়দা হবে আজ বসাকদের কাঁকুড়গাছির বাগানবাড়িতে। নিশীথ রাত্রির নীল আকাশে সাদা প্লাস্টিকের থালার মতো দেখতে হালকা চাঁদই কেবল রইবে যার নীরব সাক্ষী বাগানবাড়ির বন্ধ দরজার বাইরে একা।

পঞ্চুকে ভরসা করে রেখে যায়নি বসাক। রেখে গেছে,—বিরোধের বীজ পুঁতবার জন্যে। বিশ্বাসী কেবল বাহাদুর। পঞ্চুর বেলায় বিশ্বাস হচ্ছে বসাকদের মুখোশ। সেই মুখোশের আড়ালে তাদের আসল মুখ জয়েস ছাড়া আর কেউ দেখেনি।

বাহাদুর এসে পঞ্চুকে খবর দেয়, এক লেড়কি আয়া—।

লেড়কি ?

হাঁ ! খপসুরত এক জোয়ানী—

পঞ্চুর গায়ে ডানা লাগে হঠাৎ। রূপকথার বন্ধ দরজা খুলে যায়

ঝোড়ো মাতাল হাওয়ার এক ধাক্কায়। কেটে যায় গুমোট। তেল, আর ধুলো আর কালিকে মনে হয় মুহূর্তে সোনা আর রুপো আর আশীর্বাদ। নিজেকে মিস্ত্রি মনে হয় না। মনে হয় সম্রাট। পঞ্চুর, তেল-ধুলো-কালি লাগা জীবনে মাতাল ঝোড়ো দমকা হাওয়া ঝুমা। সে এসে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে পঞ্চুর ঘরে।

বাহাদুর তৎক্ষণাৎ রেগে উঠেছেঃ কায় আয়া ইধার? তুমকো কেয়া বোল? খাড়া রানে বোলা নহি—কুকরিতে হাত দেয় বাহাদুর।

রক্তে আগুন ধরানো হাসি হাসে ঝুমা। তার পাশুপাত অস্ত্র ছোড়ে। বাহাদুরের হাত উঠে আসে কুকরি থেকে। ঝুমা হাসতে হাসতেই বলেঃ কেয়া? লেড়কিকো ডরতা? ইসি লিয়ে বন্দুক লেকে খাড়া হায়? বহোৎ বাহাদুর হো তোম! থুঃ—

সত্যি সত্যি থুথু ফেলে মাটিতে ঝুমা।

বাহাদুরের মুখ চোখ লাল হয়ে যায় দারুণ। চলে যাবার জন্যে ছটফট করে, তবু যেতে পারে না। জিজ্ঞেস করেঃ পঞ্চুকো পাস আয়া কায়? মতলব?

একটুও বিচলিত হয় না ঝুমা। বাহাদুরের মুখের ওপর বলেঃ পঞ্চুকো সাদি করনে আয়া—আর দাঁড়ায় না বাহাদুর। পঞ্চু একটা বস্তির মেয়ের সঙ্গে মহব্বত করছে। সে জানে। এই তাহলে সেই জেনানা। পঞ্চুর তকদির মিস্ত্রির চেয়ে অনেক আচ্ছা. স্বীকার না করে উপায় থাকে না তার। বস্তিতে এমন খপসুরত আছে কে জানত!—বাহাদুর গেটে ফিরে যেতে যেতে ভাবে পেছনে যদি দুটো চোখ থাকত আরও, তাহলে ঘাড় না ফিরিয়ে আরেকবার দেখা যেত জোয়ানীকে। যাক, বেরুবে তো তার সামনে দিয়েই। তখন দেখা যাবে দুচোখ ভরে দুপায়ে হেঁটে যাওয়া দুরন্ত যৌবনকে। কথাও ছুড়ে দেওয়া যাবে দুএকটা। নদীর তরতর করে বয়ে যাওয়া জলে যেমন দূর থেকে ফেলে দেওয়া দুএকটা ঢিল। তারপর দাঁড়িয়ে

দেখা,—গোল কাটতে কাটতে কেমন ছড়িয়ে হারিয়ে যাওয়া আলো-ছায়ার অদ্ভুত কাঁপন। বাহাদুর নেপালী; বাহাদুর দরোয়ান। তার হাতে বন্দুক; কোমরে কুকরি। তবুও,—ঝুমাকে দেখে তার মনে না হয়ে পারেনি রুংটার কথা। এমনই ভরপুর ছুকরি যার জন্যে কুকরি বসিয়ে দেওয়া যায় মায়ের পেটের ভায়ের বুকেও। নোকরি ফেলে দেওয়া যায় ছুড়ে, কাল কি হবে এ ভাবনা জাগে না একবারও। মনে হয় খালি, যদি একবার বলে সেই দুরন্ত জোয়ানী,—'হাঁ, রাজি'—। কিন্তু রুংটাও বলেনি বাহাদুরকে, এ জোয়ানীও বলবে না সে কথা। যাকে বলেছে রুংটা, সে তাড়িয়ে দিয়েছিল যেমন মজা লোটবার পর, পঙ্কুও তেমনই এ ছুকরিকে ভাগিয়ে দেবে। আঙুর ভালো করে টসকাবার পর আর দাঁড়াবে না একটুও।

কি হয়েছে তোমার? ঝুমা জিজ্ঞেস করে। বিহঙ্গের ডানা কাঁপতে শুরু করেছে, বাহাদুর যেতে না যেতে।

এ প্রশ্ন তোমায় সিনেমায় আমিই করেছিলাম; কই আমার তো কিছুই হয়নি।

নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। লুকোচ্ছো কেন?

ওসব কথা থাক। তুমি যে হঠাৎ কারখানা অব্দি দৌড়ে এলে? কি ব্যাপার?

আমরা বস্তি ছেড়ে বেহালায় উঠে যাচ্ছি, চাকরি পেয়েছি সাহেব কোম্পানিতে। কাজ করতে হবে না—

আমার কোম্পানি থাকলেও কাজ করতে হতো না তোমায়—

আমার ছবি তুলবে, দাঁড় করিয়ে, বসিয়ে—

রেস্টুরেণ্টের কাজটা ছেড়ে দিয়েছ?

হ্যাঁ, এক হপ্তা হলো প্রায় নতুন জায়গায়। এই দেখো তোমার জন্যে আমার প্রথম ছবিটা নিয়ে এসেছি—

শাড়িপরা ঝুমার ছবি নয়। স্কার্ট পরা। জামার ওপর লাল সোয়েটার রং করা ছবিতে জমকালো দেখাচ্ছে ঝুমাকে।

কেমন হয়েছে ?

আমাকে জিজ্ঞেস করছ ?

হ্যাঁ। নাহলে কাকে জিজ্ঞেস করছি,—দেয়ালকে ?

খুব খারাপ ছবি ; এ তোমার ছবিই নয়—

বৈশাখের রৌদ্ররুক্ষ আকাশ হঠাৎ-মেঘে কালো দীঘির জলের মতো টল টল করে। ছবিটা খামের মধ্যে ভরে নেয় ঝুমা। তারপর সর্পিণীর আক্রোশে লকলকে জিভ বার করে : এ ছবিটা আমার নয় কেন ?

কারণ তুমি জানো না যে তুমি এমনই কত সুন্দর দেখতে—

জানি, নাই জানলাম। কিন্তু আজ যা জানলাম তা কাজে দেবে—

কি সেটা ?

জানলাম যে কেউ কারুর ভালো দেখতে পারে না—

পঞ্চুর মুখ, তেল, কালি, ঘামে জবজবে মিস্ত্রির মুখখানা শেড থেকে এসে পড়া আলোয় আর পঞ্চুর ঘরের অন্ধকারে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। ঝুমা সেই আলোয় দেখলো পঞ্চুর দুটো চোখ জলে ভরে গেছে। ঝুমা বেরিয়ে যাবার জন্যে পা তুলল। চোখের জলের কোনও দাম নেই আজ তার কাছে। মিস্ত্রির চোখের জলের তো নয়ই। ঝুমা বস্তি থেকে নয়, পঞ্চুর জীবন থেকেও আজ চলে যাচ্ছে যখন, তখন তার স্মৃতিচিহ্ন ধরে রাখবার চেষ্টা করে না পঞ্চু। চলতে শুরু করা ঝুমাকে দাঁড় করিয়ে দেয় আঁচল ধরে টেনে।

কি ?

এটা নিয়ে যাও—

ছবির খামটা হাতে গুঁজে দেয় পঞ্চু। ঝুমা আবার পা বাড়ায়, আবার থামায় : বেহালার বাড়িতে ল্যাং ল্যাং করে যেও না আবার কোনওদিন ! আমার বারণ রইল—

না। যাব না। কথা দিচ্ছি। শুধু—

শুধু কি আবার ?

শুধু কখনও দরকার পড়লে এখানে এসো। আমি এ জায়গা পাল্টাচ্ছি না—

ঝুমা একবার থামল। মনে হলো জবাব দেবে। তারপর পঞ্চু দেখল, ঝুমা তার পায়ের চটি দিয়ে একটা কালো ডাঁই পিপড়েকে পিষে দিলে। তারপর আর দাঁড়াল না।

বস্তি থেকে চলে যেতে তোমার মন খারাপ করছে না ঝুমা ?

কেন ? আমি কি বিয়ের কনে ?

এতদিনের পরেও এই বস্তি কি তোমাকে এতটুকু টানছে না, এই বলতে চাও তুমি ?

[illegible] তে চাই—

কেন ?

কারণ, এ বস্তির আমি কেউ নই, এবস্তি থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে আমি বাঁচি—

ঝুমার চোখে প্রিন্স চেয়ে দেখল আজ নতুন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এত আলো ছিল ঝুমার দুটো কালো চোখে প্রিন্সের কখনও স্ট্রাইক করেনি। তাকিয়ে দেখল ঝুমা তাকিয়ে আছে গঙ্গার ওপর শেকল বাঁধা জাহাজের দিকে। এস. এস. মহারাজা।

য়ুট্রাম বুফের দোতলায় বসে ঝুমার চোখ জাহাজের মাস্তুলের আরেকটু ওপরে একটি তারার দিকে তাকিয়েছিল। দপ দপ করে জ্বলে সেই তারা এখনও। দুর্নিরীক্ষ্য এখনও সেই তারার নাম,—খ্যাতি। ঝুমাকে সে হাতছানি দিল জীবনে এই প্রথম। জীবনের দিগন্তে আর দুটি তারার দেখা মেলেনি এখনও। উঠতে দেরি আছে এখনও সেই দুটি তারার। সেই দুটি তারার নাম ঐশ্বর্য আর প্রেম।

য়ুট্রাম বুফের দোতলায় বসেও দোলা লাগে গঙ্গার ঢেউয়ের। কখনও অল্প, কখনও জোর। কখনও বোঝা যায়, কখনও বোঝা

যায় না। দোতলায় চেয়ারগুলো খালি হয়ে গেছে সব। সবাই চলে গেছে। এক কোণে অপেক্ষাকৃত অন্ধকারে বসে আছে প্রিন্স আর ঝুমা। বুফের মালিকের ছেলে প্রিন্সের দারুণ বন্ধু তাই। নাহলে ওদেরও তুলে দিত এতক্ষণে। বুফের দরজা বন্ধ হবার সময় হয়ে এসেছে।

পায়েব তলায় কাঠের মেঝে। তার তলায় জল। অনন্ত। অফুরন্ত জল। তারই ওপর এদিক ওদিক বিরাট জাহাজেরা দাঁড়িয়ে। ছোট, বড়, মাঝারি। কোনটার মাথায় ফ্ল্যাগ। কোনটার মাথায় হার্বার মাস্টারের জাহাজে উপস্থিতির প্রতীক ঝুড়ি বাঁধা। জাহাজ থেকে তীব্র আলো এসে পড়েছে অন্ধকারে কাঁপা একরাশ জলে। তারই পাশে টিমটিম করছে নৌকোর ওপব সামান্য কুপি। মনে হয় জগৎসমুদ্রে ভীষণ বড়লোক আর অতি অসহায় দুই লড়াই কবছে অনাদিকাল ধরে। জাহাজ-বাঁধা আছে বয়ায়। লোহার চেন দিয়ে। মেকি ভদ্রতা, প্যাঁচ, খোশামোদ, আর চালাকির বয়ায় বাঁধা, কীর্তি, অর্থ, রূপ ও প্রতিষ্ঠার জন্যে পাগল জীবনের জাহাজ। কীর্তিহীন, দীপ্তিহীন, নামহীন অন্ধকাবে চিরকাল দাঁড়ান আছে নৌকরা। তাকিয়ে আছে তীরের লোকের দিকে। দিন আনে দিন খায়। লোক পারাপার করে কখনও, কখনও করে মালপত্তর চালান, কখনও পৌঁছে দেয় শৌখীন জলবিহারীকে তাব নিজের মোটরলঞ্চে। জলমৃগয়ায় যাতে জল না লাগে মানুষটার চেয়ে অনেক দামী মানুষটার জামায়।

তুমি বস্তি থেকে চলে যেতে পারলে বাঁচো ঝুমা, আর আমি কিসে বাঁচি জানো?

জানি—

জানো?

হ্যাঁ। আইসোলা বেলা থেকে চলে যেতে পারলে—

ঠিক। কিন্তু কেন জানো?

জানি। ওখানে থাকবার জন্যে তোমায় ভাড়া দিতে হয় না বলে—

এই বুঝেছো ?

না। আরও বুঝেছি এই যে, ওখানে পা দেবার জন্যে একবার আমাকে মুছতে হবে আইসোলা বেলার সিঁড়ি অনেকবার—

একটু থেমে ঝুমাই বলে আবার : আর তারপরে পাঁচটা টাকার বদলে তোমার দাড়িওয়ালা বুড়ো বাবার হ্যাংলামো, তাও—মেনে নিতে হবে।

প্রিন্স চমকায় অন্ধকারে। বাবার কুকীর্তির বাসনার জন্যে নয়। বস্তির একটা নিরক্ষর মেয়ে এমন কথা বলে কোথা থেকে ?

ভাবনার জাল ছিঁড়ে দেয় ঝুমার কথার ঢিল : আমাকে যে তুমি ওখানে নিয়ে এসেছ, আসতে পেরেছ, তার কারণ আমি আর বস্তিতে নেই। আমি জানি তুমি বলবে, যে সে রাতে যে রাতে তোমার গাড়িতে আমি উঠিনি, তখন তো আমি বস্তিতে ছিলাম, তাহলে কেন তুমি আমায় গাড়ির দরজা খুলে ডেকেছিলে, যদি জানতে চাও কেন, তাহলে তাও বলতে পারি—

বলো।

কারণ রাতের অন্ধকারে কোনও রকমে তোমার পাশে গাড়িতে একবার চুপ করে বসতে পারলে আর তোমার লজ্জার কিছু থাকবে না তুমি জানতে। আর তাছাড়া—

তাছাড়া ?

এই শরীর তোমাকে দারুণ টানছিল !

শরীর ছাড়া তোমার আর কিছু নেই—

না। থাকলে তুমি আইসোলা বেলা থেকে বস্তিতে ডাক্তার ডাকার নাম করে যেতে না। তুমি একা নও। তোমার সমাজের সবাই তাই—

একজনও এমন নেই যে—

আরেকটা মিথ্যে বলতে যাচ্ছ। যারা শরীরের জন্যে আমাকে

চায় তাদের মধ্যে মিথ্যে নেই। সব্বনেশে লোক হচ্ছে তারা, যারা মনের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করে, শুধু সময়ে সর্বনাশ করবে বলে, এ সবের কিছুই দরকার হতো না যদি—

যদি ?

যদি আমার পায়ে চটি থাকতো একটা, যেদিন প্রথম দেখেছিলে সেদিন।

চটি ?

হ্যাঁ, ভদ্রঘরের মেয়ের সঙ্গে বস্তির মেয়ের তফাত কোথায় জান ?

কোথায় ?

ভদ্রলোকের মেয়ের পায়ে চটি থাকে, কেউ তার গায়ে হাত দিলে সে চটি খুলে মারতে পারে, কিন্তু মারে না। বস্তির মেয়ের গায়ে হাত দিলে তার ইচ্ছে হয় চটি খুলে মারে, কিন্তু পারে না। কারণ তার পা খালি—

সেদিন তোমাকে যখন গাড়িতে ডেকেছিলাম, তখন তোমার পায়ে চটি থাকলে—

না। তোমাকে মারতাম না। মারতে পারতাম না—

কেন ?

কারণ, তাহলে চারশো টাকা মাইনের এই চাকরিটা পেতাম না। বস্তি থেকে পারতাম না বেহালায় উঠে যেতে ভদ্রলোকের বাড়িতে—

তখন তো তুমি জানতে না যে তোমার চাকরি হবে—

মাসী জানতো। মাসী বলেছিল—

কি ?

দাদাবাবু তোকে ভালবাসে—

তুমি কি বলেছিলে ?

বলেছিলাম। পেটুক যে রকম মুর্গি ভালোবাসে—

আজ যে তুমি আমাকে এসব বলছ, তোমার চাকরির ভয় নেই ?

আছে। কিন্তু তোমাকে ভয় নেই আর—

কেন ?

ওখানে তোমার জন্যে চাকরি পেয়েছি বটে, তবে চাকরি যে এখনও আছে, সে-ও তোমার জন্যে নয়, চাকরি যদি যায় তারও কারণ তুমি হবে না ;—হবে—

হবে ?

মোহন জৈন—

মোহন জৈন কে ?

আমার মালিক এখন। সাহেবদের কোম্পানি কিনে নিয়েছে এখন। তার সঙ্গে এখন বেরুতে হয়।

ছবি তোলবার কাজের চেয়ে এখন বেড়াতে বেরুবার কাজই বড়ো--

প্রিন্স হঠাৎ একটা লম্বা রোল ঝুমার হাতে দিয়ে বলে, নাও। আর এবার ওঠো। তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই।

এটা কি ?

বাড়ি গিয়ে দেখো—

গাড়িতে করে যেতে যেতে প্রিন্স বলেঃ ভদ্রলোকের ওপর তোমার এত রাগ কেন বলবে ঝুমা—

বলব, তোমাকে সব বলব—

এটা আবার কি হলো ?

কোন্‌টা ?

আমাকে বলবে কেন ? আমিও তো ভদ্রলোক—

জানো, আমাদের দুজনেরই কোথাও ভুল হয়ে থাকবে—

ভুল ?

হ্যাঁ। তুমিও ভদ্রলোক নও, আর আমিও নই বস্তির মেয়ে।

গাড়ি এসে পৌঁছল বেহালার নতুন বাড়িতে ঝুমার। নেমে যাবার আগে ঝুমার দুটো হাত ধরে ফেলল প্রিন্স ঃ

তুমি যেখানকার মেয়ে হও, আমি হই যাই, তবু আমরা দুজন দুজনের—

না। তুমি সেই রূপকথার রাজকন্যার যে তোমার পাশে বসেছিল সিনেমা দেখে বেরুবার পর,—তার—

আর তুমি ?

আমি পঙ্খুর—

বাড়িতে পৌঁছেই কৌতূহল বাধা মানল না আর। ইলেকট্রিকের আলোর নীচে মেলে ধরল প্রিন্সের দেওয়া কাগজের গোলাটা। খুলতে খুলতেই বেরিয়ে পড়ল ছবি। তার নিজের ছবি, প্রিন্সের বাবার আঁকা। লোলা কোলড ড্রিংকের ক্যালেণ্ডার। অক্ষর উচ্চারণ করে করে ঝুমা ইয়া বড়, লম্বা-চওড়া নামটা পড়ল।

কি বকছিসরে ঝুমা ?

মালিনী মাসী ঝুঁকে পড়ে ছবির ওপর ঃ ও মা! তোর ছবি—? কার আঁকা রে ?

তোমার দাদাবাবুর বাবার—

আমার দাদাবাবু,—তোর কে রে ?

আমার কেউ না—.

ও নিজের নোকের নাম নিতে নেই, তাই না ঝমা ?

তুমি আবার মদ খেয়েছ ?

খেয়েছি, খেয়েছি, তবু বল তুই, আমি শুনি, দাদাবাবু তোর কে ?

প্রিন্স আমার কেউ নয়। ঝুমা ঠোঁটটা কামড়ায়। তারপর বলে ঃ প্রিন্স হচ্ছে কাগজের গোলাপ।

একটু দূরের কোনও বাড়ির পেটা ঘড়িতে আওয়াজ হলো এগারবার। যুট্রাম বুকের গঙ্গায় সেই বুঝি উদ্দাম জোয়ার এল। থরথর করে কাঁপতে লাগল তার কাঠের শরীর। তখন সেখানে কেউ নেই। একদম খালি, একেবারে অন্ধকার বারান্দায় খুঁজে বেড়াচ্ছে কে যেন কাকে।

ঝুমা যার কাছ থেকে তার দুর্দান্ত শরীর পেয়েছিল তার নাম অনিমা। অনিমা সেই বিরল দেহ, যা পুরুষের মনে কেবল কামনা উদ্রেক করে। অর্থাৎ অনিমার শরীর ছাড়া আর কিছু ছিল না। আর কিছুর জন্যে তার মাথাব্যথাও ছিল না। মন, প্রেম, বন্ধুত্ব, এসব কথার তোয়াক্কাও সে কোনওদিন করেনি। তার বয়স যখন তের তখন তাকে মনে হতো আঠারো। এবং তখনই গরিব ঘর থেকে তাকে তুলে নিয়ে যায় বাড়ির বউ করে জোড়াবাগানের সিংহিরা। সিংহিদের অবস্থা তখন আর আগেকার তুলনায় কিছুই নেই, তবু মরা হাতি লাখ টাকা। সেই বাড়িতে মেজ ছেলে ধীরেন্দ্রর সঙ্গে বিয়ে হলো বটে অনিমার কিন্তু তাকে দেখে হতাশ হলো অনিমা দারুণ। ভয়ঙ্কর রোগা, সাতাশ বছর বয়সেই প্রায় বৃদ্ধ ধীরেন্দ্র হাঁফিয়ে উঠল বিয়ের কয়েক-দিনের মধ্যেই।

দুটো মেয়ে এবং একটা ছেলে হবার পর বিধবা হলো অনিমা উনিশ বছর বয়সে। ধীরেন্দ্র মারা গেলেন হার্টের অসুখে কয়েক মাস ভুগে। মরে বেঁচে গেলেন বলেই মনে হয়। কারণ অনিমা তখন তাঁর স্ত্রী হিসেবে থাকলেও দুজনের মধ্যে এক ছাদের তলায় এক খাটে পাশাপাশি পড়ে থাকা ছাড়া আর কোনও সম্পর্ক ছিল না। অনিমা স্পষ্টই তার এক বন্ধুর নাম করে বলেছিল, হেমেনের সঙ্গে তার বিয়ে হলে অনেক ভালো হত। এ শোনবার পরও হেমেনকে তিনি কোনও দিন আসতে বারণ করেন নি। ধীরেন সিংহি দারুণ ভদ্রলোক ছিলেন জীবনে। মৃত্যুতেও তিনি তাই রয়ে গেলেন। হেমেন আর এলো না এবাড়িতে। অনিমার পেটে

ততদিনে যে বাচ্চা এসে গেছে, কারুর বুঝতে দেরি হলো না সে সন্তান কার। সন্তান প্রসব করতে গিয়ে অনিমা মারা গেল। সিংহিদের ভাইরা অনিমার সন্তানকে স্বীকার করল না। ধীরেন সিংহিকে যে ঝি মানুষ করেছিল সেই সরলা নিয়ে গেল অনিমার মেয়ে-সন্তানকে, নিজের বুকের দুধ খাইয়ে বাঁচাল এবং তাকে বড় করে তুলল নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে। বাড়ি নয়; বস্তি। সেই বস্তিতে সে বড় হয়ে উঠল দিনে দিনে সরলার নাতনি হিসেবে, তারই নাম ঝুমা। ঝুমার এই পূর্ব পরিচয় এখানে বলে না নিলে, এখনই বলে না নিলে, পরে আর সময় পাওয়া সম্ভব হতো না তাই।

ঝুমা জানে তার বাবা ভদ্রলোক, মা বড় ঘরের বউ। এটুকু তাকে সরলা লুকোয়নি। কিন্তু কে তার বাবা, কি তার পরিচয় ঝুমা আজও জানে না। শুধু জানে বস্তি থেকে তাকে আইসোলা বেলায় উঠতে হবেই একদিন। যতক্ষণ সেখানে না পৌঁছচ্ছে ততক্ষণ সে ওঠবার জন্যে যার সঙ্গে যা করার নয়, তার সঙ্গে তাই করবে। তারপর একবার উঠতে পারলে ওখানে, যেখান থেকে হাত বাড়ালেই মুঠোর মধ্যে প্লাসটিকের সাদা একখানা থালা, মানুষ যখন বোকা ছিল তখন যাকে নিয়ে সে লিখেছে গান আর কবিতা আর রূপকথা, সেই চাঁদ; যেখানে একটু অসাবধান হলে চুলে ধরে যেতে পারে তারার আগুন, সেইখানে পৌঁছতে পারলে একবার তার মায়ের প্রতি তার বাবার ব্যবহারের সুদ সুদ্ধ আসল দেনা শোধ করে দেবে সে। এই পৃথিবী একবার জানবে যে মাতৃঋণ শোধ করা যায়।

সেখানে পৌঁছবার প্রথম ধাপে পা দিয়েছে ঝুমা যখন তার বয়স সবে পনের। শেষ ধাপে তাকে পা দিতে হবে শরীরের নদীতে যখন যৌবনের বান ডাকার বেলা বয়ে যাওয়া শেষ হয়ে যায়নি। মডেল থেকে তাকে হতে হবে অভিনেত্রী। লেখাপড়া জানে না সে। সাহায্য করবার নেই কেউ। ফিলম ছাড়া আর কোন্ রাস্তায় সে

মজাতে পারে নির্বোধ বড়লোক ভদ্রসন্তানদের। অভিনয় তার রক্তে। শরীর তার সব চেয়ে বড় সহায় হাতিকে পাঁকে ফেলার খেলায়। এই শরীরকে সে নষ্ট হতে দেবে না। চিরকালের মরীচিকা করে রাখবে—যে মরীচিকায় পথ হারাবে যারা তাদের কঙ্কাল ছাড়া আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কিছু।

ব্যতিক্রম শুধু একজন। পঙ্কু। পঙ্কুর কাছে ঝুমা আলেয়া নয়। আলো।

কী ব্যাপার! একা?

কেন একা আসতে নেই?

কখনও তো আসনি এর আগে প্রিন্সকে ছাড়া। ডিলাইলাকে সামসন ছাড়া দেখতে অভ্যস্ত নই তাই সারপ্রাইজড—এই আর কি'—কেয়ার চোখে কৌতুকের কটাক্ষ।

আমি ডিলাইলা নই তোমার প্রিন্সের—

ডোণ্ট বি সিলি, রিনি, কি হয়েছে, ঠিক সময়ে এপয়েণ্টমেণ্ট রাখেনি—

আর কোনও দিন রাখবেও না এপয়েণ্টমেণ্ট তোমার দাদা—

গদগদ সেন্টিমেণ্ট আমার দুচক্ষের বিষ তুমি জানো, টেল মি হোয়াটস রং—দাঁড়াও, তার আগে একটা নতুন সিগারেটা খাওয়াই তোমায়,—এদেশে পাওয়া যায় না,—নাও—।

সিগারেট হাতে নিয়ে রিনি নামটা পড়ল, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে।—সাদার ওপর লালে লেখা—গ্ল্যামার।

সিগারেটটা ধরিয়ে দিল কেয়া—প্রিন্সের কাজন।

রিনি চুপ করে বসে রইল অন্ধকার ঘরে। আলো জ্বালল না কেয়া রিনির আপত্তিতে, অন্ধকারে সিগারেটের আগুনে রিনির মুখটা জ্বলে, আবার একটু নেভে। ভেসে যাওয়া মেঘে যেমন চাঁদের মুখ একবার ঢাকে, একবার বেরোয়। কেয়া অনেকক্ষণ বাদে বলল: চুপ করে থেকো না রিনি, ফর হেভেনস সেক টক,—ডোণ্ট হোল্ড ইয়া টাং—

বলছি। সব বলছি তোমাকে। প্রিন্স যদি আমার চেয়ে আর

কাউকে পছন্দ করে বেশি, তাতে আমি দুঃখ পাব, কিন্তু তবু প্রিন্স যদি তাতে হ্যাপি হয়, সে দুঃখ হাসিমুখে সইতে আমার আনন্দ—

বলতে বলতে কেঁদে ফেলল রিনি ঝরঝর করে। রৌদ্ররুক্ষ আকাশ ছাপিয়ে জীবনে এই প্রথম মাধুরি নামল কঠিন মুখে। পরমাশ্চর্য মেয়ে বলে মনে হলো রিনিকে আজ কেয়ার। কেয়া সিন করা পছন্দ করে না। নিজেও না, অন্য কেউ করলেও, না।

তবু আজ সে রিনিকে কাঁদতে দিল। অশ্রু কোনও মুখকে জীবনের মুকুর করে তোলে কখনও যে, কেয়া তা জানত না। সেই মুকুরে আজ রিনির পেন্ট করা মুখোশের আড়াল সরে যাওয়া মুখকে দেখতে পেল এই প্রথম।

তোমার দাদা প্রিন্স যে নতুন মেয়ের মধ্যে স্বর্গের স্বাদ পেয়েছে, সে মেয়ের নাম ঝুমা। শাইসোলাবেলার পেছন দিকে যে বস্তি সেইখানে সে থাকে। প্রিন্সদের বাড়িতে যে বুড়ি ঝি কাজ করে, তার নাতনি।— রিনি চোখের জল না মুছেই বলতে থাকে।

ঝুমার সঙ্গে প্রিন্সের দেখাটা হোলো কোথায়? ইডেন গার্ডেনে বোধ হয়—

এতখানি মেলোড্রামার মধ্যেও হাসির সরু রেখা দেখা দিল রিনির ঠোঁটে। দিয়েই মিলিয়ে গেল অবশ্য। তার পর আবার বিষণ্ণ ভগ্ন কণ্ঠে উচ্চারিত হলো: টেনিস বলটা একদিন লন পেরিয়ে বস্তির মধ্যে গিয়ে পড়ে, ঝুমা বলে সেই ক্যাড মেয়েটা বলটা চুরি করে। গ্রাউণ্ডবয় গোবিন ফিরে আসে খালি হাতে। তখন প্রিন্স গোবিনকে নিয়ে যায় বস্তিতে। আর সেই প্রথম দেখাতেই প্রিন্স মজে—

আর ঝুমা বলে যে নোংরা মেয়েটার কথা বলছ, সে? সে-ও কি?

ডোণ্ট বি সিলি কেয়া, সে তো হাতের মুঠোর মধ্যে চাঁদ পেয়েছে—

প্রিন্সের সঙ্গে তোমার এর মধ্যে দেখা হয়নি একবারও?

একবার হয়েছে, দুজনে ছবি দেখতে গিয়েছিলাম লাস্ট একসঙ্গে—

কিছু বুঝতে পেরেছিলে ? কুড য়ু গেস এনিথিং ? এনিথিং রং ?

সিয়েরিয়াস কিছু মনে হয়নি। শুধু—

শুধু ?

য়ু নো, একা থাকলে ছেলেরা একটু দুষ্টুমি করবার চেষ্টা করে। প্রিন্স বরাবরই বাড়াবাড়ি করে, কিন্তু ছাট ইভিনিং হি সেড এ ওয়াড অ ট্যু, নেভ ডিড এনিথিং, আমাব হাতটা পযন্ত ধরেনি সেদিন প্রিন্স।

ছেলেদেব এই লাই দিয়ে দিয়েই আমরা মাথায় তুলি। বিয়ের আগেই বিয়ের উত্তেজনা মিটে যায়,—হিয়া য়ু আ ওল রং—

আর কাউকে তো ও পর্যন্ত এগুতে দিই না। বাট প্রিন্স—হি ইজ এন একসেপশন—

নো, ট্রিট দেম ওল এলাইক। আমি তো আমার সব বয় ফ্রেণ্ডকেই বলি, দাস ফা এণ্ড নো ফার্দা।—

তার কারণ তুমি কখনও ভালোবাসনি কাউকে—

তুমি বেসেছ ?

স্বয়া। আমার চেয়ে ভালো কেউ বাসেনি কখনও কাউকে—

তুমি সত্যিই বিশ্বাস কর, ভালোবাসা বলে র‍্যালি কোনও বস্তু পৃথিবীতে আছে, ছিল কোনও দিন—

ভালোবাসাই শুধু আছে। আই লিভ ওনলি হোয়েন আয়াম ইন লাভ—

ভালোবাসা কাকে বলো তুমি ?

কারুর জন্যে আমার অকারণে কাঁদাকে বলি ভালোবাসা—

তাই যদি হয় তো আমার জন্যে তুমি অকাবণে কাঁদতে পার না কেন ? ভালোবাসার জন্যে একজন ছেলের দরকার হয় কেন ?

জানি কেন দরকার হয়। ভালবাসার মূলে সেক্স—

হ্যাঁ। ওই সেক্সই সত্য। ভালোবাসা হচ্ছে সেক্সের গায়ে কাপড়

পরানো। আমরা যেমন সভ্যতার দায়ে কাপড় পরতে অভ্যস্ত হয়েছি, সেক্সের বেলাতেও তেমনি কুকুর বেড়ালের মতো সকলের চোখের ওপর যা ইচ্ছে তাই করতে লজ্জা পাই ভালোবাসার বোরখা ঢাকা দিই তাই, সেক্সের সর্বাঙ্গে।

সেক্স ছাড়া আর কোনও সত্য নেই তুমি বলতে চাও—

আছে। আমাদের লাইফে তিনটি সত্য,—সেক্স, মানি এণ্ড ডেথ—

বাইরে অন্ধকারে ঝড় উঠল কেয়ার কথা শেষ হবার আগেই। প্রচণ্ড গর্জনে এল হুমড়ি খেয়ে জানলায় দরজায় গাছের গায়ে। ধাক্কা দিয়ে উল্টে তছনছ করে দিতে চাইল সব। পরিপাটি করে অনেক যত্নে, অনেক গড়ে পিঠে, অনেক সাবধানে দিনে দিনে তৈরি করেছে যাকে মানুষ, প্রকৃতি তার মুখের ওপর হেসে উঠল হা-হা করে। মেঘের গর্জনে বুক কেঁপে উঠল রিনির। মনে হলো পৃথিবীতে আশার আর ভালোবাসার আর বিশ্বাসের দিন অবসান এল আসন্ন হয়ে। শূন্য মাঠে বাজ পড়ল খুব কাছেই। সেই আওয়াজে দুকান চাপা দিলো রিনি। কেয়া অন্ধকারেই সিগারেট ধরাল লাইটার জ্বেলে।

লাইটারের আলোয় কেয়ার মুখ দেখছে রিনি। কেয়া তবু কেয়া নয়। একটা জীবন্ত নাগিনী যেন রিনিকে ছোবল দেবার আনন্দে দুলছে। তার ফনা আছড়ে পড়বার জন্যে এপাশ ওপাশ হেলছে। দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলল রিনি। আর সেই সময় বেজে উঠল শাঁখ। মুখ তুলল সেই শব্দে আবার রিনি মিত্তির। শাঁখের নয়। আশা, ভালোবাসা আর বিশ্বাসের নির্ঘোষ। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রিনি। বন্ধ জানলা খুলে দিল গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে। ঝড়ের অট্টহাসি এসে ঢুকল ঘরে। তার চোখের জল গায়ে মুখে এসে লাগল রিনির। বাজ পড়ল আবার কোথায়। সমস্ত আকাশ আলো হয়ে অন্ধকার হয়ে গেল আবার। কেয়া চীৎকার করে উঠল: জানলা বন্ধ কর রিনি—

কেন ?

পাগলামি করিসনে, বাজ পড়ছে—নিজেও মরবি আমাকেও মারবি—

সেক্স, মানি, আর ডেথ এই তিনটেই তো কেবল সত্যি কেয়া,—মরতে ভয় কিসে ?

রিনি' কথার অথবা ঝড়ের চাবুকে কে জানে মুখ ঢাকে দুহাতে কেয়া। জানলা বন্ধ করে দেয় রিনি। এসে বসে কেয়ার মুখোমুখি। অনেকক্ষণ বাদে মুখ তোলে কেয়া। রিনি তাকিয়ে দেখে। না। নাগিনীর মুখ নয়। ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে কেয়ার মুখোশ।

রিনির বাবা স্যার হেমেন দাঁড়িয়ে ছিলেন দোতলায় ব্যালকনিতে। নিবে আসা পাইপ মুখে করে তাকিয়ে ছিলেন ঝড়ের আকাশের দিকে। ঝড় তাঁর বন্ধু। ঝড় তার সব চেয়ে বড় উদ্দীপনা। জীবনের আকাশ অন্ধকার করে ঝড় এসেছে যতবার, ততবার এগিযে গেছেন তিনি। জীবন আরম্ভ করেছিলেন সিঁড়ির সব চেয়ে নীচু ধাপ থেকে, যেখানে এসে আজ দাঁড়িয়েছেন তার পর আর ধাপ নেই। মানুষের চেষ্টায় যা সাধ্য তা আয়ত্ত হয়েছে দিনে দিনে। টাকা, খ্যাতি, ক্ষমতা হাতের মুঠোয় এসেছেই শুধু। যাবার পথ খুঁজে পাবে তারা আবার, এমন সুযোগ তাদের দেয়নি স্যার হেমেনের হাত। একটু আলগা দেননি কখনও বজ্র মুষ্টিকে তিনি। সাফল্য এখন তার পায়ের তলায় অ্যালসেসিয়ানের বাচ্চার মতো লুটিয়ে আছে। বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করেন না আর নতুন কোনও উত্তেজনার আস্বাদ পা'ন না সাফল্যের রক্তের স্বাদ-পাওয়া এই বৃদ্ধ বাঘ। এখন কেবল চেয়ে থাকা। এখন কেবল চেয়ে থাকা একজনের স্বপ্নে। সে আজ নেই। কিন্তু তার গর্ভে স্যার হেমেনের সন্তান আজও কোথাও নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। কিন্তু কোথায় ?

সে সন্তানকে নিজের বলে দাবি করবার সেদিন উপায় ছিল না।

কারণ বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে সীমা অতিক্রম-করা সংসর্গের উপহার সেই সন্তান যখন হব হব করছে তখন তিনি পৃথিবী পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন নতুন নতুন হীরে জহরতের দর কষে কষে। ফিরে এলেন যখন কলকাতায় তার সাত আট বছর আগে স্যার হেমেনের সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেছে তাঁর বন্ধুর বিধবা অনিমা। এবং তাঁর মেয়ে-সন্তানকে স্বীকার করেনি বন্ধুর বাড়ির লোকেরা। যে বুড়ি ঝিকে দিয়ে দিয়েছিল সেই মেয়েকে বন্ধুর পরিবারের সবাই, সেই ঝিকে খুঁজে পাননি স্যার হেমেন কোথাও।

কিন্তু এখনও তাঁর অপেক্ষা শেষ হয়নি। সে মেয়েটিকে তাঁর খুঁজে বার করতেই হবে পৃথিবীর যে প্রান্তেই সে থাক। তিল তিল করে কামনা বাড়িয়েছে যে একদিন স্যার হেমেনের, সেই কামনার তিলোত্তমার প্রতি তিনি যে অন্যায় করেছেন তার প্রায়শ্চিত্ত তাঁকে করে যেতেই হবে। সমস্ত বাসনাকে করে তুলতে হবে সোনা। সেই সোনার মুহূর্তটির জন্যে তিনি পথ চেয়ে বসে আছেন। যে করুণ রঙ্গিন পথ দিয়ে আসবে তার ভালোবাসার ধন,—সে তাঁর সমস্ত পাপকে পুড়িয়ে করে দিয়ে যাবে পরিশুদ্ধ। যে পারবে একাজ করতে, সে না আসা পর্যন্ত ছুটি নেই স্যার হেমেনের।

গাড়ি বারান্দার তলায় সর্বাঙ্গ দিয়ে জল ঝরিয়ে এসে দাঁড়ায় একটি মেয়ে। ওপর থেকে দেখে ভারি মায়া হয় স্যার হেমেনের। বেয়ারা রঘুকে পাঠান ওকে ঘরে বসতে বলার জন্যে। রঘু এসে বলে, মেয়েটা ঘরে আসতে চায় না। বৃষ্টির দাপট একটু কমলেই চলে যাবে বলছে। স্যার হেমেন নীচে নামেন কি মনে করে। গিয়ে দাঁড়ান গাড়ি বারান্দার তলায় যেখানে মেয়েটা শীতে কাঁপছে ঠকঠক করে। শাড়ির আঁচল চিপে জল বার করছে অঝোরে। মাথার চুল বেয়ে জল নামছে মুখে, গালে, বুকে। মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে মমতায় ভরে গেল স্যার হেমেনের কঠিন হৃদয়।

বুড়ো লোককে কষ্ট দিলে পাপ হয় তুমি জানো?

ছি, ছি, আপনি নীচে নামলেন কেন ?

তুমি ভেতরে এলে না বলে—

বৃষ্টিটা একটু ধরলেই চলে যেতাম—

জানি। চিরকাল আমিও তোমায় ধরে রাখতাম না। গাড়ি বারান্দার তলায় দাঁড়াবে কেন, তাই বলেছিলাম ভেতরে এসে বসতে, অন্যায় তো কিছু বলিনি—

না, না, অন্যায় বলবেন কেন ? আপনি তো আমার বাবার মতোই। একটু কেঁপে গেল মেয়েটির গলা। ঠাণ্ডায় না উত্তেজনায় বলা শক্ত। একটু থেমে আবার সে বলল। এত বড় বাড়িতে ঢুকতে ভয় করে—

কেন ?

আমি যে বস্তিতে মানুষ বরাবর—

জানো, আমিও একদিন বস্তিতে ছিলাম। সে কথা থাক, কি নাম তোমার ?

আমার নাম ঝুমা—

স্যার হেমেন হঠাৎ সচেতন হন, লজ্জিতও হন রীতিমতো। বলেন : এই দেখো যে জন্যে নীচে নামা তা-ই ভুলে বকবক করে চলেছি,—বুড়ো লোকের ওই দোষ। নাও—ভেতরে যাও, জামাকাপড় ছেড়ে ফেল, আমার মেয়ের—

কথা শেষ হলো না স্যার হেমেনের। চেনা হর্নের আওয়াজে দাঁড়িয়ে গেলেন। রিনি এল গাড়ি করে।

ওই আমার মেয়ে এসে গেছে, আর তোমাকে আমায় সহ্য করতে হবে না। রিনি,—এই মেয়েটি একদম ভিজে এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। ভেতরে আসতে ওর ভারি ভয় আমাকে। তুমি এসে গেছ, আর ভয় নেই। একে ভেতরে নিয়ে গিয়ে জামাকাপড় ছাড়িয়ে দাও, গরম কফি দাও এক পেয়ালা, তারপর বাড়ি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা কর।

চলে যেতে যেতে স্যার হেমেন ঘুরে দাঁড়ান। তোমার নামটা কি বলছিলে মা ?

আমার নাম ঝুমা—

কি নাম বললে তোমার ?—হৃৎপিণ্ডের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল নাকি রিনিব ?

আমার নাম ঝুমা,—দ্বিতীয়বার বলল ভিজে কাপড় না-ছাড়া দারুণ সেক্সি সেই মেয়েটা। কয়েক দিন আগেও যে বস্তিতে থাকত, এখন থাকে বেহালায়, একটা বাড়িতে। কয়েক দিন আগে সে ছিল ঝিযেব মেয়ে, এখন ফোটোগ্রাফারের মডেল।

আমাব সঙ্গে এসো। আমার নাম—

তোমার নাম রিনি—

ও, হ্যা, বাবাব মুখেই তো শুনলে, না ?

না। তোমার বাবাব আগেও আরেকজনের মুখে শুনেছি তোমার নাম। একবার নয়, এতবার যে তোমাব নাম আমার ভোলা অসম্ভব।

কার কাছে ?

বলব ?

বলো—

তোমার প্রিন্সের কাছে—

তোমার প্রিন্স—ঝুমার মুখে দুটি শব্দ রিনির দুগালে দুটি চাবুকের দাগ এঁকে দিল।

ঝুমার জামাকাপড় ছাড়িয়ে, তাকে কোকো খাইয়ে, নিজে গাড়ি চালিয়ে বেহালার নতুন বাড়িতে পৌঁছে দিতে দিতে রিনি এতক্ষণ পরে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। জিজ্ঞেস করলে স্পষ্ট করে, অকৃত্রিম কণ্ঠে : প্রিন্স আমার বন্ধু, তোমার বন্ধু নয় ?

না।

কেন ?

কারণ, তেলে আর জলে কখনও মিশ খায় না যে, একথা জানবার জন্যে তোমার মতো অনেক বই পড়বার দরকার হয় না—

মানে ?

আইসোলা বেলা আর বস্তিতে কখনও বন্ধুত্ব হয় না—

তুমি তো বস্তিতে আর নেই এখন।

কয়লা ধুলে তার গায়ের রং সাদা হবে না কোনও দিন।

কিন্তু আগুনে ঝাঁপ দিতে চায় যে পোকা সে বস্তির আগুন দেখে পিছুবে কেন ?

কারণ সে আসল পোকা নয়, সে বড়লোক, সে ভদ্রলোক—

ভদ্রলোকের ওপর তোমার এত রাগ কেন ?

তার কারণ আমার বাবা ভদ্রলোক ছিল, আমার মাকে খুন করে, আমাকে বস্তিতে নামিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে—

এমন আচমকা, এমন দুম করে, এমন অনায়াস নির্লজ্জ কথাটা বলে ফেলল প্রথম আলাপের কয়েক মিনিটের মধ্যে যে রিনি রাশ করতে বাধ্য হলো।

বস্তিতে এরকম ব্যাপার ঘটে না বলতে চাও ?

খুব ঘটে।

তবে ?

বস্তিতে ঘটলে কেউ অবাক হয় না, সবাই বলে, বস্তিতো, ও আর কত ভালো হবে। কিন্তু ভদ্রলোকের বাড়িতে বাড়িতে এই এক চরিত্র, এই এক নোংরামি ঘরে ঘরে। তবু ভদ্রলোকের বজ্জাতিতে কেউ জন্মালে তাকে বস্তিতে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু বস্তির মেয়েকে আনা যাবে না বাড়িতে, তাকে গাড়িতে নিয়ে ঘুরতে হলে চাকরি জোগাড় করে দিতে হবে ভালো জায়গায়, তুলে এনে বসাতে হবে ভদ্রলোকের পাড়ায় ভালো দোতলা বাড়িতে, তার সঙ্গে অশ্লীল কথা, গায়ে হাত দিয়ে ছাড়া বলা যাবে না। সে আপত্তি করলে, শুনতে

হবে সে বস্তির মেয়ে, এ সবে আপত্তি তার মুখে মানায় না। চমৎকার—

কিন্তু তুমি কি জানো ঝুমা, যে তোমা‘ সঙ্গে দেখা হবার পর, প্রিন্স আর আমার কাছে আসে না—

জানব না কেন ? রোজই কোনও না কোনও ছুতোয় সে আমার সঙ্গে দেখা করে, কিন্তু সে কেন আসে আমার কাছে তা আমার চেয়ে ভালো আর কে জানে ?

কেন আসে ?

আমার এই শরীরের জন্যে, আর কেন ?

তোমার চেয়ে ভালো দেখতে মেযে নেই আর ?

আছে—

তাহলে ?

প্রিন্সের চোখে আমাব চেয়ে ভালো দেখতে কেউ পড়েনি, তাছাড়া আমি বস্তির মেয়ে, আমাকে পাওয়া অনেক সোজা—

তুমি কি বলতে চাও, বড়লোক কেউ বস্তিব মেয়েকে ভালোবাসতে পারে না সত্যি সত্যি—

পাবে—

তবে ?

সে পারে বায়স্কোপে, গপ্পের বইতে পারে, খুব সহজেই পারে, কিন্তু জীবনে তা পারে না কেউ—

কেন ?

তার প্রমাণ, আমি যদি দেখতে খারাপ হতাম, যদি মুখময় বসন্তের দাগ থাকত আমার, যদি একটা চোখ কানা হতো, যদি কালো, মোটা, বেঁটে, কুৎসিত চর্বির দলা হতাম আমি, তাহলে তোমার প্রিন্সের সঙ্গে দেখাই হতো না আমার, দেখা হলেও একবার হতো, দ্বিতীয়বার দেখতে যেত না আমাকে প্রিন্স, আমার দিদিমাকে ডাক্তার দেখানোর নাম করে। তাছাড়া আমি জানি—

কি জানো তুমি ?—বিনির গলা উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে।

জানি যে প্রিন্স তোমাকে ভালোবাসে। আমার কাছে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সে তোমার কথাই বলে।

বলতে বলতেই ঝুমা মনে মনে খুব হাসে। এত বড় মিথ্যে কথা এমন নিদারুণ সত্য মনে হয তাব নিজেরই কানে যে নিজের অভিনযক্ষমতা সম্পর্কে সে নিজে নিঃসন্দেহ হয় আরেকবার।

রিনি ক্ষুব্ধকণ্ঠে কেবল বলেঃ তোমাব শবীর আব আমার মন, একসঙ্গে দুটো চাইলে চলবে কেন ?

খুব চলবে। তোমাদের সমাজ মানেই তো তাই। বিয়ে করব একজনকে, ভাবব আরেকজনকে, গায়ে হাত দিতে দেব হয়তো আরও একজনকে,—একেই তো তোমরা সভ্যতা বলো না ?

বস্তিতে তুমি এত কথা শিখলে কখন ?

বই পড়ে শিখিনি. চোখে দেখে জেনেছি, তাই মুখস্ত করবার জন্যে মাথা ঘামাবার দরকার হয়নি আমার—

বেহালার বাড়ির কয়েক হাত দূর থেকেই, প্রিন্সের গাড়ি দেখা গেল দূর থেকে ঝুমার বাড়িব সামনে দাঁড়িয়ে। ঝুমাকে গাড়ি থামিযে নামিয়ে দেয় রিনি সেইখানেই ঃ

প্রিন্সকে বোলো না আমি তোমায় নামিয়ে দিয়ে গেছি—

এখন আর আমাকে ওসব শেখাতে হয় না। দুদিনেই আমি শিখে গেছি, তোমাদের সমাজের একজনের কথা আরেকজনকে বলতে নেই কখনই। বললেও, যা একজন বলেছে তা বলতে নেই, যা বলেনি তাই বলতে হয় বানিয়ে।

আরেকবার গাঙ্গুলীদের বেচে দেওয়া পাঁচ নম্বর বস্তি চাবুক বসিয়ে দেয় সপাং করে আইসোলার গালে।

এক তলায় বসবার ঘরের জানলা দিয়েই ঝুমা দেখতে পায় প্রিন্স একা নেই। তার সঙ্গে আরও তিনজন ছোকরা বসে। এবং একজন মাঝ বয়সী কাঁচা-পাকা চুল। ঘরে ঢুকতেই প্রিন্স চেঁচিয়ে ওঠে ঃ ঝড়ে

আটকা পড়েছিলে তো? একটু থেমে যায় ঝুমার দিকে তাকিয়ে প্রিন্স। একটু অন্যমনস্ক হয়। কেউ বুঝতে পারে না, ঝুমা ছাড়া। ঝুমা নিজের সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নেয়। বুঝতে পারে না কি দেখে প্রিন্স কথার খেই হারিয়েছে এই মাত্র। একটু থেমে গিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে জ্বলে ওঠে প্রিন্স: ইনি হচ্ছেন কুমার দাশগুপ্ত, বিখ্যাত ফিল্ম ডিরেকটর। এঁর নাম নিশ্চয়ই জানো—

ঝুমা দুহাত তুলে নমস্কার করে বলে: আমার নাম ঝুমা—

না। কাঁচাপাকা-চুল কুমার দাশগুপ্ত মাথা ঝাঁকান: তোমার নাম সুতনুকা। তোমার স্ক্রীন নেম।—প্রিন্স সেকেণ্ড করে কুমার দাশগুপ্তর প্রস্তাব: চমৎকার নাম পর্দার পক্ষে, সুতনুকা—

গাছে না উঠতেই এক কাঁদি হয়ে যাচ্ছে না ব্যাপারটা?

না। তোমাকে আমরা নেবই আমাদের নতুন ছবি, 'সাতনম্বর সেল' এ। পরশুদিন তোমার গলা, এবং ক্যামেরায় তোমার ছবি কেমন আসবে, তাব টেস্ট নেব। তারপর কনণ্ট্রাক্ট সই হলে, শুটিং শুরু হবে—সেপ্টেম্বর মাসেব এগারই। মহরত হবে তোমার শট দিয়ে—

কুমার দাশগুপ্তের সঙ্গে আসা তিন ছোকরার একজন বলে: রেডি থাকবেন পরশু, দুপুর তিনটেয়। গাড়ি আসবে আপনাকে নিতে—

কুমার দাশগুপ্তের দল চলে যেতেই প্রিন্স জিজ্ঞেস করে: রিনির বাড়ি থেকে আসছ বুঝি? সমস্ত মুখ লাল হয়ে যায় ঝুমার মুহূর্তে। ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জা, যেন চুরি করেছে। মুহূর্তের মধ্যে ঝুমা বুঝে ফেলে এখন, তখন যা বোঝেনি। অর্থাৎ তার ধরা পড়ে যাবার কারণটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার নিজের কাছে হঠাৎ। প্রিন্সও বুঝতে পারে, ঝুমা বুঝেছে তবুও বলে: রিনিকে এই শাড়িটা আমি দিয়েছিলাম, তাব গত জন্মদিনে—

রিনি এই শাড়িটা আমাকে পরিয়ে দারুণ ভুল করেছে। মুখ উঁচু করে বলে ঝুমা।

কেন ?

ধরা পড়ে যেতাম না, তাহলে—

ধরা পড়বার এতে কি আছে। তুমি রিনির বাড়িতে যেতে পারো না ?

না। আমার ধরা পড়ার কথা নয়—

তবে।

রিনি তোমাকে বলতে বারণ করেছিল—

কি ?

যে আমাকে সে এখানে নামিয়ে দিয়ে গেছে—

একটু চুপ করে যায় প্রিন্স। ফর্সা কপাল বেয়ে চোখের ওপর এসে-পড়া এক গোছা কালো চুল মাথা ঝাঁকি দিয়ে ওপরে তুলতে না পেরে, হাত দিয়ে যথাস্থানে উঠিয়ে দিয়ে তারপর জিজ্ঞেস করে একটু বেশি, একটু চেষ্টা-করা নিরুত্তেজ গলায়ঃ রিনির সঙ্গে কোথায় দেখা হলো তোমার ?

ঝড়ে পড়ে গিয়ে ঢুকেছিলাম যে বাড়িতে না জেনে, সেটাই রিনির বাড়ি।

রিনির বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

হ্যাঁ। উনিই তো ভেতরে নিয়ে গেলেন, আমি যাচ্ছিলাম না, রিনি তখন বাড়ি ছিল না—

চমৎকার লোক ওই ওল্ড ম্যান, ওঁর নাম স্যার হেমেন—

প্রিন্সের কথার ওপরই মেঝেতে একটার বেশি চায়ের কাপ আর পেয়ালা পড়ে ভেঙ্গে চূরমার হয়ে যাবার শব্দ কানে আসতেই ঝুমা দৌড়ে বেরুল ঘর থেকে। ওই শব্দে প্রাণ উড়ে গেছে তার। পেয়ালাগুলো অনেক দাম দিয়ে নতুন কেনা। তেমন কেউ এলে তবেই বার করার কথা। গিয়ে দেখে, সরলার হাত থেকে পড়ে গেছে ট্রেসুদ্ধ কাপ পেয়ালা সব। সরলা দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যাচুর মতো।

কি হলো আবার তোমার? দামী পেয়ালাগুলো দিলে তো' শেষ করে?

কি নাম বললে রে দাদাবাবু?

কার নাম?

রিনির বাবার—

স্যার হেমেন। কেন?

আমাকে একবার নিয়ে যাবি রিনির ওখানে?

সে হবে, তার জন্যে এত তাড়া কিসের?

না। কালই, কাল সকালেই আমাকে যেতে হবে বাছা—

ঝুমা আর সরলার কথা কাটাকাটির মধ্যে উঠে এল প্রিন্স: কি হয়েছে বুড়ি মা, রিনির বাবার কাছে যাবে তুমি, এই তো?

হ্যাঁ কাল ভোর হলেই যাব। আমায় যেতেই হবে। নিয়ে যাবে তুমি?

নিয়ে যাব—

অনেক রাত্তিরে ঘুম ভেঙ্গে গেল সরলার। কে যেন তাকে ডাকছে। অনেক দূর থেকে। অনেক কষ্টে। কে? ঘুমের মধ্যেই জিজ্ঞেস করে সরলা।

আমাকে তুমি চিনতে পারছ না? অন্ধকারের গলা থেকে উঠে এল একফালি শব্দের আলো। তাকিয়ে দেখল সরলা। উঠে বসল সরলা ধড়মড় করে: ছোটোবাবু?

হ্যাঁ। আমার মেয়ে কোথায়? তাড়াতাড়ি কর, আমার আর সময় নেই—

সরলা উঠে গিয়ে দুমদুম করে ঝুমার দরজায় ঘা দেয়: ঝুমা লক্ষ্মীটি,—দরজা খুলে দে।—দরজা খুলে বেরিয়ে আসে ঝুমা। একদম উলঙ্গ। শোবার সময় ঝুমা গায়ে কাপড় রাখতে পারে না কিছুতেই। ঘুম হয় না তার। কাপড় না পরে শোয় ঝুমা। এক কুচি সুতোও

গায়ের কোথাও লেগে থাকলে যন্ত্রণায় ছটফট করে ঝুমা। যেন বিছে কামড়েছে।

কি হয়েছে? ঝুমার গলা বেয়ে ঘুম ভাঙ্গানোর অজস্র বিরক্তি তরতর করে নেমে আসে। ন্যাংটো বিরক্তি। তার শরীরেরই মতো। সে বিরক্তি বিন্দুমাত্র গোপন করে না সে।

হ্যাখ, কে এসেছে?

কে?

তোর বাবা—

আজ সন্ধ্যে থেকে তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। শুতে যাও। কেউ আসেনি।—দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেয় সরলার মুখের ওপর ঝুমা।

ঘুরে দাঁড়ায় সরলা। কেউ নেই কোথাও। নির্জন, নিঃঝুম, নগ্ন অন্ধকার থই থই করছে ঘরময়।

'কেউ আসে নি?' জিজ্ঞেস করে সরলা। নিজেকে জিজ্ঞেস করে কথাগুলো উচ্চারণ করে। দড়াম করে ছিটকিনি দেওয়া দরজা খুলে যায় এতটুকু হাওয়ার আভাস ছাড়াই। অন্ধকারে আলো হয়ে যায় সরলার অসম্ভব কালো, অসম্ভব কুৎসিত মুখ। নিশ্চয়ই এসেছিল ঝুমার বাবা। চলে যাবার আগে জানিয়ে দিয়ে গেল ছোটবাবু যে সে এসেছিল। সন্দেহ নিরসন করে গেল সরলার।

দড়াম করে ঘরের সব কটা জানলা একসঙ্গে খুলে গেল ঝুমার ঘরের। একটুও হাওয়া বইছে না। নড়ছে না গাছের একটি পাতাও। তবুও বিনাহাওয়ায় ঝুমার ঘরের জানলা খুলে গেল, যেন ঝড় নেমেছে কালবৈশাখীর রনপায়। ঝুমা উঠে পড়ল ভয় পেয়ে। উঠে জানলা বন্ধ করা মাত্তর, আবার খুলে গেল জানলা, বন্ধ করতে যে সময় নিয়েছিল তার চেয়েও অনেক তাড়াতাড়ি।

গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। ঝুমা চেয়েছিল দিদিমাকে ডাকতে চেঁচিয়ে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। জিব শুকনো

রবার। তালু শুকতলার চেয়েও শুকনো। ঘামে সমস্ত গা ভিজে জবজবে। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত নেয়ে উঠেছে যেন ঝুমা এইমাত্র। কোনোরকমে অন্ধকারে খিলটা খুলল ঘরের দরজার।

দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিল সরলা। সকালবেলার আলোর মতো ঝাঁপিয়ে তার বুকের ওপর এসে পড়ল ঝুমা। আরেকটু হলে পড়ে যেত সরলা। দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করানো আলমারিতে হাত ঠেকিয়ে বাঁচাল নিজেকে। সামলাল ঝুমাকে।

কি হয়েছে রে ?

ভয় করছে। ঝুমার গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। বেরুল স্বরের আভাস।

দাঁড়া, জল দি আগে, ভয়ে কাঠ হয়ে গেছিস যে—

পর পর দুগেলাস জল খায় ঝুমা। অগস্ত্যের মতো নিঃশেষে পান করতে পারে সমুদ্দুর যে এখন, এত তৃষ্ণা দুগেলাস জলে তার মিটবে কেন ? শেষ হতে না হতেই আবার জল টানে। সরলা বলেঃ দাঁড়া চা করি তোর জন্যে। না হলে তেষ্টা যাবে না। খালি খালি জল খেয়ে মরবি।

না, তুমি যেও না, ভয় করছে আমার ভীষণ—

ভয় কিসের ?

কে যেন এসেছিল ঘরে, বন্ধ জানলা খুলে ঢুকেছিল, বেরিয়ে গেল বন্ধ জানলা আবার খুলে—

ভয়ের কেউ নয়, তোর বাবা—

বাবা কে আমার ? কি যা তা বকছ ?

পষ্ট দেখনু ছোটোবাবু এসে আমাকে বলছে, সরলা আমায় চিনতে পারছ না ?

ছোটোবাবু কে—

সব বলছি, তুই গায়ের ঘাম মুছে ফল, কাপড় পর, আমি চা তৈরি করি।

সরলা সব কথাই খুলে বলে আজ ঝুমাকে। ছোটোবাবুর নাম হেমেন। তার দাদাবাবুর মুখে রিনির বাবার নাম, স্যার হেমেন, শুনে তাই চায়ের বাসন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল তখন। এখন মাঝ রাতে ছোটোবাবুর আসায় আর সন্দেহ নেই, ঝুমাকে দেখবার জন্যে ছোটোবাবুও সরলাকে খুঁজছে।

ভোর হলো। সূর্য উঠল। কেবল প্রিন্স এল না সরলাকে নিয়ে যেতে স্যার হেমেনের কাছে। কি হলো হঠাৎ ঝুমার, সে সরলাকে বলল : চলো, আমি তোমাকে নিয়ে যাব সেখানে।

সারা রাত ঘুমোতে পারেনি রিনিও। ঝুমা, যার ওপর তার বিজাতীয় ঘৃণার কারণ ছিল আজ সন্ধ্যের দুঘণ্টা পর পর্যন্ত, তাকে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আসবার পর থেকেই, তাকে এতো ভালো লাগছে কেন, কেন মনে হচ্ছে তার এমন বন্ধু আর একজনও নেই, ঐকজনও ছিল না কোনও দিন, তার কোনও কারণ খুঁজে পেল না রিনি। আর শুয়ে শুয়ে সেই আশ্চর্য সোজা, মুখ্যু, বস্তিতে মানুষ ঝিয়ের মেয়ে ঝুমার কথা ভাবতে ভারি ভালো লাগল তার। একবারও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না, মেয়েটা বস্তির পেঁটে ঝিয়ের মেয়ে হয়ে জন্মেছে। 'মেয়েটা একটাও ইংরিজি কথা জানে না। মনে হয়, ঝুমা তার নিজের বোন হলেই খুশি হতো বেশি। যার কাছে বলা যায় সব কথা। মা না থাকার দুঃখ দু-হাত দিয়ে দূরে ঠেলবার ক্ষমতা ছিল কেবল যারই শুধু। কিংবা যাকে বুক দিয়ে আগলাবার মধুর দায়িত্ব ছিল তখন বাঁচবার সব চেয়ে বড়ো তাগিদ।

ভালো লেগেছিল ঝুমাকে আরও কারণ রিনির বাবারও খুব ভালো লেগেছিল ঝুমাকে। সে ভালো-লাগার কথা অকপটে মেয়ের কাছে বলেছিলেন স্যার হেমেন। তাঁর সাফল্য-সমুজ্জ্বল মুখে বেদনার নীলাঞ্জন ছায়া পড়েছিল কথা বলতে বলতে। মেয়ের কাছে বাপ কনফেস করেছিল। অনিমার প্রতি অন্যায়ের ইতিহাসের পাতা

মেলে ধরেছিল একের পর এক। চুপ করে চেয়ে বসেছিল রিনি। দুচোখ ভরে এসেছিল জলে। একজনের জন্যে এত ভালোবাসা ছিল আরেকজনের বুক জুড়ে রিনি ভাবতে পারে নি। বাবাকে সে দেখেছে মায়ের যত্নে বড় করেছেন তাকে। বাবাকে সে দেখেছে অনলস কর্মক্ষমতায় গড়ে তুলতে ভারতবর্ষের সব চেয়ে বড় পাথরের ব্যবসা। দামী পাথরের। হীরে, মণি মুক্তোর বুকের ওপর উঠে দাঁড়াতে ওদের চেয়েও দুর্মূল্যতর দীপ্তিতে। বাবাকে সে দেখেছে দিনের পর দিন সূর্য-নিয়মিত সকাল-সন্ধ্যার ছন্দায়িত জীবন-যাত্রায় অদ্রুত কিন্তু ধ্রুব পদক্ষেপে লক্ষ্যে পৌঁছতে।

কিন্তু বাবাকে কাঁদতে দেখল আজ সে প্রথম। বৈশাখের রৌদ্ররুক্ষ আকাশে শ্যাম আষাঢের আভাস টলমল করে উঠতে দেখল দুচোখের কোণে।

অনিমার গর্ভে তার যে কন্যা সন্তান এসেছিল আজ তাকেই তিনি খুঁজে পেলেন নাকি বস্তিতে বড়ো, ঝিয়েব পেটে-আসা ঝুমার মধ্যে। ঝুমার কাছে গভীর কৃতজ্ঞতায় দুচোখ ছাপিয়ে জল নামল রিনির চোখে অন্ধকার একলা বিছানায়। ঝুমাকে দেখে শান্তি পেয়েছেন বাবা। এর ঋণ রিনি শোধ করবে কি দিয়ে? প্রিন্সের দাম আর রিনির কাছে আজ এত বেশি নয় যে প্রিন্সকে দিয়েও শোধ হবে ঝুমার দেনা। ঝুমাই বরং ফিরিয়ে দেবে প্রিন্সকে রি র কাছে। দেনা বেড়ে চলবে দিনে দিনে।

তবু ঝুমা রিনির কেউ নয়, এ এমন জলজ্যান্ত সত্য, যেমন সত্য আকাশের গায়ে অনাদি কাল ধরে হাজির ওই চাঁদ, ও আকাশের কেউ নয়। আকাশ নয় ওর কেউ।

বাবার ঘর থেকে ভীষণ ঘড় ঘড শব্দ আসতেই ভাবনার জাল ছিঁড়ে গেল। ভয় পেল রিনি। বিছানার আ.ো হঠাৎ জ্বালল সুইচ টিপে। তারপর জেলে দিল ফ্লু ের্সেণ্ট দীপ। স্নান করতে লাগল আকাশ-রঙা দেওয়াল। দরজার কাছে এসে দাঁড়াতে আবার

অস্বাভাবিক সেই শব্দ হেঁটে এল বাতাসের পায়ে পায়ে। বাবার গলা থেকেই উঠে আসছে যে এই দলা দলা শব্দ, তাতে আর ভুল নেই। দরজা খুলে বাবার ঘরে এসে দাঁড়াতেই দেখল বাবার ঘাড় ভেঙে পড়েছে। তুলে দিতেই আবার ভেঙে পড়ল। মুখ দিয়ে গাঁজলা আর শব্দ বেরুচ্ছে একসঙ্গে। ঘড় ঘড় সেই অস্বাভাবিক শব্দ।

'বাবা ?' কোনও জবাব এল না রিনির ডাকের। রিনি বেল বাজাল গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে। দ্বিতীয়বার বেলে হাত দেবার আগেই দৌড়ে এল রঘু বেয়ারা। বলতে হলো না তাকে। দুজনে ধরে বাবাকে শুইয়ে দিল বিছানায়। তারপর পাখার স্পীড পুরো দমে করে দিয়ে. মুখে জল দিতে গিয়ে রিনি দেখল সব জলই বাইরে পড়ে যাচ্ছে।

টেলিফোন করল প্রিন্সকে। প্রিন্স বলল ঃ রঞ্জন ডাক্তারকে নিয়ে এখনই আসছি।

দিদিমাকে নিয়ে ঝুমা যখন পৌঁছল স্যার হেমেনের বাড়ি তার ঘণ্টা চারেক আগে স্যার হেমেন মারা গেছেন।

ঝুমাকে জীবনের সব চেয়ে ব্যর্থ, সব চেয়ে মলিন, সব চেয়ে মেঘে-ঢাকা সূর্য-ওঠার সকালে কাছে পেয়ে রিনির ঘন কালো দুটো চোখের কোণ আপনা থেকেই ভরে গেল জলে। এ চোখের জল বাবার মৃত্যুর জন্যে নয়। বন্ধুর রথ জীবনের দরজায় দুঃখের বর্ষায় এসে থামায় অভাবিত কৃতজ্ঞতায়। কান্নায় কান্নায় ভরে গেল বুক। ঝুমা তার শুধু বন্ধু নয়। তার চেয়েও বেশি, অনেক বেশি কেউ। নাহলে সে আসবে কোথা থেকে এই সকালে। কোন টানে। এখনও পর্যন্ত স্যার হেমেনের হঠাৎ চলে যাবার খবর কেউ পায় নি। আরেকটু বাদেই খবরকাগুজেদের, নাম-করা, বদনাম-করা লোকেদের, পাড়া-পড়শীর, কাছের ও দূরের আত্মীয়দের ভিড়, কথা, টেলিফোন কেবল শুরু হয়ে যাবে। সেই ভিড়ে ঝুমা আর রিনি, দুজনে দুজনের

কাছ থেকে ছিটকে পড়বে আবার। তার আগেই ঝুমাকে জড়িয়ে ধরে রিনি। বিষণ্ণ সেই সকালের মতো ভারী ম্লান গলায় বলে : তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম,—ঝুমা।

ঝুমা হাসে : আমাকে নয়। প্রিন্সকে ভুল বুঝেছিলে—

প্রিন্সকেই কাল প্রথম মনে পড়েছিল, বাবার অবস্থা খারাপ দেখে ফোন করেছিলাম তাকে—

প্রিন্সের চেয়ে বড় বন্ধু তোমার কেউ নেই—

তুমি?

তোমার কাছে প্রিন্সকে পৌঁছে দেবার সেতু আমি। তার চেয়ে বেশি কিছু নই তোমাদের জীবনে। তার চেয়ে বেশি কিছু হতেও চাই না—

সকালের সেই বিষণ্ণ মেঘেই এখন এই মুহূর্তে, সায়াহ্নের গোধূলির আলো ছড়ায় হঠাৎ।

স্যার হেমেনের পায়ের ধুলো নেয় সরলা। স্যার হেমেনের নয়। তার ছোটবাবুর। ঝুমাকে বলে : প্রণাম কর।

জ্যোৎস্নায় সারা আকাশ ধোয়া রাত। থোকো থোকো আলো এসে পড়েছে ঝুমার চোখে, মুখে, বুকে, কোমরে, পায়ে। লুটোপুটি খাচ্ছে আলো আর আলো। জলে রাখা ফুলের সবুজ গন্ধ ফ্যানের হাওয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময়। ছুঁয়ে যাচ্ছে ঝুমার কালো চুল। আয়নায় ঝুমার শরীরের ফুল পোর্ট্রেট চমকাচ্ছে চাঁদের আলোয়। তাকিয়ে আছে তার দিকে ঝুমার লোভী দুটি চোখ। এ শরীর দেখে আশ মেটে না তার। মাকে মনে পড়ে না ঝুমার। যে মার আশ্চর্য শরীর তার এই আশ্চর্যতর শরীরের উৎস। এই দেহ থেকে অনবদ্য গান উঠে আসে রোজ। একা শোনে সেই গান, কান পেতে শোনে ঝুমা রোজ শুতে যাবার আগে। বুক ছত্রিশ, কোমর তেইশ, হিপস পঁয়ত্রিশ ইঞ্চি। ভিশেপ শরীর ওপর নীচ দুদিক থেকেই। বয়স সতের। হাইট ফাইভ ফিট ফাইভ। আজ তার নীজের চেহারা তার নিজের চোখে আরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে দেখছে। তার কারণ আছে। কাল তার মডেল-জীবন শেষ, এবং চিত্রজীবন শুরু। ১৯৫১-র ২৬শে অগস্ট কণ্ট্রাক্ট সই করে দুহাজার টাকা আগাম পেয়েছে ঝুমা। কাল এগারই সেপ্টেম্বর শুটিং হবে তাকে নিয়েই। ছবির নাম—সাত নম্বর সেল। পরিচালক, কুমার দাশগুপ্ত। ঝুমার বিপরীতে অভিনয় করবে ম্যাটিনি আইডল হয়ে উঠছে যে বাংলা দেশে আস্তে আস্তে সেই হ্যাণ্ডসাম অরুণকান্তি।

আজই ঝুমার মৃত্যু। কাল সকালে তার নবজন্ম। তার নাম সুতনুকা সেন। কণ্ট্রাক্টে সই করবার সময় সুতনুকা নামের সঙ্গে সে যোগ করেছে সেন, তার মায়ের বিবাহপূর্ব পদবী। বাপের দিক থেকে

সে কিছুই নেইনি। পদবীও না। কন্ট্রাক্টে সই করবার সময় সে ধন্যবাদ দিয়েছে ভাগ্যকে। আর চুপ করে দাঁড়াতে কি বসতে কিংবা শুতে হবে না ফোটোগ্রাফারের হুকুম মতো। এবার কথা বলতে পারবে সে। হাসতে পারবে, কাঁদতে পারবে। চোখ দিয়ে এক্সপ্রেস করতে পারবে কথা-না-বলা কথাদের। বইয়ের পাতায় স্থির হয়ে আছে যেসব চরিত্র, তাদের দিতে পারবে রক্তমাংসের রূপ। তাদের হাসি-কান্না, কামনা-বাসনা, বঞ্চনা, স্বার্থত্যাগ, জীবনমৃত্যুকে আলোছায়ার শরীর দিতে পারবে সে। এই সে হতে চেয়েছে সারাজীবন। এই সে হবে। মানবচরিত্রের রূপকার। সকলে চেয়েছে তার দেহের সঙ্গে এক হতে। সে চেয়েছে একাত্মা হতে বিচিত্র মানুষের মনের সঙ্গে। সে একলা। নিরুপম নিঃসঙ্গ।

মডেল হবার দিন থেকেই এই দিনটির দিকে তাকিয়ে আছে ঝুমা। মনে পড়ছে একদিন, সন্ধ্যের একটু পরে ফোটোগ্রাফারের দোকান থেকে সে বেরয়নি, টেলিফোন এল: আমি ওলড থিয়েটার্স স্টুডিও থেকে বলছি, আমাদের একটা অপেরা ছবি শুরু হচ্ছে কাল, আপনার মতো একটা মেয়ে খুঁজছি আমরা। যদি রাজী থাকেন তো পনের মিনিটের মধ্যে আমি আসছি গাড়ি নিয়ে। এখনই আপনাকে পার্ট পড়ানো হবে—

ওলড থিয়েটার্স শুনেই মাথা খারাপ হয়ে গেছে ঝুমার। ওলড থিয়েটার্স স্টুডিওর দরজায় কতবার গিয়ে সে দাঁড়িয়েছে। তার প্রিয় অভিনেতা উমাদাস, তার প্রিয়তর অভিনেত্রী চম্পাবতীকে আসতে যেতে দেখেছে। ভেতরে যেতে ভরসা হয়নি স্টুডিওর। ওর ভেতরের স্বর্গে পৌঁছনই তার জীবনের স্বপ্ন। উমাদাস-চম্পাবতীর সঙ্গে এক-সঙ্গে অভিনয় করা তার চরম প্রার্থনা ভাগ্যের পায়। টেলিফোনের ওপার থেকে রক্ত উত্তাল করা ওলড থিয়েটার্সের নাম কানে আসতে লোকটার আইডেন্টি-কৌতূহলও জাগল না ঝুমার মনে। সে শুধু জিজ্ঞেস করল: এখন তো রাত হলো, কাল সকালে—

ঝুমার কথা নাকচ করে অপর প্রান্ত বলল : তাহলে অন্য মেয়ে নেমে যাবে আপনার জায়গায়।

মস্ত বড় গাড়ি। ক্যাডিলাক। চেপে এল টেলিফোন করেছিল যে। গিয়ে থামল ওলড থিয়েটার্সের স্টুডিওর গেটে। ঢুকে গেল ভেতরে। নির্জন পরিত্যক্ত পুরী। ঝুমার হাতে ধরিয়ে দিল একটা খাতা। অনেক কথার একটি ডায়লগ দিল পড়তে। প্রথম সত্যি-কারের ফিলম স্ক্রিপ্ট। গলা ঈষৎ কাঁপতে লাগল ঝুমার। কানে এল লোকটার কথা : আঁচল একটু সরান তো।—অন্যমনস্ক ঝুমা আঁচল সরায়। আরও একটু—এবার আদেশের সুরে। তারপরও সেই লোকটা যখন হাতের কব্জায় ঝুমাকে পেয়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে বলে : আরও, আরও সরাও—, তখনই তড়াক করে উঠে পড়ে ঝুমা। লোকটার গালে, গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে চড় মারল একটা। তারপর ফিরে তাকাল না আর। বেরিয়ে গেল ওলড থিয়েটার্স স্টুডিওর হাতির মূর্তি আঁকা গেট দিয়ে।

আরেকবার। ডায়মণ্ড হার্বারে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে এক ছোকরা ঝুমার কোমরে হাত দিয়ে বলে, সুন্দরী মেয়েদের হাড় ছুঁতে তার ভারি ভালো লাগে। উঠে পড়েছিল ঝুমা তাই শুনে। বলেছিল : বেশ, কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমার হাড়ের এক্স-রে ছবি তোমাকে পাঠিয়ে দেব। কেমন ?

আরও একবার। বিরাট বুড়ো এক বড়লোকের এক বন্ধু প্রস্তাব করেছিল ঝুমা যদি বিয়ে করে বুড়োকে তাহলে বুড়োর দুলাখ টাকার সম্পত্তি ঝুমা পাবে। বুড়োর ব্লাড প্রেসার যা তাতে এই বয়সে ঝুমাকে বিয়ে করলে বুড়ো আর টিকবে বড় জোর ছমাস থেকে একবছর। তারপর দুলাখ টাকা ঝুমা আর সেই বিরাট বুড়ো বড়লোকের বন্ধু নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে। ঝুমা সব শুনে হেসে জিজ্ঞেস করেছিল : যদি বুড়ো না মরে ? বড়লোকের বন্ধু তার জবাবে বলেছিল : ডাক্তারকে দিয়ে লিখিয়ে আনতে পারে সে,

কতদিন ঠিক আর বাঁচতে পারে বুড়ো। তারও জবাব দিয়েছিল ঝুমা। বলেছিল: আমার জ্যোতিষী আমার ঠিকুজি দেখে লিখে দিতে রাজি আছেন যে আমার বিধবা হবার আশা নেই এ জীবনে একেবারেই।

মডেল জীবনের চারশো টাকা মাইনে আর এই সব এক ঘেয়ে মুখ তার আর ভালো লাগছিল না। হাঁফিয়ে-ওঠা ঝুমার সামনে ঠিক সেই সময়েই টলিউডের ফিলম স্টুডিওর দরজা খুলে গেল আপনা থেকেই। এবং বরাবর ঝুমার জীবনে ঘটেছে এই অপ্রত্যাশিত। বার বার ঘটেছে।

এর হাওয়াবদল ঠিক সময়ে ঘটেছে আবার। বস্তির সঙ্গ একঘেয়ে লাগলে এসেছে প্রিন্স। রেস্তোরাঁয় অর্ডার নেবার কাজে অরুচি এলে এসেছে মডেল হবার ডাক। মডেল জীবনে ঘেন্না আসতে না আসতেই খুলে গেছে স্টুডিওর গেট। বাইরে থেকে আর উঁকি দিতে হবে না নিষিদ্ধ রাজ্যের অন্তঃপুরে। আর কদিন বাদ থেকেই বরং তাকে বেরুতে আসতে দেখবার জন্যে উঁকি ঝুঁকি দেবে তারই মতো কত ঝুমা হয়ত! ভাগ্যের কাছে তার করজোড় নিবেদন, এই রাজ্য যেন তার কোনও দিন আবার আগেরই মতো বিশ্রী না লাগে। অভিনয় করে যেতে পারে যেন সে জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত—এই এক প্রার্থনা নিয়ে সে ঢুকেছিল টলিউডের সব চেয়ে বনেদী স্টুডিওর ফ্লোরে; সাত নম্বর সেল-এর মহরতে।

তারিখটা ছায়াছবির ইতিহাসে মনে রাখার মতো; এগারই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১।

প্রথম দিন শুটিং থেকে ফিরে এসে নিজের ঘরে হাসি আর চেপে রাখতে পারল না ঝুমা। হাসি একবার আরম্ভ হলে তার শেষ হতে চায় না ঝুমার। ঝুমা যাকে কখনও মা ডাকে, কখনও দিদিমা, আসলে যে তার কেউ নয় কিংবা যে তার সব সেই সরলা বলে, এহাসি হচ্ছে রোগ। কারণে, অকারণে ভীষণ হাসে ঝুমা। দম বন্ধ

হয়ে আসে। একটু বন্ধ হতে না হতেই শুরু হয়ে যায় হাসির দমক। দু একবার ছেলেবেলায় হাসতে হাসতে অজ্ঞান হয়ে যাবার কথাও সে সরলার মুখে শুনেছে। আজকের হাসি সে অনেক্ষণ ধরে চেপে রেখেছিল। পুরো দশঘণ্টা। কি করে চেপে রেখেছিল সে জানে না। টলিউডের, ইট, কাঠ, পাথর পর্যন্ত তার হাসির খোরাক হয়েছিল প্রথম দেখার মুহূর্ত থেকেই। যে রাজ্যের অন্দর মহলে ঢোকবার জন্যে তার সতের বছরের অধীর অপেক্ষা আজ সার্থক হবার মুহূর্তেই তার প্রচণ্ড হাসির কারণ হলো। সমস্ত লোকগুলো কি আশ্চর্য বোকা আর ন্যাকা যদি লোকগুলো নিজেরা জানত। কুমার দাশগুপ্ত থেকে শুরু করে প্রোডাকশন ম্যানেজার কালো রায় পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্ক্রু-ঢিলে। মেয়েরা, নামকরাতম বুড়ি থেকে শুরু করে তার সময়ের সব চেয়ে বক্সঅফিস হিরোইন মায় একদম নাম-না-জানা এক্সট্রা ছুঁড়ি, তারা সবাই আরও বোকা, আরও হ্যাংলা, আবও ন্যাকা। গোটা ব্যাপারটার সম্পর্কে তার কৌতূহল এক মুহূর্তে হাসির, অট্টহাসির রঙ্গিন ফানুস হয়ে ফেটে, চুপসে, বিশ্রী চেহারায় পরিণত হলো।

এই টলিউড? এরাজ্য জয় কবতে, মাথা ঘুরিয়ে দিতে কুলি থেকে এরাজ্যের কুলীন পর্যন্ত, তার কতক্ষণ লাগবে।

হাসি থামতে ঝুমার আর কতক্ষণ লাগবে নিঃশব্দ দণ্ডায়মান সরলাও তাই ভাবছিল। আধঘণ্টার ওপর এক ছোকরা বাবু গাড়িতে বসে আছে ঝুমার জন্যে। লোকটা কি ভাবছে তাই ভাবছে সরলা। কিন্তু বলবার ফুরসত পাচ্ছে কই ঝুমাকে। জল হাতে দাঁড়িয়ে আছে ঝুমার দিদিমা কতক্ষণ হবে, আধঘণ্টার ওপর তো বটেই। হাত ভারি হয়ে এল সরলার। সেই সকাল দশটার আগে বেরিয়েছে, এখন অন্তত রাত সাতটা হবে। মুখে হাতে জল দেয়নি। জামা কাপড় ছাড়েনি। মুখের রং মুখেই আছে। লুটোপুটি খাচ্ছে সমানে। হাসতে হাসতে

কাশি শুরু হয়ে গেল। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। লাল হয়ে যায় মুখ। রক্তের মতো, লজ্জার মতো লাল। সরলার ভাষায় যাকে বলে টকটকা লাল, তা-ই। তবুও বিরাম নেই হাসার আর হাসার।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ বাদে ঝুমা মুখ তুলল। আর হাতে ধরিয়ে দিল সরলা এক গেলাস জল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সরলা বলে গেল একদমেঃ নীচে গাড়িতে একটা লোক বসে আছে সেই কত সময় থেকে, আমি জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আধ ঘণ্টার ওপর হবেক, কি যে হাসিস যখন তখন, এত হাসির কি আছে লা?

এখনও স্টুডিওর গন্ধ গা থেকে যায়নি, এখনই গাড়ি নিয়ে আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছে লোক? ভাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই মারাত্মক হাসির দমক আবার ধরেছিল বলে ঝুমাকে। ব্রেক কষল সাংঘাতিক দাঁতে দাঁত চেপে। শরীরের তীব্র হাসির ঢেউ লাগবার আগেই ভেঙ্গে দিল গায়ের জোরে। তাবপর তরতর করে নেমে এল নীচে।

বাইরের ঘরের দরজা খুলেই থমকে গেলে ঝুমা। একে তো. স্টুডিওতে দেখেনি সে।

দরজা খোলার শব্দে লোকটা তাকাল এবং নেমে এলো স্মার্টলি। তার চেয়েও স্মার্টলি ঘরে ঢুকে এসে বলল: আপনার কাছেই এসেছি মিস সেন, আমার নাম বোকা হালদার। আমি নতুন এবং পুরোনো গাড়ি কেনাবেচা করি—

কিন্তু আমার তো গাড়ি কেনার কোনও—

কথা নেই। কিন্তু আজ, কাল, পরশু গাড়ি আপনাকে কিনতেই হবে—মরিস, হিলম্যান, হিন্দুস্থান, ফাইয়্যাট, আমবাসাডার—

কেন?

কারণ তা না হলে টলিউডে টেঁকা অসম্ভব, আর আপনি তো এর টপে যেতে চান শুনেছি প্রিন্সের মুখে—

প্রিন্সের সঙ্গে আপনার চেনা আছে?

প্রিন্সের সঙ্গে আছে। পপারের সঙ্গেও আছে। বোকা হালদার সকলের বন্ধু, আপনারও—

বলে কি লোকটা। দুমিনিট হয়নি, বন্ধু কি? ঝুমাকে দুমিনিটও ভাববার সময় দেয় না বোকা হালদার। সে-ই আবার বলে: যে কেউ গাড়ি কিনেছে, গাড়ি কিনতে পারে, গাড়ি কিনবে, সবাই বোকা হালদারের বন্ধু। অথবা উল্টো করে বলতে পারেন, বোকা হালদার সবায়ের বন্ধু। ইটস ওল দ্য সেম—

কিন্তু আমি তো গাড়ি কিনছি না—

কে বললে কিনছেন না? তাহলে বোকা হালদার থোড়াই আপনার বাড়ি আসতো। কাননবালা তার প্রথম গাড়ি থেকে লেটেস্ট গাড়ি পর্যন্ত আমার কাছ থেকে কিনেছে জানেন?

না। কিন্তু জেনেই বা লাভ কি? আমি তো সবে একটা ছবিতে কাজ পেয়েছি—

আরেকটা ছবিতে যদি কাজ পেতে চান, তারপর আরেকটা, তার ওপরে আরও একটা ছবি যদি জোটাতে চান তাহলে অভিনয়ের জোরে তা পাবেন না। পেতে হলে গায়ের জোরে আর গাড়ির জোরে তা পেতে হবে আপনাকে। গায়ের জোর আপনার একটু বেশিই আছে। সেটাকে এখনই খরচা না করে ফেলে, গাড়ির জোরে যতটা পারেন চলুন। অনেক দূর যেতে হবে কি না, যদি সত্যি সত্যি টপে যেতে চান আপনি—

কিন্তু নেক্স্ট ছবি না পাওয়া পর্যন্ত—

আজকে আপনার প্রথম ছবির মহরতে দুজন নামকরা ডিরেক্টরের মাঝখানে আমি বসেছিলাম। তারা দুজনেই আপনার ভবিষ্যৎ আছে এই মন্তব্য করেছেন। অবশ্য তার মানে এই নয় যে এখনই আপনি কাজ পাবেন। কারণ আপনি নতুন। আপনাকে বলে দিই, এখন যারা হিরোইন তাদের চেয়ে অনেক বেশি এনিমি জানবেন যারা এখন বুড়ি হয়ে গেছে, তবুও মায়ের রোলে নামতে যাদের মান যায়;

তাদেরই একজন আমার সামনেই বললেন ডুজন ডিরেক্টরকেই যে আপনার মধ্যে ইনাফ সেক্স নেই—

কে বললে কথাটা ?

নাম নিয়ে দরকার নেই, কারণ এখানে সকলের দামই এক। সেক্সপিয়র কথাটা ঠিকই বলেছেন, নামে কিছু এসে যায় না, কেবল টলিউডের মানুষ দেখলে তাঁর গোলাপের কথা মনে আসত না। তার বদলে তিনি লিখতেন শুঁটকি মাছকে যে পাত্রেই রাখো একই রকম দুর্গন্ধ দেবে সে। এই শুঁটকি মাছেরাই আপনাকে পায়ে পায়ে বাধা দেবে—

কেন ?

কারণ আপনার বয়স অল্প—আর এর জবাব কি জানেন ?

এতক্ষণে জেনেছি—

কি ?

আমার একটা গাড়ি চাই আরম্ভেই—

করেকট, আপনি বোধ হয় সাতাশ তারিখে নেক্স্ট কিস্তির টাকা পাচ্ছেন, হাজার টাকা, ওর থেকে পাঁচশো টাকা আমাকে দেবেন—

গাড়ি চালাবে কে ?

ড্রাইভার। আপনার এখানে থাকবে খাবে, মাইনে নবে পঞ্চাশ। গাড়ি এবং আপনাকে দুজনকে দেখবে একসঙ্গে। খুব বিশ্বাসী বিহারী বাচ্চা, নাম মহেশ—

আপনার সঙ্গে কবে দেখা হবে আবার ?

সাতাশ তারিখ এই সময়ে—

বোকা হালদার অথবা ঝুমা কেউই লক্ষ্য করেনি, অ্যাটাশে হাতে খোড়োকাকের মতো একজন ঝুমার বাড়ির হদিস নিচ্ছিল সামনের রাস্তায়। বোকা হালদারকে দেখেই সে ঢুকে পড়ল। হালদারকে বলল : এরই মধ্যে গাড়ি বেচবার জন্যে এসে গেছ, বোকাদা, ধন্যি—

লোকে বলে আমি সেলের গন্ধ পাই। আই ক্যান স্মেল এ সেল—সে যাক, কি ব্যাপার?

দেবতা খবর করছেন এঁর—। ঝুমাকে দেখায়। তারপর বলে: আপনাকে একবার ডেকে পাঠিয়েছেন মিস্টার দত্ত—

কবে?

কালই—

সাতাশ তারিখের আগে হবে না, আমার গাড়ি নেই—

সাতাশ তারিখ অনেক দেরি হয়ে যাবে—

তাহলে ওঁকে গাড়ি পাঠাতে বলবেন, কিংবা আমার এখানেও আসতে পারেন অসুবিধে না হলে।

গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে, ফিলম ভারত জুড়ে যাকে দেবতা বলে এক ডাকে চেনে সবাই তার দুনম্বর সহকারী সরে পড়ল ছোট্ট নমস্কার করে। বোকা হালদার হেসে উঠল, সিলিং নামানো অট্টহাসি থামলে ঝুমা জিজ্ঞেস করল: কি হলো, হাসলেন যে?

হাসব না?

হাসবেন কেন?

সুদর্শন দত্তর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট বোধ হয় এই প্রথম শুনল তার দেবতাকে কেউ ডেকে পাঠাতে পারে—

চুপ করে রইল ঝুমা। বোকা হালদার গম্ভীর গলায় এবার বলল: আপনার হবে—

কি হবে?

আপনি যা চান টাকাকড়ি, বাড়ি, গাড়ি, নাম, সব হবে আপনার, কিন্তু এখানে থাকলে হবে না। গাড়ির মতো বাড়িও চাই আপনার, নিজের বাড়ি, মডার্নেস্ট ভিলা, কলকাতা থেকে একটু বাইরে। একটা কথা মনে রাখবেন। এরকম বাড়ি থেকে ওপরে উঠেছে এমন লোকের সংখ্যা অল্প হলেও আছে। কিন্তু এখানে থেকে ওপরে উঠতে পারেনি কেউ—

প্রিন্সের কথাটা বিদ্যুতের ঝিলিক দিল। গায়ের সমস্ত রোমকূপে কাঁটা দিল। প্রিন্সের সেই কথা,—বস্তি থেকে বড় হওয়া যায়, বস্তিতে থেকে বড় হওয়া যায় না।

বোকা হালদার বলে গেল আবার : যত স্টার আপনার চোখের ওপর দেখছেন, এদের দাম এদের দামে নয়—

মানে ? বোকার মতো বলল ঝুমা।

গাড়ির দামে, বাড়ির দামে এদের দাম। সব চেয়ে বড় অ্যাক্টর যদি এখন নবীনকুমার হয়, তাহলে তার কারণ তার অভিনয় নয়,—

তবে ?

সব চেয়ে বড় অভিনেতা সে এখন, তার কারণ তার গাড়ির ইজ্জত তার চেয়ে বেশি। যে গাড়ি সে এখন চাপে, সে গাড়ি দুতিন-খানার বেশি ভারতবর্ষে নেই। কাল আর কেউ যদি এমন গাড়ি জোগাড় করতে পারে যে গাড়ি ভারতবর্ষে দুখানাই আছে কেবল তাহলে তৎক্ষণাৎ সে হয়ে গেল পয়লা নম্বর বক্স অফিস। আর সেই একই গাড়ির দ্বিতীয়খানা না কিনতে পারা পর্যন্ত নবীনকুমারের ঘুম নেই—

এমন একজনও নেই বলতে চান যে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষমতার জোরে,—অভিনয়-ক্ষমতার জোরে—

বড়দের মধ্যে একজনও নেই।

আপনি সকলকেই জানেন ?

জানি বললে কিছুই বলা হয় না। কুমোর যেমন ভাবে কাদা ঘাঁটে, আমি তার চেয়েও ইনটিমেটলি এদের ঘেঁটেছি—

যদি কেউ সত্যি সত্যি অভিনয় করতে চায় টলিউডে ?

তাহলে তার পতন, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু প্রথম দৃশ্যেই অবধারিত।

বোকা হালদার উঠে দাঁড়াল। দুটো হাত যুক্ত করে কপালে ঠেকাল : চলি এবার—

না। আপনি আমায় গাড়ি চালান শেখাতে পারেন ?

এই কথা ? খুব, পারি, কবে বেরুতে চান বলুন—

শনিবার ভোরে—

ফাইন। রেডি থাকবেন পাঁচটায়—

কিন্তু ?

আবার কি হলো ?

ভাবছি—

কি ?

যদি অ্যাকসিডেণ্ট হয় ?

ভয় কি ? আমি তো পাশে থাকব—

পঞ্চুর মুখের মতো কেন দেখাচ্ছে বোকা হালদারের প্রোফিল ? বোকা হালদারের মুখোশ পরে ফিরে আসছে নাকি পঞ্চুর মুখই আবার ? ঝুমা একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল। গাড়ি স্টার্ট দেবার আওয়াজে অন্যমনস্কতার ঊর্ণনাভ ছিড়ে গেল। তাকাল বাইরের দিকে। বোকা হালদার চলে গেছে।

একরাশ কালো ধোঁয়া বাচ্চাদের মতো বাড়ির সামনের রাস্তায় লুকোচুরি খেলতে লাগল।

টলিউডের গ্রামে গ্রামে রটে গেল সেই খবর। স্তনুকা সেন যাবে দেবতা দর্শনে। না। তাহলে তা খবর হোতো না। দেবতা আসবে স্তনুকা সেনের বাড়িতে। পর্বত আসবে মহম্মদের কাছে। হাজরা লেনের তিনতলার একলা ঘর থেকে বিগতযৌবনা চম্পাবতী টেলিফোন করলো ন্যুআলিপুরের মিহির মালিককে সেই খবর দেবার অস্থিরতায় অপেক্ষা করতে না পেরে। তখন রাত প্রায় এগারো। মালিক সাহেব বুকের ওপর টেলিফোন নিয়ে সাড়ে এগারোটা থেকে কথা বলে রোজ ততক্ষণ না এক্সচেঞ্জ থেকে লজ্জা দেবার চেষ্টা হয়ঃ হ্যাভু ফিনিশড। রোজ মালিক সাহেবই ডায়াল করে চম্পার নাম্বার। আজ চম্পাবতী ঘুরিয়ে গেল মালিকের টেলিফোন নাম্বার। টেলিফোনের মুখে বোল ফুটতেই মালের পাত্তর নামিয়ে চমকে ঘড়ির দিকে তাকায়, দেরি হয়ে গেলো নাকি ? না। এখন মোটে এগারোটা বেজে পাঁচ। তাহলে কে ? কে তবে ডাকছে এত রাতে ? টেলিফোনের চোংএ কান পাততেই অপর প্রান্ত থেকে সাড়া এল ঃ আমি চম্পা—

মালিক সাহেবের খুশি টেলিফোন ছাপিয়ে উপচে উপচে পড়ল ঃ মেঘ না চাইতেই জল যে ?

চম্পাবতী সে উচ্ছ্বাসের কোনও নোটিস নিল না। ড্রাই গলায় বলল ঃ শুনেছ ? নেশা ছুটে যায় প্রায় মালিকের। ভয় পায়। তার কোনও কেলেঙ্কারির ফাঁস হয়ে চম্পার কান পর্যন্ত পৌঁছেছে না কি ? প্রায় বুজে-আসা গলা দিয়ে বেরোয় মালিকের ঃ কি ?

তোমাদের নতুন মক্ষীরাণীর কাছে স্বয়ং চলেছেন দেবতা এত্তালা দিতে—

স্বস্তির ঘাম দিয়ে আশঙ্কার জ্বর নামে। একটু নর্মাল হয় মালিকের কথাঃ দেবতা তো বুঝলাম, মক্ষীরাণীটি কে বুঝলাম না তো?

আহা ন্যাকা? কচি খোকা তুমি! নতুন মক্ষীরাণী কে তুমি জানো না? সুতনুকা সেন, সাত নম্বর সেলের নতুন হিরোইন—

ও-ও—ঝুমার কথা বলছ? তাই বলো—

ও, এরই মধ্যে সুতনুকা ঝুমা হয়েছে তোমার কাছে? পুরোনো আলাপ? কতদিনের?

মেয়েটা বস্তির—

তাতে কি? হুইস্কির ভক্ত বলে তোমার দিশিতে অরুচি আছে এমন কথা তোমার শত্তুরেও বলতে পারবে না—

না। ওর সঙ্গে এখনও আলাপ হয়নি—

যাও আলাপ করে এস, দেরি করছ কেন?

মালিক সেকথার জবাব না দিয়ে ফার্দার ইনফরমেশন দিল: মেয়েটা এখন আর বস্তিতে নেই, বেহালায় একটা বাড়িতে আছে—

আরেকটু বিষ ঝরলো চম্পাবতীর জিভ দিয়েঃ ন্যুআলিপুর যাবে কবে?

একটু, বোধ হয় ফ্র্যাকশন অব এ সেকেণ্ডও হবে না, রিটর্ট ফিরে এল বিদ্যুৎ বেগেঃ খুব বেশি আশ্চর্য হয়ো না, যদি কয়েক বছরের মধ্যেই কলকাতার সব চেয়ে ফ্যাশনেবল কোয়ার্টারে সব চেয়ে স্ট্রিমলাইণ্ড বাড়ি থেকে সুতনুকা সেনের গাড়ি আসতে-যেতে দেখো—

এরই মধ্যে এতো? ভালো—

ভালো কি মন্দ জানি না, এটুকু জানলাম সাত নম্বর সেলের মহরতে ওকে দেখে যে দুনিয়া জুড়ে এনটারটেনমেণ্টের জন্যে সব চেয়ে বেশি যা দরকার, সব চেয়ে বেশি তা ওই মেয়েটির আছে—

কি সেটি, শুনতে পাই?

তুমিও সেটি কি তা জানো, তবুও শোনো তার নাম, সেক্স—

সুতনুকা সেনের মধ্যে সে বস্তু কোথায়,—বয়স কম মানেই সেক্স নাকি?

না। ঝুমার সেক্স তার শরীরে নেই—

কোথায় আছে?

ওর মনে—

সেই মনের খবর নাও গে যাও, আমাকে ফোনের দরকার নেই—

টেলিফোন রেখে দেয় আওয়াজ করে চম্পাবতী। সামনের দেয়ালে তার পঁচিশ বছর আগেকার ছবিটা নামিয়ে আনে। ছবিখানা আয়নার সামনে তুলে ধরে। পাশাপাশি দুই চম্পাবতী একই দর্পণে এসে দাঁড়ায়। একজন কুড়ি বছর বয়সের, আরেকজন পঁয়তাল্লিশে পা দিচ্ছে।

দেখতে দেখতে তৃতীয় ছবি মনের আয়নায় প্রতিফলিত হয়। একটা ইংরেজী ফিলম। পিকচার অফ ডোরিয়ান গ্রে।

সুদর্শন দত্ত, টলিউডে যাকে সবাই ডাকে দেবতা বলে, গাড়ি পাঠালেন ঝুমাকে নিয়ে যাবার জন্যে। গাড়ি এলো দুপুর তিনটেয়। চারটেরও কয়েক মিনিট পর সেই গাড়িতে এসে বসল ঝুমা। একটা লাল সোয়েটার পরে এল গরমের মধ্যে। গাড়িতে ভেতরের সিটে বসেছিলো সুদর্শন দত্তের এক নম্বর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। ঝুমা গাড়িতে পা দেবার আগে তাকে বলল: গাড়িটা ছোটো, দুজনের বসতে অসুবিধে হবে। আপনি যদি—

তড়াক করে লাফিয়ে দরজা খুলে আবার ড্রাইভারের পাশে এসে ধপাস করে বসে সুদর্শন দত্তের নাম্বার ওয়ান অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সোনালি-বরণ কর। মুখখানা এমনিতেই কালো।

এখন তার ওপর আরও কালি ঢেলে দেয় ঝুমার মিষ্টি হেসে খুব কঠিন-করে বলা নরম কথাগুলো। ঝুমা, চারজন অনায়াসে ধরে এমন

স্পেসে, গাড়ির ভেতর একা বসে। তার বসার ভঙ্গি, তার ঠোঁটের কোণে সমস্ত মানুষ জাতটাকে পিঁপড়ের চেয়েও তুচ্ছ করার তির্যক ব্যঙ্গের খুব মাইলড কিন্তু খুব চলমান আভাস, গাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে থাকা ফর্সা কনুই একপ্রান্তে, আরেকপ্রান্তে মুঠো করা আঙুলের ওপর বসানো তার সবুজ মুখ সাংঘাতিক রিগ্যাল। ড্রাইভারের পাশে-বসা ঘনবেগনি হয়ে-যাওয়া অ্যাসিস্ট্যাণ্ট নাম্বার ওয়ান সেদিকে ঘাড় ঘোরাবার দুঃসাহস করে না। গাড়ির কাচে ঝুমার মুখের একটুখানির ছায়া দোলে। সেই ছায়ার দিকে তাকিয়ে উষ্মা ছড়ায় সুদর্শন দত্তের সহকারীঃ উনি,বহুক্ষণ বসে আছেন আপনার জন্যে—

উনিটি কে ?—ঝুমার চোখে হঠাৎ আলোর ঝলকানি।

এবারে ঘাড় ঘোরায় মর্টালি হার্ট অর্বাচীন সহকারীঃ ডিরেক্টর দত্তর কথা বলছি আমি।

অ—ঝুমা প্রথম স্বরবর্ণের ওপর খেলা করে একটু সময়। তারপর খাপ খোলেঃ উনি বসেছিলেন,—আমি কিন্তু বসেছিলাম না। কাজ করছিলাম। ওঁর অনেক চাকরবাকর, অ্যাসিস্টেণ্ট আছে,— আমার একজনও নেই কিনা—

কান দুটো গরম হয়ে গেছে সোনালিবরণ করের। কানে বাজে কেবল, চাকরবাকরের সঙ্গে অ্যাসিস্ট্যাণ্টের তুলনা। মনে মনে গাড়ির আগেই পৌঁছে যেতে চায় দেবতার কাছে। সেখানে এই ঠোঁটকাটা ছুঁড়িটার যা হাল হবে তা দিব্যচক্ষে দেখে তার কালো মুখখানা একটু কম কালো হয়, তার ভারী মনটা হালকা হয় অনেকটা।

দেবতার ঘরে ঝুমাকে পৌঁছে দিয়ে সরে পড়ে সোনালিবরণ। দেবতা যখন কোনও মেয়ের সঙ্গে কথা বলেন, সে মেয়ের বয়স আঠারো অথবা ষাট চোঁব-চোঁব করুক একই কথা, তখন থার্ড পার্সন, সিংগুলার অথবা প্লুরাল হাজির থাকা বারণ। আর এ তো ডবকা

ছুঁড়ি। এর কথার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবে যে তার নাম যাই হোক, সোনালিবরণ নয়।

আলো থেকে অন্ধকারে ঢুকল ঝুমা। নিখুঁত অন্ধকার। সমস্ত দরজা-জানলা নিপুণ হাতে বন্ধ হয়েছে। পাখা ঘুরছে পুরো দমে। সেই হাওয়ায় জানলায় টাঙানো খসখস নরম গন্ধ বিলুচ্ছে দুহাতে। সোফায় বসে আছেন সুদর্শন দত্ত। অন্ধকার এই ঘরের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো রঙ তার গায়ের। ঘরে আছেন কেউ বলে মনে হয়নি ঝুমার। হঠাৎ অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত হলো কাদা-খোঁচার মতো কণ্ঠস্বর: আলোটা জ্বেলে দাও। চমকে উঠেছিল ঝুমা।—আলোর সুইচটা কোন্‌দিকে? আবার উঠে এল কুৎসিত গলা থেকে সুনিশ্চিত নির্দেশ: বাঁদিকের দেওয়ালে একেবারে ডান দিকের সুইচ। অন্ধকার সয়ে-আসা চোখে দেয়াল হাতড়ে আলোর সুইচ অন করতে যেটুকু সময়, তার পরেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল ঝুমার। আলাদিনের যে দুরবস্থা হয়েছিল রত্নগুহার অন্ধকার আলো হতে, তার চেয়েও হতবাক হলো ঝুমা। সমস্ত ঘরময় দেওয়াল থেকে দেওয়াল পর্যন্ত তার চলে গেছে পরস্পরের দেহ স্পর্শ করে। আর তাতে ক্লিপ দিয়ে আটকানো রয়েছে ছবির পর ছবি। কোনটা ঢাকা, কোনটা প্রায় উলঙ্গ, সব ছবিই ঝুমার। তার মডেল জী‍বনের অজস্র ছবি ঘরময় হাওয়ায় ছড়াচ্ছে নির্লজ্জ নিরুপম নগ্ন সেক্স।

সেই শরীরের লাবণ্য সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো বসে আছে বিপুল মাংসের পিণ্ড যে লোকটা সমস্তা লোলুপতা চোখে মুখে মেখে তার বয়স ষাট থেকে যত কাছে পঞ্চান্ন থেকে ততখানিই দূরে। ঝুমার পক্ষে নতুন অভিজ্ঞতা নয়। নতুন কেবল, তার শরীরের বদলে তার শরীরের ছবির এমন সমাদর অক্ষম শরীরের কাছে, এইমাত্র।

তোমার নাম ঝুমা?

আমার নাম সুতনুকা—

কুমারের ছবিতে নেমেছ?

জানেন তো আপনি—

আমি তোমায় নেব ভাবছিলাম—

নেবেন তাহলে—

কিন্তু কুমারের ছবিতে নেমেই তো সর্বনাশ করলে—

কার ? কুমার বাবুর, আপনার, না আমার ?

তোমার ফার্স্ট স্ক্রিন অ্যাপ্যারেন্স আমার ছবিতে হওয়া উচিত ছিল—

কেন ?

কারণ কুমারের ছবি যদি কিছু না হয় ?

তাতেও কিছু এসে যাবে না, কারণ আমার হাতে—

চাকর এলো ঘরে ট্রে নিয়ে। চায়ের ট্রে নয়। বেলের শরবত। রঙ্গিন গেলাসে। বরফের কুচি দিয়ে বাইরে থেকে গেলাস ঠাণ্ডা করার চেষ্টা ঝুমার চোখ এড়াল না।

নাও, শরবত খেয়ে নাও। আমার বাড়িতে চায়ের পাট নেই—

আমি চায়ের ভক্ত নই—

একটুখানি চুমুকের আওয়াজ। কথা বন্ধ। সুদর্শন দত্তের তাকিয়ে থাকা ঝুমার দিকে। ঝুমার তাকিয়ে থাকা তার নিজের ছবির দিকে একদৃষ্টে। পৃথিবীতে আর কোনও দৃশ্য এত রমণীয় মনে হয় না। এত আশ্চর্য তার শরীর। এমন স্বচ্ছ। এত আলো তার শরীরে। প্রত্যেকটি কার্ভ এতো নিখুঁত। পায়ের গোল এত নিটোল, পাতলা ঠোঁট, কালো চোখ। গালের উঁচু। তার ওপর কালো তিলের ডট, বুকের ডিমেনশন, কোমরের চরকি, চুলের কার্ল, ভুরুর ধনুক, কমপ্লেকশনের রংবাহার মিলিয়ে এত খুশি আর কিছু করে না ঝুমাকে। যার জন্যে তার এই দেহের তারে এমন দুরন্ত স্বর বাঁধা পড়েছে, সেই মা-কে দেখতে পেল না ঝুমা—এবেদনা এত বিপুল বড় পৃথিবীতেও রাখবার জায়গা কোথায় তার !

কি দেখছ অমন করে ?

ছবি

নিজেকে অত দেখতে নেই—

দেখবার মতো আর একজনও যদি থাকত—

কালো, থলথলে, কেশবিরল, বাঁদরের আভাস-যুক্ত মুখ সুদর্শন দত্তের ঘা খেল। তুবড়ে গেল একটু। ঝুমার চোখ ক্লিক করল।

সুদর্শনের বিরল ক্লোস-আপ অদৃশ্য ক্যামেরায় ধরা রইল।

একটু টাইম ল্যাপস অ্যালাও করতে বাধ্য হলেন দেবতা। তারপর হঠাৎ বললেনঃ এতদিন এমন চেহারা নিয়ে কোথায় ছিলে?

ছুটিতে ছিলাম বোধ হয়—

ঝুমার গা গুলিয়ে সেই হাসির গোলা ফাটব ফাটব করছে। রেল গাড়িতে তিনটে লোক কাটা পড়েছে; বাড়িতে আগুন লেগেছে; বাজ পড়ছে একটার পর একটা; কড়ে আঙ্গুল চিপে গেছে দুই দরজার মধ্যে;—ভাবতে ভাবতে কোনও রকমে হাসির দমকা হাওয়াকে ঠেকালো দুর্ভাবনার পাথর দিয়ে।

বেশ কথা বল তুমি,—দেবতার কথায় মনে হয় তিনি বর দেবেন।

তাহলে এখন পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন আমাকে,—ঝুমা উঠে দাঁড়ায়।

বোসো, বোসো, বুড়ো মানুষের ওপর অত রাগ করে না।

ঝুমা নিজেকে জোর করে বসায়, কিন্তু তার অধীরতা গোপন করবার চেষ্টা করে না একটু।

তুমি তো বস্তিতে থাকতে না?

এ ছবিটা না লাগলে আবার বস্তিতে ফিরে যেতে হবে—

কেন, তুমি যে বলেছিলে এ ছবি কিছু না হলেও তোমার অভিনয় কিছু হবে—

সে এখনও বলছি—

তবে?

ছবি লাগার ওপরই তো এখানে আমাদের ভাগ্য নির্ভর করে, মেরিটের মূল্য এ রাজ্যে কতটুকু ?

তুমি ইংরেজি জানো ?

শিখছি—

কার কাছে ?

মেমসাহেবের কাছে—

পয়সা দিয়ে ?

নিশ্চয়ই। সাহেব হলে এমনি শেখাত হয়ত,—মেমসাহেব কেন ছাড়বে ?

কি নাম তোমার টিউট্রেসের ?

ইথেল সোয়ানসন—

কত নেয়—

একবারই নিয়েছে, আড়াই টাকা—

মানে ?

ওঁর লেখা একখানা বই আছে, গুড ইংলিশ, হাও টু রিড এণ্ড রাইট ইট, ওইটে থেকেই আমি ইংরিজি লেখা ও পড়া তৈরি করছি—

ওয়েল সেড, খুব ধোঁকা দিয়েছ—। হা-হা করে দেবতার কঠিন প্রস্তর মুখ হেসে ওঠে। দেবতাকে এই প্রথম একটু মানুষের মতো মনে হয়।

হাসি থামলে দেবতাই আবার সরব হন: কিন্তু বস্তিতে তুমি এত কথা শিখলে কখন ?

আমি যা কিছু শিখেছি বস্তিতেই শিখেছি। সব চেয়ে বেশি শিখেছি—, ঝুনা একটু থামে।

সব চেয়ে বেশি কি শিখেছ বস্তিতে বলো—

শিখেছি যে, মানুষ যার জন্যে দায়ী নয় সেই জন্মই তার সব চেয়ে বড় দায়। বস্তি আমাকে শিখিয়েছে যে খাঁটি পদ্ম হতে হলে তাকে পাঁকে জন্মাতেই হবে—

বন্ধ দরজা খুলে যায় হঠাৎ দেবতার ঘরের। এক নম্বর সহকারী সোনালিবরণ এসে বলে, ড্রাইভার জানতে চাইছে, গাড়ি তুলে দেবে, না আপনি বেরুবেন।

বেরুব ওকে পৌঁছে দিয়ে আমি একবার লাইট হাউসে যাব—

গাড়িতে যেতে যেতে দেবতা ঝমাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি বিয়ে করেছ ? ঝুমা হাসল : বিয়ে করলে আমার মাথায় সিঁদুর দেখতেন, কারণ আমি বস্তির মেয়ে, সোসাইটির কেউ নই—

বিয়ে করবে না ?

বিয়ে করতেই হবে আমাকে—

কেন ? বিয়ে করতেই হবে কেন ?

কাজ, বাড়ি, গাড়ির মতো আজ ওপরে উঠতে হলে একটি স্বামীও চাই—বিশেষ করে টলিউডে যদি কেউ একেবারে টপে যেতে চায়—

স্বামী তার কি কাজে লাগবে ঝুমা ?

তার অন্যায়ের মাশুল দেবার কাজে লাগবে স্বামী। বিনিময়ে ফিলম-স্টার বউয়ের গাড়ি চাপতে, মদ খেতে, রেস খেলতে, ফূর্তি করতে পারবে—

এতদূর ভেবেছ তুমি এখনই—আশ্চর্য !

অনেক দূর যেতে হবে যে আমাকে। বস্তি থেকে আইসোলা বেলায়—

আগে কথা ছিল ঝুমাকে নামিয়ে দেবতা যাবেন লাইটহাউসে ছবি দেখতে। এখন মত পালটালেন দেবতা। ড্রাইভারকে বললেন, আগে লাইটহাউসে চলো—

লাইটহাউসে গাড়ি দাঁড়ায়নি তখনও ভালো করে, ঝুমার হাঁটুতে খুব ঈষৎ চাপ দেন সুদর্শন দত্ত। বলেন : চলো না, তুমিও ছবিটা দেখবে আমার সঙ্গে—

না।

কেন—

আমি দেখেছি আমার সঙ্গে গেলে কারুর ছবি দেখা হয় না—

লাইটহাউসের দেয়ালে মনরোর বুক প্রায় খোলা ছবি। তার তলায় লেখা, মনে মনে উচ্চারণ করে পড়ল ঝুমা : SOME LIKE IT HOT!

বোকা হালদার গাড়ির পেছনে গিয়ে বসল। ড্রাইভারের সিটে বসা ঝুমাকে বলল : আজ হেলপ ছাড়াই চালান। না হলে কোনও দিনই নিজে চালাবার নার্ভ হবে না--

যদি অ্যাকসিডেন্ট হয়?

জানব ভাগ্যে তাই ছিল—

বেশ। আমাকে দোষ দেবেন না কিন্তু—

দোষ দেবার সময় কি পাওয়া যাবে সত্যি সত্যি অ্যাকসিডেন্ট হলে?

কোনদিকে যাব?

আমি যেমন যেমন বলব তেমন তেমন চালাবেন—

উইশ মি গুড লাক দেন—

বেস্ট অব লাক—

সেম টু য়ু!—ঝুমা চাবিতে হাত দেয়।

রবিবার সকাল ছটার ফাঁকা কলকাতা। হাওয়ায় উড়তে লাগল ঝুমার কালো চুলের দুএক কুচি অন্ধকার রেশমের চেয়েও পাতলা। সূর্যের আলোয় চিকচিক করে। কনুইয়ের গায়ে ব্লাউসের বড় হাতা পতপত করে লাগছে। হাওয়া এসে লাগছে ঝুমার মুখে বুকে চুলে। ঠাণ্ডা হাওয়া। লেকের ওপর থেকে আসছে লেকের জলে চান করে। কলকাতার রাস্তায় ভালগার ম্যাডিং ক্রাউড তখনও দেখা দেয়নি। একটা দুটো গাড়ি। কয়েকটা ঠেলা। দু-

চারটে মানুষ। খবরকাগুজে সাইকেল। এই সম্বল রাস্তায় গাড়ি চালাতে একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল ঝুমা। ঝুমা দেখেনি তাই। বোকা হালদারের বিভ্রম ঘটেনি। গলির ভেতর থেকে ব্রেকখারাপ হর্নহীন লরি বেরিয়ে আসছিল অসম্ভব জোরে। বোকা মুহূর্তের মধ্যে পেছন থেকে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ে ঝুমার হাতে ধরা স্টিয়ারিং-এর ওপর। মরতে মরতে বেঁচে যায় মরিস গাড়িব দেশলায়ের খোল। বেঁচে যায় ঝুমা। বোকা হালদার।

সম্বিৎ ফিরে পেযে ঝুমা বলে ঃ এবার আপনি চালান—

না। এখন ছেড়ে দিলে আর স্টিয়ারিং ধরতে পারবেন না জীবনে—

এরাস্তা ওরাস্তা করে যেখানে গাড়ি থামাতে বলে ঝুমাকে সেখানে একখানা গাড়ি দাঁড়ালে, আরেকখানা গাড়ির পাশ কাটিয়ে যাওয়া অভিজ্ঞ ড্রাইভারেব পক্ষেও সোজা কাজ নয় খুব।

এখানে কেন?

একজন লোককে আমি নিয়ে আসছি এখনই, যাব হাতে আপনার গাড়িব মেরামত সবচেয়ে সস্তায়, সব চেয়ে ভালো হবে—

মিস্ত্রি?

না। গাড়িকে প্যাসনেটলি ভালোবাসে এমন লোক ওই একজনকেই দেখলাম। আগে কাজ করত অন্য জায়গায়। এখন নিজেই খুব ছোটো একটা কারখানা করেছে—

ঝুমা চুপ করে বসে আছে গাড়িতে। বোকা হালদারকে ডিফারেণ্ট মনে হয় কেন। সত্যি ডিফারেণ্ট, না, এও চাল? খুব চালাক বলেই খুব সাবধানে এগুচ্ছে। বোকা হালদারকে বিয়ে করলে কেমন হয়? হয়ত তাকে খুব বেশি বিরক্ত করবে না। হয়ত,—

পেছন থেকে চেনা গলার আওয়াজে চমকে ঘাড় ফেরাতেই সে থমকে যায়।

দুজনে দুজনের দিকে তাকায়। ঝুমা আর পঞ্চু। বোকা হালদার একটু পিছিয়ে পড়ে। ইচ্ছা করেই কি না কে জানে!

তুমি?

তুমি?

দুটো কথা কেবল। না। একটাই কথা। তাতেই যে কখনও কখনও দুটো লোকের সব কথা বলা হয়ে যায়, যে একথা সব চেয়ে ভালো করে জানে তার নাম বোকা হালদার। সে অন্যদিকে তাকিয়ে সিগারেটের মুখাগ্নি করে। কানা ছেলের নামই সব সময় পদ্মলোচন না। কখনও কখনও অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তির নামও যে বোকা হয় হয়, তাতেই অবধারিত হয় যে সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। এবং ব্যতিক্রম কোনও নিয়ম নয়।

বাড়ি ফেরার রাস্তায় বোকা হালদার স্টিয়ারিং ধরে। ঝুমা জিজ্ঞেস করে: আপনি সব জানতেন?

না? কি? ন্যাকা সাজে বোকা হালদার।

পঞ্চু আমাকে ভালবোসত—

না। তা জানতাম না। তবে এটুকু জানি যে, পঞ্চুই তোমাকে আজও ভালোবাসে—

ভালোবাসে?

চিরকাল বাসবে। ও একা—

সেন্টিমেণ্টাল ফুল—

না। সেন্টিমেণ্টাল-এর চেয়ে বিউটিফুল কিছু নেই পৃথিবীতে—।

ঝুমার বাড়িতে ঝুমাকে নামিয়ে দিয়ে, গাড়ি থেকে না নেমেই বোকা হালদার গাড়ির ইঞ্জিন চালু রেখেই বলল: গাড়ি চালানো শেখা আজ শেষ হলো। এবার আমার ছুটি—

তুমি আমায় গাড়ি চালানো শেখাতেই এসেছিলে?

না।

তবে ?

তুমি যেমন একদিন প্রিন্সকে পৌঁছে দিয়েছিলে রিনির কাছে, আজ তোমাকে তেমনই পৌঁছে দিলাম পঙ্কুর কাছে, তাই এবার আমার ছুটি—

না। তোমার ছুটি মঞ্জুর করলাম না আমি—

তোমার হুকুম এই প্রথম অমান্য করলাম মহারাণী—

বোকা হালদার ক্লাচ টিপেই অ্যাকসিলেটরে পা দিল। ঝোড়ো হাওয়ার মতো যেমন এসেছিল একদিন ঝুমাকে গাড়ি বেচতে, আজ ঝুমার সঙ্গে পঙ্কুর তেমনই দেখা করিয়ে দিয়ে, আরও কুইক, আরও ড্রামাটিক একসিট নিলো বোকা হালদার।

বাড়ির সামনে চুপ করে একটু সময় বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল ঝুমা। রবিবারের ভিড় ঝুমার বাড়ির রাস্তাতেও অ্যাপিআর হয়েছে এতক্ষণে। অসংখ্য লোক। অসীম আলস্যে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে কেউ। কেউ চলেছে অনির্দেশ লক্ষ্যে। কেউ দারুণ হনহন করে দৌড়চ্ছে। রবিবারেও তাদের রেহাই নেই কাজের হাত থেকে।

এদের কারুর সঙ্গে মিল নেই বোকা হালদারের। এই প্রথম একজন লোক যে ঝুমার কাছে কিছু চায় নি। না। পঙ্কুর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছে। নিজের জন্যে চায়নি কিছু। যে গাড়ি বেচবে বলে এসেছিল, সেই গাড়ি বেচার কথা দ্বিতীয়বার তোলেনি পর্যন্ত বোকা হালদার।

বোকা হালদার কি সত্যি গাড়ি বেচতে এসেছিল আদৌ ?

রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন ? বাড়ি ঢুকবেন না ?—ঘুম থেকে জেগে ওঠে যেন স্নতনুকা সেন। কে ?

আমার নামঃ শ্রীঅপরূপ। পুষ্পকরথ কাগজ থেকে এসেছি আপনার ইনটারভ্যু নিতে। সাত নম্বর সেল ছবির ট্রেলার যাচ্ছে এবারের কাগজে তার সঙ্গে আপনার জীবনী। এবারে তিন তিনজন পয়লা নম্বর আর্টিস্টের লাইফ বাদ দিয়ে আপনার লাইফই দেব ঠিক করেছি মিস সেন—

কিন্তু আমি আমার লাইফ দিতে রাজি নই। এখনও অনেক দিন বাঁচবার সাধ কি না!

কি বলছেন?

না, কিছু না। আপনার নামটা কি যেন বলছিলেন না?

নাম নয় ঠিক, ছদ্ম নাম, শ্রীঅপরূপ। আমার আসল নাম—

থাক. থাক আসলে দরকার নেই। ওই ছদ্ম নামেই হবে, অপরূপই বটে।

কেন? কেন? অপরূপ কেন?

অপরূপ নয়? আমার একটা ছবি এখনও বাজারে বেরোয়নি, আমার ইনটারভ্যু? আর্টিস্ট কাকে বলে জানেন?

কিন্তু সবাই তো লাইফ দিতে চায় আমাদের কাগজে—

তাদের কাছে যান। আমার কাছে এসেছেন কেন?

ইতিমধ্যে ক্যামেরা হাতে দেখা দেয় পেছন থেকে একজন। সে চীৎকার পাড়ে হঠাৎ: ছবি লই একটা পরাণদা? তোমাদের দুজনের?

খেঁকিয়ে ওঠে শ্রীঅপরূপ ওরফে পরাণ ঢোল: না। খুব হয়েছে। চলে এস। ছবি নিতে হবে না। তুমিই যত নস্টের মূল— অপয়া ট্যারার ডিম—

ট্যারা কেষ্ট শ্রীঅপরূপের পেছন পেছন পালিয়ে যায়। ঝুমার মনে হয়, মানুষ নয়। দুটো বাঁদর। এবার রেগে দাঁত খিচবে এ-ওর দিকে তাকিয়ে।

ঘরের দরজা বন্ধ করে দড়াম করে ঝুমা। সরলা ঘরে এসে কাউকে না দেখতে পেয়ে বলে: ও মা? ভালো মানুষের পো দুটো গেল কোথায়? তোর ছবি তুলবে বলে এসেছিল—

চলে গেছে—

ছবি তুলেছে?

না—

কেন?

আমাকে দেখতে ভালো নয়—

কোন্ মুখপোড়া বলেছে, নিয়ে আয় তো, নুড়ো জ্বেলে দিই তাদের মুয়ে—

না। তার চেয়ে আমাকে একটা গল্প বলো—

এখন তোর গপ্পো করার সময় হলো?

রাতে বলবে বলো। অনেক দিন তুমি গল্প বলো নি—। ঝুমা জড়িয়ে ধরে সরলাকে। সরলা পরিত্রাহি চেঁচায়ঃ ছাড়, ছাড়, রাতে গপ্পো বলব তোকে,—বলছি বলব—

কোন্ গল্পটা জানো?

কোন্‌টা?

সেই এক রাজকন্যা যে জানত না সে কি চায়—

ও, পুষ্পবতীর গপ্পো, ও গপ্পোটা তুই ভুলতে পারিস না কেন রে? তুইও বুঝি জানিস না কাকে চাস?

না—

আমি জানি। বলব?

বলো—

পঞ্চুকে।

কথা শেষ হলো সরলার আর ঝুমার কলে জল এল যেই। হাতঘড়িতে কটা বাজে? আটটা। হাতঘড়িটা কানে ঠেকাল ঝুমা। বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ!

পঞ্চুর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো আটটায়। তখনই বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে। বন্ধ হলে চলবে না। কারুর জন্যেই চলা বন্ধ হবে না তার। পঞ্চুর জন্যে তো নয়ই। অনেক দূর যেতে হবে এখনও। সবে বস্তি থেকে ভাড়া বাড়িতে। ভাড়া বাড়ি থেকে পৌছতে হবে আইসোলা বেলায়। দম দেয় ঝুমা ঘড়িটায়। কানের কাছে চেপে ধরে ছোট্ট ঘড়িটা আবার। টিক টিক, টিক। না। ঘড়িটা বলছে, ঠিক, ঠিক, ঠিক। কারুর জন্যেই দাঁড়ানো চলবে না,—ঝুমার কথাই ঠিক।

নামটা ঠিক বলেছিল ঝুমা সুদর্শন দত্তকে। তবে কথাটা সত্যি বলেনি। ইথেল সোয়ানসন ঝুমার টিউট্রেস ছিল না। ইথেল সোয়ানসন গড়ছিল ঝুমাকে। পাথর থেকে যেমন মূর্তি বানায়, মানুষই মানুষের মূর্তি বানায় পাথর কেটে কেটে, মনে হয় কখন বুঝি লোকটা কথা বলে উঠবে। এত জ্যান্ত, এত র‍্যাল, এত আশ্চর্য চোখ দেয় তাকে কোনও এপস্টাইন, ঠিক তেমনই করে উত্তেজক দেখতে একটা চমৎকার পুতুলকে ইথেল চোখে ভাষা দিচ্ছিল, ঠোঁটে উচ্চারণ, কেমন করে পুতুল থেকে হতে হয় প্যাসান, নিজের হাতে ইথেল সোয়ানসন কবচকুণ্ডল পরাচ্ছিল ঝুমাকে যেখানে ঘা খেয়ে ফিরে যাবে পথ থেকে পিছলে দেবার নিয়তির নিজের হাতে আয়োজিত সমস্ত কুটিল চক্রান্ত। ঝুমা যেদিন প্রথম কাজ করতে যায় মডেল হয়ে সেদিন মেক-আপ রুমে ইথেল বলেছিল, আজকের মডেল কেবল শরীর নয়। মডেল হতে হলে তোমায় শিখতে হবে পাখি যেমন করে উড়তে শেখে। তোমার শরীরে ডানা আছে, নাহলে শেখালেও তোমার কিছু হতো না। কিন্তু ডানা থাকলেই ওড়া যায় না। ওড়া গেলেও সে কারুর নজরে আসে না। এমন ভাবে উড়তে হবে যাতে মনে হয় মাটি থেকে যেন এক আকাশ নীল—নীল নদী হয়ে গেছে তোমার চলায়, তোমাকে মনে হবে অতল জলের আহ্বান নিয়ে উঠে আসা মৎস্যকন্যা।

আপনি যা করতে বলবেন আমি তাতেই রাজি আমি,—ঝুমা মুহূর্তের মধ্যে আচ্ছন্ন হয় ইথেল সোয়ানসনে।

না। আমার প্রথম আপত্তি, তুমি কিছুতেই রাজি হবে না—

আপনার কথাতেও না?

না। তুমি যদি আমাকে মেনে নাও, তাহলে তুমি আমার কথাগুলো মনে নিতে পারবে না—

তাহলে আমি কি করব?

ঝগড়া—

হেসে উঠল ঝুমা। মেক আপ রুমের গোধূলি ফেটে গেল সেই হাসিতে আচমকা। সমস্ত ঘরময় ছড়িয়ে গেল আকাশের ম্যাক্স ফ্যাক্টর। হাসতে হাসতে ঝুমা বলল: ওই একটি কাজই আমি ভালো ভাবে পারি, ঝগড়া—

কথাটা ঠাট্টা করে বলিনি। মনে রেখো, আমার কাছে, তোমার প্রথম পাঠ হচ্ছে, মেনে নেবে না কিছু, মেনে নেবে না কাউকে—

কেন?

কারণ মেনে নেয় যে সে ভালো মিস্ত্রি হয়, কখনও বড় আর্টিস্ট হয় না। শুধু আর্টের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের সব ক্ষেত্রেই এটাই একমাত্র সিক্রেট বড় হবার। অভিভূত হবে না কখনও, হেরে ভূত হও ক্ষতি নেই, বেঁচে থেকে অভিভূত হবে না কখনও।

তাহলে শিখব কি করে?

অস্বীকার করতে করতে, যুদ্ধ করতে করতে জীবন ভর দেখবে তোমার নিজের কথা নিজের মতো করে বলতে পারছ। প্রথমেই মেনে নিলে তোমাকে দিয়ে ভালো অনুকরণ সম্ভব হবে, কিন্তু তুমি কখনও অননুকরণীয় শিল্পী হবে না—

তাহলে?

তাহলে তোমার দ্বিতীয় পাঠ আমার কাছে হচ্ছে এই যে, অনুকরণ করবে না কখনও কাউকে; অনুসরণ করবে চোখকান খোলা রেখে।—

একটু থেমে মেক-আপে বসে ইথেল সোমানসন। বসবার আগে বলে: ইনাফ ফর ফার্স্ট ডে—

ঝুমাকে নিজের হাতে সাজানো যখন শেষ করে ইথেল, তখন আয়নায় যাকে দেখে ঝুমা তাকে তার চোখে এত বছর দেখবার পরেও নতুন লাগে। কি কি রূপান্তর ঘটিয়েছে ইথেল, ঝুমা আয়নায় সরজমিন তদন্ত শুরু করে। নাকের বাঁ দিকে একটা ছোট এলাচের দানার মতো বসিয়ে দিয়েচে ডট। ভুরুটা ধনুকের মতো আঁকা নয়। দূর থেকে দেখলে মনে হয় পাহাড়ের রেঞ্জের মতো সরু রেখা উঁচু থেকে নীচুর দিকে নেমে গেছে। চুলটাকে নিয়ে একটা গোছা এনে ফেলেছে ডান চোখের ওপর। আইল্যাশেস চক্‌চক্ করছে দারুণ। লাল একটা সোয়েটার গলাকাটা, তার ওপর লালেয় সাদায় মেশানো এক ছড়া মালা বুকটা উঁচু হতে আরম্ভ করেছে যেখানে, সেখানে ছুঁয়ে যাচ্ছে খুব আলতো, খুব অস্পষ্ট। বুকটা নিঃশ্বাস নেবার সময় উঠে আসছে ঢেউয়ের ওপর নৌকোর মতো, নিঃশ্বাস ছাড়বার সময় নেমে যাচ্ছে আবার, ঢেউ চলে যাবার পর ওই নৌকোরই মতো।

কি দেখছ তুমি আয়নায়? যা দেখছ, তার চেয়ে বেশি কিছু তোমার নজরে পড়ছে?

পড়ছে।

কি?

একটা অভাব—

রাইট ডার্লিং, কিন্তু সেটা কি?

বুঝতে পাচ্ছি না—

চেন্টা কর—

ঝুমা সিঁথির মাঝখান থেকে কয়েকটা চুল এক সঙ্গে করে ইংরেজীতে কপালের ওপর চুল দিয়ে এস অক্ষরটা লেখে, আর হাততালি দিয়ে ওঠে হঠাৎ খুশিতে ইথেল সোয়ানসন: এক্‌সটিক—

মানে কি কথাটার? জিজ্ঞেস করে ঝুমা।

ওর মানে? ওর মানে তোমায় কি করে বোঝাই? তোমার ভাষায় যে ওর কাছাকাছি যাবার মতো কথা নেই, কিংবা থাকলেও

জানা নেই তা আমার। এক্‌সটিক মানে কি জানতে চাইছ? এক্‌সটিক মানে তুমি, তোমার নাম কি?

ঝুমা—

ওয়াণ্ডাফুল নেম—দাঁড়াও তোমাকে দেখি ভালো করে—

ঝুমা উঠে দাঁড়াল মেক আপ টুল ছেড়ে। 'য়ু আ এক্সটিক ঝুমা, র‍্যাভিশিং—।' ইথেল সোয়ানসন চুমু খায় ঝুমাকে। মেয়েছেলে ইথেল সোয়ানসন। মেয়েছেলে ঝুমাও। তবু—জীবনে এই প্রথম অবশ হয়ে আসে ঝুমার সমস্ত অঙ্গ। ইথেলের দুচোখে দুর্বার মাতলা নদীর ওপারে কামনার কালো ঝড় এল বিদ্যুতের পাখায়। তাকাতে পারল না ঝুমা। আগুন ধরে গেছে তার মনে। একটু বাদে চোখ তুলে দেখে ইথেল সোয়ানসনের চোখ স্বাভাবিক, শান্ত সরোবর। [illegible] কি জানে ইথেল?

দিস ইস প্লে অব প্যাসন'—শুধুই অ্যাকটিং। আর্টিস্ট হতে হলে, তোমাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে, কোটি কোটি মানুষকে পাগল করে দিতে হবে কখনও চোখ দিয়ে, কখনও চলা দিয়ে, কখনও কথা বলে, কখনও কথা না বলে—

দিনের পর দিন ইথেল সোয়ানসন তৈরী করে ঝুমাকে,—ইথেল সোয়নসনের তাজমহল।

সাত নম্বর সেলের একটি দৃশ্যে একটি ইংরিজি কথা বলতে তিনটে টেক কমপেল করল যখন ঝুমা, তখন প্রোডিউসারের উটের মতো পিঠও প্রায় ভেঙ্গে যাবার মতো হলো। স্টুডিও সুদ্ধ লোক ততদিনে ক্ষেপে গেছে সুতনুকা সেনের ওপর। প্রথম প্রথম সুতনুকার নিষ্ঠায় মোটামুটি অবিচল ছিল প্রোডাকশন। ডায়ালগ রিহার্সাল দিয়ে তৈরী করে আসা, নিজের মেক আপ নিজে করা, কথা বলা সকলের সঙ্গে হেসে, জমিয়ে মাতিয়ে তুলেছিল সুতনুকা সেন, টলিউডের দরজা জানলা বন্ধ কাঠের ফ্লোরে এনেছিল সবুজ বসন্ত। প্রথম চিড়

খেল স্টুডিও ফ্লোরে যেদিন বাইরের লোক আসা বন্ধ করে দিল সুতনুকা। বলল, প্রয়োজনের বাইরে একজন বাহুল্যকেও বরদাস্ত করবে না সে শুটিং-এর সময়। কুমার দাশগুপ্ত স্বয়ং সে কথা তোলে প্রডিউসারের কানে। বলে: সুতনুকার ইনসোলেন্স ট্যু মাচ।

প্রডিউসার চৌধুরী বিরক্ত হন: মিস্টার দাশগুপ্ত আপনিই তো মেয়েটিকে বেছেছেন বলে মনে পড়ছে—। কুমার দাশগুপ্ত চুপ করে থাকে। যে মেয়েকে সামলাতে পারেন না, তাকে নিয়ে খেলতে যান কেন? কি করেছিলেন? গায়ে হাত দিতে গেছিলেন, না বলেছে, এই তো?

না, ওকে নিয়েছিলাম, ওর যুথ আছে বলে—

যুথটা থাকতে দিন না। অনেক তো হলো। ফিলমে কেউ আসতে চায় না, শুধু আপনাদের মতো এক গাদা অথব বুড়োর জন্যে। ক্ষমতা নেই অথচ লালসা আছে। আপনাদের নাটের গুরু দেবতার কাছে কেবল এই সবই শিখেছেন: আর শিখেছেন, তিন মাসে ছবি করে দেব বলে আঠার মাসে বছর করতে। যান এখন। কাল মেয়েটার শুটিং আছে?

কালকের ডেটটা ক্যানসেল করা হয়েছে—

চমৎকার! কেন?

সুছন্দা দেবীর শরীর খারাপ—

ওই সেটে আর কারুর কাজ নেই?

না। সুছন্দা আর সুতনুকার সিন ওটা—

বেশ। কবে নেকস্ট শুটিং?

বুধবার—

ঠিক আছে। আমি লাঞ্চের ব্রেকে যাব। মিস সেনকে একবার দেখা করতে বলবেন—

বুধবার বেলা দেড়টায় প্রোডিউসার চৌধুরীর ঘরে ঢুকে সাপ্রাইজড হলো সুতনুকা সেন। ঘর অন্ধকারও নয়, নির্জনও নয়। আর

একজন লোক বসে ঘরে। সমস্ত দরজা জানলা খোলা। আলো আর হাওয়ার উইদাউট টিকেট আসা-যাওয়া মুহূর্তে বলে দিচ্ছে স্বতনুকার মুখের ওপর, চৌধুরী জাতে আলাদা। ফিলম ম্যাগনেট নয়। এ ম্যাগনেটের বানান অন্য, ঠিকুজি ডিফারেন্ট। মানুষটার আকর্ষণ তার চেহারায় নয়; দুচোখের বুদ্ধির দীপ্তিতেও নয়। তাছাড়া আরও কি যেন আছে চৌধুরীর? তল পাওয়া শক্ত।

স্বতনুকা চোখ নামাল। চৌধুরী চোখ তুলল।

লাঞ্চ হয়ে গেছে মিস সেন?

এখনই? তাহলে তো এবাজ্যের চেহারা পাল্টে যেত—

আপনার খাওয়া হয়নি এখনও?

আমি তো স্টুডিওতে কিছু খাই না—

খুব খারাপ খাবার বুঝি?

না। না। মোটেই না। আমার বাড়িতে এর চেয়ে অনেক সাধারণ খাওয়া আমি খাই—

তবে?

খেয়ে কাজ করায় বিশ্বাস করি না। কাজ করে খেতে চাই—

আপনার সঙ্গে যারা কাজ করে তারা কি বিশ্বাস করে জানেন?

জানি—

কি?

না কাজ করেই সব খেতে চায়—

এদের সঙ্গে কাজ করতে হবে, আপনি একা পড়বেন যে—

স্বতনুকা সেন বরাবরই একা—

নতুন কথা শুনছি আপনার মুখে—

নতুন এসেছি এখানে এবং কোনও দিনই আমি পুরোনো হব না জানবেন। সে কথা থাক। আপনাকেও নতুন লাগছে আমার—

কি রকম?

এই প্রথম, একজন লোককে দেখলাম যে অন্ধকার ঘরে একা

আমাকে ডাকেনি কোনও ছুতোয়। কিন্তু সে কথা থাক। কি জিজ্ঞেস করবেন বলে আমাকে ডেকেছেন—

সে প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে গেছি—

তাহলে আমি উঠি—

যাবার আগে একটা কথা বলব, রাখবেন ?

অনুরোধ না হুকুম ?

কোনটাই নয়। প্রার্থনা—আমার সঙ্গে একদিন খাবেন ?

কোথায় ?

বাড়িতেই বলতাম, কিন্তু আমি ব্যাচেলার—

তাতে কি হয়েছে ?

আমাদের সমাজে বাড়িতে মহিলা কেউ না উপস্থিত থাকলে, আরেকজন মেয়েকে ডাকা যায় না—আর আমার বাড়িতে একটা মাদি বেড়ালও নেই—

কোনও দিন যদি বাড়িতে ডাকতে পারেন, তাহলে হুকুম করবেন, যেখানেই থাকি যাব। হোটেলে আপনার সঙ্গে যেতে আমার বেজায় অরুচি।

সুতনুকা সেন ফিরে গেল ফ্লোরে। দুপুরের সাংঘাতিক কড়া আলোয় হঠাৎ ভীষণ দুস্টুমি করতে ইচ্ছে করল ফিল্ম ওঅর্লডের একমাত্র গুড বয় অজিত চৌধুরীর। সুতনুকার সঙ্গে একা দেখা করতে চায়নি বলে যাকে বসিয়ে রেখেছিল ঘরে, সে বোধ হয় চৌধুরীর মুখে তার মনের খবর পড়তে পারল। দূরে বসে হাসতে হাসতে বলল : কি ? যা ইচ্ছে তাই করতে ইচ্ছে করছে আজ ?

না, যা ইচ্ছে নয়, তাই করতে ইচ্ছে করছে আজ।

স্টুডিও ফ্লোরে ফিরে আসতেই দৌড়ে এল ইথেল সোয়ানসন : গুড আফটারনুন ঝুনা, কোথায় গেছিলে ?

গুড আফটারনুন ইথেল, কতক্ষণ ?

অনেকক্ষণ—

আমি প্রোডিউসারের সঙ্গে দেখা করতে গেছিলাম, স্যর—

ছ্যাটস ওল রাইট, ঘেমে নেয়ে গেছ যে—

চলো আমার রুমে।

কাজ আরম্ভ হবে কখন?

এই তো সবে কলির সন্ধ্যে, এর নাম টলিউড ইথেল, এজায়গা অকাজের জন্যে। এখনও কাজের জায়গা হয়ে উঠতে অনেক দেরি—

কথাটা যাতে স্টুডিওর পাতলা কানের অনেক ভেতর পর্যন্ত সেঁধোয় তার জন্যে একটু জোরে, একটু স্পেশাল ইফেক্ট দিয়ে উচ্চারণ করলো সুতনুকা সেন। তাতেই কাজ হলো। সুতনুকার তীর টলিউডের গসিপ-এর খুলে দিল মুখ। অনেকদিন মুখোরোচক কিছু বলতে না পেরে, জলের মাছ ডাঙ্গায় যেমন, তেমনই হাঁপিয়ে উঠেছিল, এখন তোলপাড় করে তুলল তারকাপুরীর সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত। সব চেয়ে কাছে কান দুটো বুকের চেয়েও বেশি খুলে দাঁড়িয়েছিল যে কিউ লুফে নেবার জন্যে, বরাবরই গসিপের গোলা তার হাতের ধাক্কাতেই গড়াতে শুরু করে। সুছন্দা ব্যানার্জি এবারেও তার ব্যতিক্রম হতে দিল না। অর্থাৎ শি সেট দ্য বল রোলিং।

মাছের গন্ধে বেড়ালের মতো কারুর কথা আর কারুর কাছে লাগাবার সুযোগের সৌরভে সমস্ত শরীর ম ম করে যা। সারাক্ষণ তার তুলনা গোটা টলিউডে এক সে-ই। সুছন্দা ব্যানার্জি। এ ক্লাস বাই হারসেলফ। সুতনুকার কথায় তিল থেকে গাথাব তাল না বানানো তক সব ভুলে যাবে সে। ডায়ালগ বলতে পারবে না। এনজির পর এনজি হবে শট। ডিরেক্টর চটবে, আর সবাই হাসবে। তাই সে ডগরোতে চলল খাবার টেবলে যেখানে গোটা য়ুনিটের মাথা থেকে পা পযন্ত সবাই কাজ ভুলে খেতে এবং অন্যলগার ঢলাঢলিতে গা ছেড়ে দিয়েছে, ঢালু রাস্তায় ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া গাড়ির মতোই। উত্তেজনায় তখন সুছন্দার চল্লিশ বছরের মাথায়

জোর করে পরানো কুড়ি বছরের পরচুলো খসে পড়ছে যে সেদিকে পর্যন্ত খেয়াল নেই।

কুমার দাশগুপ্তের পিঠের ওপর যতখানি সম্ভব ঝুঁকে পড়ে সুছন্দা গদগদ গলা হলোঃ শুনলেন কি বলে গেল আপনাদের সুতনুকা?

আরও কুঁজো হয়ে গিয়ে কুমার দাশগুপ্ত মাথা ঝাকাল না। সবাই খাওয়া থামিয়ে উৎকর্ণ হলো। কি, কি বলেছে সুতনুকা?

সুতনুকা বলেছে যে স্টুডিও হচ্ছে অকাজের জায়গা—

হ্যা, ঠিকই বলেছে সুতনুকা, আমাদের কাছে রিটেক হচ্ছে সবচেয়ে অকাজ—

আর, সুতনুকার জন্যে যত টেক এনজি হয় এত আর কারুর জন্যে কখনো হয়েছে বলে শুনিনি—

স্টুডিওর কাজকে সব চেয়ে অকেজো করেছে যে তার মুখে ওকথা মানায় না—

একের পর এক সার্ভিস ফিরিয়ে দিল সুছন্দা এক কথায়' কথা আমাকে না বলে—সুতনুকাকে বললেই ভালো হয় না?

যাকে বললে সব চেয়ে ভালো হয় তাকেই বলা হয়েছে, আজ চৌধুরী এইমাত্র ডেকে পাঠিয়েছিল সুতনুকাকে,—কুমার দাশগুপ্তের মুখের ভাব যেন এর পর আর কথা ওঠে না।

তাতে কোনও কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না—, সুছন্দার চোখের কোণে নোংরা আলোর ঝলকানি।

কেন?

কারণ, সুতনুকা সেখান থেকে আসবার পরই কথাগুলো বলেছে, তাছাড়া—

তাছাড়া?

তাছাড়া আপনার মনে থাকা উচিত, যে চৌধুরী ব্যাচেলার আর সুতনুকার বয়স খুব কম—

চৌধুরী সে ব্যাচেলার নয়, ওকে টলানো উর্বশীর পক্ষেও সম্ভব নয়। সুতনুকার পক্ষে অসম্ভব।

সব পাখিই মাছ খায়, নাম হয় শুধু মাছরাঙার—সুচ্ছন্দা কথাটা বলে ফেলে ভারি তৃপ্তি পায়। চৌধুরীকে ফাঁসাতে চেষ্টা করে পারেনি সুচ্ছন্দা। কেউ যদি পারে কখনও তাতে যেন তারই ক্রেডিট হবে,—সুচ্ছন্দার মনের কথা এই। সুতনুকাও যদি পারে, তাহলে সুতনুকার কাছে সে গ্রেটফুল রইবে। কৃতজ্ঞতা সুচ্ছন্দার ধর্মবিরুদ্ধ ব্যাপার। সেই বিরুদ্ধাচারণ সে-ই একবার করবে, যদি কেউ পারে একবার চৌধুরীর উঁচু মাথা মাটিতে লুটিয়ে দিতে। যদি কেউ পারে, বিদ্যুতের মতো সেই নাম ফ্লাশ করল মনের বাল্বে সুচ্ছন্দার। যদি কেউ পারে তো সে সুতনুকা সেন।

এই প্রথম একজনের সাফল্য কামনা করল সুচ্ছন্দা ব্যানার্জি। আর তার শরীর গুলোতে লাগল হঠাৎ। ঘুরতে লাগল মাথা। সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল ধুপ করে।

কি হলো মিসেস ব্যানার্জি? একজন সহকারী পরিচালক দৌড়ে এল।

এক গেলাস জল—

জল খেয়ে একটু সুস্থ বোধ করে সুচ্ছন্দা।

এখন ভালো লাগছে একটু?

খুব। আচ্ছা বলুন তো সুতনুকা পারবে?

কি পারবে সুতনুকা?

না, না। সে আপনি কি করে বলবেন? আপনি যান ভাই, আপনার কাজে—

কাজ নেই আমার কিসসু, বলুন, কি পারবে সুতনুকা।—

এনর্জি না করতে—

ওঃ এই কথা? তাই বলুন। আমি ভেবেছি কোনও অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবে কি না সুতনুকা, জানতে চাইছেন—

অসম্ভব ? কি অসম্ভব যা সুতনুকা পারবে সম্ভব করতে ?

ধান-খাওয়া পাখিকে মাছরাঙা বানাতে—

সুছন্দা ব্যানার্জি দ্বিতীয়বার অসুস্থ বোধ করতে থাকে।

আরেক গেলাস জল দেব ?

না। হাতের ইশারায় তাকে চলে যেতে বলে সুছন্দা। দুহাতে মুখ ঢাকে। তার মনের কথা মুখে পড়তে পারছে আজ সামান্য একজন অ্যাসিস্টেণ্টও। না। অভিনয়ের বেলা তার পড়ে এল সুনিশ্চিত।

মিসেস ব্যানার্জি, গেট রেডি—

আপনার সুতনুকা রেডি হোক আগে—

উনি ফ্লোরে এসে গেছেন—

তাই বুঝি—তাহলে তো আর অপেক্ষা করা যায় না, আমিও ফ্লোরে চললাম—

মুখে একটু পাওডার—

পাওডারের শাকে বয়সের মাছ আর ঢাকা পড়ছে না যে কুমার বাবু—

না। তবুও একটু বুলিয়ে নিন, ঘেমে গেছেন—

যাই তাহলে, সুর টেনে সেই পচা ন্যাকামি করে সুছন্দা। কিন্তু কে বুলোবে ?

কেন, শচীন, মেক-আপ ম্যান ?

সুতনুকা ছাড়া আর কাউকে বুলোতে তার মন উঠবে কি ?

এটা তার কাজ—

তবে যে শুনলাম স্টুডিও হচ্ছে অকাজের জায়গা—

কেন ওসব কথায় কান দেন মিসেস ব্যানার্জি ? জীবনভোর তো শুনলেন—

না। এমন কথা কখনও শুনিনি—

তাহলে মেক আপ ছাড়াই যান সুতনুকার কাছে। তার কথাই শুনুন গিয়ে, আমার কথা যখন শুনবেন না—

রাগ করছেন ?

আপনার ওপর রাগ করবার অধিকার তো আপনি দেননি—

তবে যে একবার রাগ করেছিলেন—

কবে ?

সেই যে একদিন দুপুরে আসতে চেয়েছিলেন, আর না করেছিলাম আমি—

সে আমার মনে নেই—

আমার আছে—

কি রকম ?

তারপরে আর আপনি আসেননি আমার ওখানে, কোন ছবিতে নেনও নি—

ভুলে গিয়েছিলাম যে—

এবার আসবেন একদিন ?

বললেই যাব—

ঠিক ?

ঠিক।

যদি বলি কাল আসবেন—

কখন ?

ভোর পাঁচটায়—

ভোর পাঁচটায় ? তখন কেন ?

গোয়ালা দুধে জল মেশাচ্ছে কি না যদি একটু দাঁড়িয়ে দেখেন—

কুমার দাশগুপ্ত আর দাঁড়ায় না।

সাত নম্বর সেলে সুছন্দার কাজ আজই শেষ না হলে কুমার দাশগুপ্ত কি করত তা জানে বলেই সুছন্দা তা একদিন আগেও বলত না। কুমার দাশগুপ্তের পরের ছবি আর পাওয়া শক্ত হত। যদি পায়, তখন আবার একটু নরম হয়ে দুটো মিষ্টি কথা বললেই মরীচিকার পেছনে দৌড়তে শুরু করবে কুমার দাশগুপ্ত ঠিক। একই ইতিহাসের

পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী, ইতিহাসের কিছুই না জেনে, সুছন্দা এটুকু জেনেছে। কুমার দাশগুপ্তের বয়স হয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা কাজের দিন শেষ হয়ে এসেছে তার। এখন সুছন্দা, সুছন্দাই সই। নাহলে সুতনুকার দিকেই হাত বাড়াত কুমার দশগুপ্ত। সুতনুকাকে প্রথম ছবিতে নামালেও সুতনুকার সান্নিধ্য এখন নাগালের এত বাইরে যে দ্রাক্ষাফল তিতি টক বলে সান্ত্বনা পাবার দিনও আর নেই। তাই আজ কুমার দাশগুপ্তকে মনের একটুখানি আভাস দিল সুছন্দা। এ বিট অব হা মাইণ্ড।

অনেকক্ষণ বাদে বেশ একটু হালকা লাগছে নিজেকে সুছন্দার। ফ্লোরের দিকে এগুল সে স্বচ্ছন্দ গতিতে। আর তার একটু বাদেই বোঝা গেল সুতনুকার জিত হয়েছে প্রোডিউসারের সঙ্গে ডুয়েলে। এপর্যন্ত তিনটে রিটেক করিয়েছে সুতনুকা। আজ ছবার রিটেক করাল একটা ডায়ালগ। তক্ষণ পর্যন্ত না ইথেল সোয়ানসন আঙুল তুলে সুতনুকাকে ইশারা করল ওকে, ততক্ষণ সুতনুকা টেকের পর টেক করতে বাধ্য করল ক্যামেরাম্যানকে। এমন ভাব করল যাতে বুঝতে বাকী রইল না কারুর যে সে সবচেয়ে শক্ত খুঁটির জোরে লড়ছে। ডিরেক্টর কুমার দাশগুপ্তকে মুছে দিয়ে সুতনুকাই ডিরেক্ট করল নিজেকে। ইথেল কেবল সেকেণ্ড করল। স্টুডিও সুদ্ধ লোক হলিউডে প্রথম পা দেবার পরই এমন দুঃসাহসের দীপ্তি কারুর মধ্যে কখনও দেখেছে মনে করতে পারল না। সমস্ত ফ্লোরে একটা সিংহ তার সমস্ত কেশর ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে। চোখে, মুখে, প্রত্যেক অঙ্গ সঞ্চালনে মনে হচ্ছে একটা কথা বললেই বসিয়ে দেবে থাবা। সামান্য ডায়ালগ,—উঠে আসছে অন্তহীন গহন গহ্বর থেকে অন্তঃপুরের,—যেখানে সামান্যকে জারকরসে জারিত করে প্রতিভা জন্ম দেয় অসামান্যের। যা লৌকিক তা অলৌকিক হয়ে ওঠে যার

স্পর্শে; সেই অলৌকিক মায়া আজ সুতনুকার চোখে,—যার চোখ আছে কেবল সেই নয়, যার চোখ নেই তার চোখেও অপ্রতিভাত হওয়া অসম্ভব।

সুছন্দা ব্যানার্জি পর্যন্ত ঈর্ষা করতে ভুলে গেল সুতনুকাকে। কুৎসার শকুনি বিস্মৃত হলো মুহূর্তের জন্যে মুখরোচকের শব।

ভিড় আর শব্দ আর ক্লান্তি আর প্রাণধারণের গ্লানি আর দিন যাপনের দুঃসহ একঘেয়েমির সিন্ধুর ওপারে অখণ্ড চাঁদ উঠল সেদিন আলোয় ধোয়া আকাশের গায়। দিনাবসানের শঙ্খধ্বনি থেমে গেছে অনেক আগে। তার মঙ্গল-নির্ঘোষের রেশ মিলোয়নি কান থেকে ঝুমার। ছাদের ওপর বসেছিল। আকাশে পেতে দিয়েছিল চুলের গন্ধ, কাঁকনের রিনিঝিনি সচকিত করে তুলেছিল হাওয়াকে। স্বপ্নমধুর রাত আসছে আলস্যঘন সন্ধ্যার রিক্ত প্রান্তে। দক্ষিণের হাওয়ায় দুষ্টুমির প্রথম ইশারা দুলছে। স্থির আনন্দ, মৌনমাধুর্য ধারা আকাশ ছাপিয়ে ঝরছে। মুগ্ধ প্রহর ভরে আকাশ দেখার পরে আজ যখন চাঁদের আলোকিত করতল ঝুমার করতলে হারা।

সিঁড়িতে পরিচিত পায়ের শব্দ।

কে ?

অজিতবাবু এসেছেন—

ওপরে পাঠিয়ে দাও—

একটু বাদে অথবা সে একযুগ। চেনা গলা উঠে এল অন্ধকারে : আপনি এখানে ?

'আপনি' ? আহত অভিমান ক্ষুব্ধতায় ভেঙ্গে গেল। গলা দিয়ে আর একটিও কথা বেরুল না ঝুমার।

তুমি একা ঝুমা ?

আমরা দুজনে একা—

দুর্নিরীক্ষ্য একটি তারার আলো এসে পৌঁছল সেই পৃথিবীতে প্রথম।

একটা ছোট টেবলের ওপর ছাইদানি রাখাই ছিল। অজিত চৌধুরীর বসবার জন্যে একটা মোড়া। ঝুমা বসেছিল আরেকটা মোড়ায়। চৌধুরী সিগারেট ধরাল একটা। ঝুমা জিজ্ঞেস করল : কি খাবে ? ঠাণ্ডা কিছু,—চৌধুরী উত্তর করে। ঠাণ্ডা আসছে এখনই ; আর কি খাবে ? কিছু না।—চৌধুরীর কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি শরবত এল কাচের গেলাসে সাদা প্লেটের ওপর বসানো, সাদা প্লেট মাথায় ঢাকা দিয়ে। সিগারেটটা রেখে শরবতে মুখ দিল চৌধুরী। এক নিঃশ্বাসে প্রায় সবটুকু মুখের মধ্যে চলে গেল। ভীষণ তেস্টা পেয়েছিল তার, চৌধুরী জানাল। জানানোর দরকার ছিল না। ঝুমা, আরও এক গ্লাস শরবত পাঠাতে বলল কিছুক্ষণ বাদেই।

কোথায় ছিলে সারাদিন ?

স্টুডিওতে—

কেন ?

নতুন ছবির গল্প পড়া হচ্ছিল—

কি গল্প ?

সেই পুরোনো পচা গল্প, গরিব লোকের মেয়ে আর বড়লোকের ছেলে, বাংলা ছবির একমাত্র গল্প—

কি করবে ঠিক করলে ?

ও গল্প করব না, এইটুকুই ঠিক করতে পারলাম কেবল—

চাঁদের আলোয় ঝুমা চান করছে তখন। সারা গায় জ্যোৎস্না হেঁটে বেড়াচ্ছে অপরূপ রূপরাগে। দেহকে মনে হচ্ছে দেবালয়ের প্রদীপ। কাঁপছে তার ভেতরের আলো দেহের দীপে এদিক ওদিক। উত্তেজনা নয়। উদ্দীপনার উৎস মনে হচ্ছে ঝুমাকে চৌধুরীর। একই পৃথিবীতে এত কাছে এত আলো ছিলো চৌধুরী জানত না। টলিউডে এক্সট্রা থেকে এক্সট্রাওর্ডিনারি সকলকে দেখা শেষে এই একটির দেখা পাওয়া গেল যার দেখা না পাওয়া গেলে টলিউডের নোংরা ঘাটাই

জীবনের একমাত্র সঞ্চয় হত। ভাগ্যকে অজস্র অকৃপণ ধন্যবাদ চৌধুরীর, সুতনুকা সেনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে যাবার আগে। না। সুতনুকার সঙ্গে নয়। ঝুমার সঙ্গে। তাজমহলের সঙ্গে নয়;—মমতাজের সঙ্গে।

অপরাহ্নের আলো এসে পৌঁছেছে চৌধুরীর জীবনে। চল্লিশ বছর তার বয়স হলো। ঝুমাকে দেখে প্রথম যে শোনা-কথা সত্য মনে হয়েছে তা হচ্ছে লাইফ বিগিনস অ্যাট ফর্টি। আবার নতুন করে নামতে ইচ্ছে করছে দুরন্ত কাজের ঘূর্ণির মধ্যে। ঝুমাকে নিয়ে ছবির পর ছবি করতে চাইছে চৌধুরীর ক্লান্ত কর্মক্ষমতা। সাফল্যের পর অনিবার্য ক্লান্তির শুকনো গাঙে জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক,—আবার তার কলরব কানে আসছে। মানুষের শরীর যে বিধাতার শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম ঝুমাকে না দেখলে তা অজানা থেকে যেত চৌধুরীর।

কি এত ভাবছ তুমি? আমাকে বলতে বাধা আছে?—ঝুমার গলার ভায়োলোকোনে কৌতূহল বেজে ওঠে।

আছে—

ও—অভিমানের তমালছায়া ঝুমার কালো চোখকে আরো গভীর কালো করে তোলে। হেসে ফেলে চৌধুরী: এত রাগ তোমার আছে তোমাকে দেখে তা মনে হয় না—

জানি—

কি জানো?

আমাকে দেখে মনে হয় আমার শুধু শরীর আছে—

শরীর তো তোমার সত্যিই আছে, সেকথা তুমি জানো না?

বেশ,—শরীরের জন্যে এসে থাকেন যদি শরীরই পাবেন; আপনাকে না বলে টলিউডে এমন ঘাড়ের ওপর দুটো মাথা কার আছে?

চুপ করে হাসে চৌধুরী। ঝুমাকে রাগাতে ওই একটি কথাই যথেষ্ট।

শরীর। শরীর শুনলেই হয়ে গেল—ওই আশ্চর্য, ওই মহিমময় শরীরের কথা শুনলেই। সবাই ওর শরীর দেখে, কেউ ওকে দেখে না, পুঞ্জীভূত অভিমানের আকাশে এক আষাঢ় মেঘ এনে হাজির করে মুহূর্তে। চোখ দুটোয় নামে কালো কাজল ছায়া। পাতলা ঠোঁটের পাতা দুটো কাঁপতে থাকে হাসির রঙে রঙ করা প্রজাপতির ডানার মতো। দুটি অক্ষর আধো উচ্চারিত হয় সেই পাখায়ঃ বেশ। এই দুটি অক্ষর যে ওই ডানায় বাজতে না শুনেছে একবারও, সে কোনও দিন বুঝবে না, ঝুমার ওই আশ্চর্য রূপ কোন্ আশ্চর্যতর অপরূপের আভাস।

তোমার শরীর যে পাবে সে তোমাকে পাবে না। আমি তোমার শরীর চাই না তোমাকে চাই—

তাহলে এই শরীরটার জন্যে তোমারও মাথা খারাপ হয় কেন মাঝে মাঝে?

ওই শরীর দেখে যার মাথা একবারও ঘোরে না তার মতো নিরেট মাথা আমার নয়—

ঢের হয়েছে, আর নেকামি করতে হবে না—

রাগের লাল মেঘের গরাদ ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়ে অনুরাগের রঙে রাঙা রোদ। এক ঝাঁক পায়রার খুশি নিয়ে আকাশ ঝলমল করে ওঠে আবার।

কি ভাবছিলে বলো?

ভাবছিলাম তোমার সঙ্গে আজ আমার এই তৃতীয়বার দেখা, এত কাছাকাছি এত নিবিড় কথা আমাদের মুখে উপন্যাসে পড়লেও লোকে অবিশ্বাস করত। বলত, এ হয় না—এ অসম্ভব—

কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখাতেই যদি তুমি আমার গায়ে হাত দিতে, তাহলে ঠিক উপন্যাস হতো, না?

হ্যাঁ। সেইটেই তো স্বাভাবিক—

না। উপন্যাসে যা অসম্ভব তা তো[illegible]র আমার জীবনে কি করে সম্ভব হলো জানো?

কি করে ?

শুধু বাস্তবকে অস্বীকার করে—

কি রকম ?

যদি তুমি সবাই যা চায় আমার কাছে, যার জন্যে আসে, তুমিও যদি তাই চাইতে, তারই জন্যে আসতে শুধু, তাহলে আমি যখন তোমার সব চেয়ে কাছে থাকতাম তখন সব থেকে দূরে থাকতাম তোমারই কাছ থেকে—

আর যদি তার জন্যে না এসে থাকি ?

তাহলে যখন তুমি দূরে, অনেক দূরে, তখনও তোমার চেয়ে আরও কাছে আমার আর কে ?

যদি কখনও দুর্বলতা আসে ?

যদি কখনও বলছ কেন ? আসবেই তো মাঝে মাঝে—

তখন ?

তখন তার ওপরে উঠতে হবে আমাদের। দুর্বলতা না এলে বলপরীক্ষা হবে কার ? যে উত্তেজিত হয় না, সে উদ্দীপিত হবে কি করে ?

কথাগুলো বলতে বলতেই দুর্বার হাসির অর্কেস্ট্রায় বেজে উঠল ঝুমা হঠাৎ। সেই উচ্ছ্বসিত, উদ্বেল, উদ্দাম, উলঙ্গ হাসি শরীরের দুকূল ছাপিয়ে ছড়িয়ে গেল আলোকিত শূন্যে। শরীরের তীরে হাসির তরঙ্গ ভেঙে পড়ল। আবার এল, আবার ভেঙ্গে পড়ল। একটার পর একটা স্প্যাসম, মনে হলো হাসি নয়। কাঁদছে ঝুমা। হাসির চোখে জল—দেখল চৌধুরী।

হাসছি কেন জানো ?

কেন ?

আমার মুখে এই কথাগুলো কত বেমানান তাই ভেবে। কি জানো, বড়ঘরের মেঁয়ে-বউ যখন খারাপ কথা বলে অথবা বেরিয়ে যায় ড্রাইভার কি মাস্টারের সঙ্গে তখন তা নিয়ে উপন্যাস লেখা হলে তা

হলো ষ্যাল। কিন্তু বস্তির মেয়ের মুখে উত্তেজনার বদলে উদ্দীপনা শুনলেই লোকে বলে এরকম বস্তির মেয়ে কেউ কখনও দেখেনি—

যারা বলবে তাদের দোষ দেব কি করে?

কেন?

সত্যিই তোমার মতো মেয়ে বস্তিতে দেখেছে কেউ?

না দেখেনি—

তবে?

দেখেনি, চোখ নেই বলে—দেখেনি, কারণ আগে থেকে ধরে নিয়েই এসেছে যে বস্তির মেয়ে বস্তির মেয়েই হয়—

কারুর চোখ নেই?

চোখ থাকলে সে দেখত আমার মতো মেয়ে আইসোলাবেলাতেও নেই—এ আমার দম্ভ নয়। সত্যিই নেই। তার কারণ কোনও একজনই হুবহু আরেকজনের মতো দেখতে হয় না। বস্তিতেও না—

ঘড়িতে চোখ পড়ে চৌধুরীর। এগারটা রাত।

চলি—

চলি বলতে নেই। বলো,—আসি।

অনেক, অনেক, অনেক, অনেক, অনেকদিন বাদে সাড়ে এগারটায় টেলিফোনের বুক অপ্রত্যাশিত বেজে উঠতেই ম্যুয়ালিপুরের দুঃসহ জ্যৈষ্ঠরাত্রে বহুযুগের ওপার থেকে আষাঢ় এল মালিক সাহেবের মনে। চম্পাবতী সেই দূরভাষ কলহের পর চুপ করে ছিল এতদিন। মালিক সাহেও একটু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন বলতে কি! রোজ সেই এক কথা। বুড়ির সঙ্গে জোর করে যৌবনপনায় ক্লান্তি এসেছিল। নতুন বন্দরে জীর্ণ নৌকা ভিড়িয়েছিলেন মালিক সাহেব। চম্পাবতীর তুলনায় কম দিনের বন্দর। ব্যানার্জির দ্রাক্ষাকুঞ্জে তখনও অবশিষ্ট ছিল উচ্ছল দিন। আজ চম্পাবতীর ডাক আবার

আসতে মালিক সাহেব, রং-এই ছিলেন, রঙিনতর হলেন। এ্যাডেড ভিগার এল সুরার সঙ্গে ভুলে যাওয়া সাকির সোনার পাথরবাটি করে। দুটো কারণে তাঁর খুশি উড়ল টেলিফোনের নলে। এক,—চম্পাকেই নিজে থেকে বাজাতে হয়েছে ফোন। দুই, অনেকদিন বাদে পুরোনো ডায়ারির পাতা ওলটাতে মালিক সাহেবের মন নেচে উঠেছিল।

চম্পাবতী তার স্বাদ নিল না একবারও। ব্লাণ্টলি বলল: কি হলো তোমার সুতনুকা সেনের? না। তোমার তো সুতনুকা নয়। তোমার তো ঝুমা! বস্তির সিণ্ডারেলা—

কি হয়েছে তার? ছেলে না মেয়ে—

মুখ খারাপ করতে বাধ্য হব এবার—

বলো, কি বলছিলে—

সাত নম্বর সেল কি হলো?

রিলিজ হলো এবং ফ্লপ করল!

তাহলে?

তাহলে কি?

কি বলেছিলে তুমি, সুতনুকা সেনের দারুণ সেক্স আছে—

এখনও তাই বলছি—

ছবি লাগল না কেন তার?

ওয়েলারের পিঠে গাড়োয়ান বসলে লাগবে কেন ছবি?

আমাদের কি সেক্স ছিল না? আমাদের নিয়ে হিরোইন করে তোলা ছবি ফ্লপ করেছে কখনও?

করেনি বলেই বাংলা ছবি এগিয়ে গেছে, সুতনুকা সেনদের আসা সম্ভব হয়েছে, তোমাদের কাছে বাংলা ছবির ঋণ কখনও শোধ হবার নয়—

ঘামাচির গায়ে এ. কে. লোশন পড়ে মুহূর্তে! ঝাঁঝ কমে চম্পাবতীর। নরম হয় রুক্ষ স্বর চম্পার। অল্প হাওয়া আসে কোথা

থেকে হঠাৎ। একখানা মেঘ ধার দেয় চেরাপুঞ্জি গোবিসাহারার শুকনো বুককে। একটু উপশম হয় ঈর্ষার জ্বালা।

যাই বলো, সুতনুকা সেনের কাজ পাওয়া শক্ত হবে—

মনে হয় না।

কেন?

দেবতা সই করেছে, তুলসীদাস ছবিতে তুলসীদাসের স্ত্রীর রোলের জন্যে। আর—

আর?

পাকা খবর নয়, তবে শুনেছি যে নাচিয়ের ওপর ছবি তুলছে বুড়ো বর্ধন একটা, তাতে নায়কের ডিভাইন ইনস্পিরেশন হবে সুতনুকা—

ডিভাইন নয়। ওটা হবে বোভাইন—

ফোন কেটে দেয় একটি কথাও না বলে আর চম্পাবতী। স্রোতে ভেসে যেতে যেতে হঠাৎ হাতে-পাওয়া খড়-কুটো উপড়ে গেলে যেমন সুনিশ্চিত অসহায় আশ্রয় করে দেহমনকে তার চেয়েও অবসন্ন কানে মালিকের মুখ থেকে আর একটা কথাও প্রবেশ করার পথ ছিল না, তাই। সুতনুকা সেন অভিনীত প্রথম ছবি ফ্লপ করার পরেও সুতনুকা সেন যদি আবার কাজ পায় তাহলে তাকে আটকানোর মতো কোলাপসিবল গেট এখনও তৈরি হয়নি যে তা চম্পাবতী জানে। সাত নম্বর সেলে সুতনুকাকে দেখে এসেছে সে। দেখে এসে তার যা মনে হয়েছে তা তার মুখে কেউ পড়তে পারেনি তাই রক্ষে। নাহলে সে জানত, চম্পাবতী এখনও মনে মনে কেবলি লেহন করছে তার আস্বাদ। পেশা আর মেয়েগত ঈর্ষাবিস্মৃত কটি মুহূর্তে সুতনুকার অভিনয়ে ছিল অমৃতের আস্বাদ। পার্টিকুলারলি একটা জায়গায় সুতনুকার বলবার কথা ছিল: আমার খাওয়া হয়ে গেছে। খাওয়া জোটেনি ছবিতে সুতনুকার। সেটাকে আড়াল করা চারটে কথায় এমন ভাবে যাতে যে শুনেছে তার না মনে করে উপায় হয়নি যে ফাঁসির খাওয়া খেয়েই তবেই এমন তৃপ্তির ঢেঁকুর

[illegible] [illegible] পায়ে ঠিক যখন নাড়িভুঁড়ি হজম করে ফেলবার মতো রাক্ষস খিদে চুলের মুঠি ধরে উঠিয়ে নিয়েছে বেকার শ্রীরামচন্দ্রের সীতাকে তার গণগণে রাঙা রথে।

চম্পাবতীর মনে হয়েছে এ সুতনুকার অভিনয় নয়, জীবন। যদিও চম্পা জানে যে তা জীবন নয়, সুতনুকার অভিনয়।

সাত নম্বর সেলের ফার্স্ট নাইটে টিকিট কেটে ছবি দেখতে গিয়েছিল সুতনুকা। রাত নটায়। ছবি একঘণ্টা দৌড়বার আগেই বুঝতে বাকি ছিল না কারুর, এ ছবির দৌড় বেশি দিনের নয়। সুতনুকা বিন্দুমাত্র হতাশ হয়নি। তার গেইট, ডিলিভারি, তাকানো, কথা না বলা, বসে থাকা, হাসা, কাঁদা, ভালোবাসা, আনন্দ, বেদনা, লঘু এবং গভীর গম্ভীর মুহূর্ত তার কাছে আবার সত্য অবারিত করল যে সত্য সে জানত যখন সে লোকের দরজায় দরজায় ঘুরেছে একটা রোলের জন্যে। আজ কোনও ব্যতিক্রম হলো না সেই বিশ্বাসের। এ রকম অভিনয় ছবির পর্দায় কখনও কোথাও কারুকে করতে দেখেছে বলে মনে পড়ল না। একটা সামান্যর চেয়েও সামান্য ত্রুটি তার চোখে পড়ল না। ইথেল সোয়ানসনের চোখে নিশ্চয়ই পড়ত। ইথেল সোয়ানসন তিনটের শোতে ছবি দেখে গেছে। তার মতামত জানবার প্রয়োজন বোধ করেনি সুতনুকা। ইথেলের তাকে যেটুকু দেবার ছিল তা শেষ হয়ে গেছে সাত নম্বর সেল শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই।

ছবি দেখতে দেখতে সুতনুকা আরেকবার তার চিরকালের প্রটেস্ট জানাল তার ভাগ্যের কাছেঃ অভিনেত্রী করলে তো ম্যারিকান করলে না কেন? কত অল্প অভিনয় করে কত বেশি নাম পায় ওরা। ক্যামেরার ক্রেডিট যা তা চলে যায় হলিউডে আর্টিস্টের ক্রেডিটে। কোনও ম্যারিকান ক্রিটিক যদি টলিউডের কথা জানত আর জানতে পেত এই অভিনয়ের কথা তাহলে সুতনুকার পায়ে লুটিয়ে দিত র‍্যাভাইটিং রিভ্যু।

কে দেখবে এই অভিনয়ের মার্ক ওয়ার্ড এদেশে? বালীগঞ্জ হাইস্কুলের ক্লাস এইটের মেয়ে আর ফার্স্ট ইয়ারের যুদ্ধক্ষত, অর্বাচীনের দল। বুড়ো কতগুলো অথর্ব সাংবাদিক। টলিউডে যারা ছবি তোলে তাদের চেয়ে অপদার্থ দেশে এক ওই ফিলম ক্রিটিক তাদের জন্যে এই অভিনয় করা, লিলিপুটের পৃথিবীতে গালিভারের পা দেবার চেয়েও অনেক হাস্যকর অভিজ্ঞতা।

অরসিকের কাছে রস নিবেদনের দুর্ভাগ্য কেন কপালে লিখলে, এই বররুচি-প্রশ্ন, সুতনুকার ভাগ্য-জিজ্ঞাসা।

প্রথম দিনের তৃতীয় অধিবেশন ভাঙবার পর সুতনুকা বেরিয়ে এল দর্শকদের সঙ্গেই। সেই মাথার ওপর ঘোঁটা, গায়ে হাওয়াইয়ান ব্লাউস পরা, পাওডার মাখা ছোঁড়াদের ম্যাডিং ক্রাউডের মধ্যে থেকে ছিটকে এল ছেঁড়া মন্তব্য: শালা ছবি যাই হোক, একটা মাল বটে সুতনুকা সেন—

সঙ্গে সঙ্গে নেক্সট অ্যাননিমস ডায়ালগ: মাইরি মাইরি করছে যেন এখনও—

প্রশ্নের ঢিল ছুঁড়ে দিল ওরই মধ্যে কে একজন: কোত্থেকে পেল এমন আনকোরা মাল রে? প্রথম জন জ্ঞান দিল দেরি না করে: বস্তি থেকে এসেছে মেয়েটা—

পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা বল?

বস্তির মেয়ে না হলে ফর্দাফাঁই করবে কে?

যা বলেছিস সুনলা, তোর কি বুদ্ধি।

সুতনুকা সেন দাঁড়িয়ে গেল। ভিড় চলে যাক। বেরিয়ে যাক দূষিত বাতাস। দু একজন বোধ হয় চিনবার চেষ্টাও করছে তাকে। আর এগুনো ঠিক নয়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুতনুকা তার সম্পর্কে প্রথম পাবলিক রিঅ্যাকশনের মেসারমেণ্ট নিচ্ছিল। মাল কথাটা শুনে তার মনে হলো অভিনয়টা তার পেশা বলে এই নোংরা কথাটা এমনই অনায়াসে

উচ্চারিত হতে পারল সেক্সস্টার্ভড ওষ্ঠে। ডাক্তার, কি উকিল কিংবা লেখক, গাইয়ে, অথবা আর্টিস্ট হলে এতদূর উক্তি এত ক্যাসুআলি বলতে বাধত যে কোনও দুর্মুখেও। অভিনেত্রীকে লোকে আজও গণিকার চেয়ে একতিল বেশি ভাবে না একজনও। অভিনেত্রীরা নিজেরাও নিজেদের অন্য কিছু মনে করার কোনও কারণ টলিউডে পা দেবার পর আজ পর্যন্ত সুতনুকা সেন খুঁজে পায়নি। যে লেখক, যে গাইয়ে, যে আঁকিয়ে পেটের দায়ে নিজের কলম, গলা, তুলি বিক্রি করে তাকেও লোকে যে সম্মান দেয়, উকিলকে যে সমীহ করে, সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করে দেবার অসৎ নৈপুণ্যের মহিমায় যারা মুগ্ধ, ডাক্তারকে যে ভয় লোকে করে, রোগ সারাতে না পারলে মনে করে ভাগ্যের মার, সারাতে পারলে মনে করে ভগবান, তারাই নটীকে মনে করে দেহপসারিণী। আশ্চর্য!

কল্পনাকে রক্তমাংস মেদমজ্জা দিতে, পুতুলকে প্রাণ দিতে, মড়াকে দিতে পুনর্জীবন, নির্বাককে কণ্ঠস্বর, হাসা, কাঁদা, ভালোবাসা, হাঁটা ফেরা চলায়, বলা না বলায়, পাদপ্রদীপের আলোয় যে এনে হাজির করে অন্তরের অন্তঃপুর, নিঃসঙ্গতম নিভৃতকে অনাবৃত অবারিত ন্যাংটো করে ছেড়ে দেয় সহস্র চক্ষুর লেন্সে, লৌকিককে অলৌকিকের জারক রসে জারিত করে যে, সে কেন কম হবে একজন লেখক, একজন গাইয়ে, একজন আঁকিয়ের থেকে? খোদার ওপর খোদকারি করার ক্ষমতায় কোন রবীন্দ্রনাথের চেয়ে, কোনো গ্যেটে, দস্তয়েভস্কি, রোবসন, পিকাসোর চেয়ে চ্যাপলিন, ইসাডোরা, লাটান, মনরো একচুল কম?

তবুও। তবুও ইসাডোরা, তবুও মনরো, তবু সুতনুকা সেন একটু বেশি পয়সা দিলেই পাওয়া যায় এমন সেক্সাইটিং কমোডিটি ছাড়া আর কি? কেন? কেন? কেন? কেন এই নির্মম নিয়তি অভিনেত্রীর? কেন স আগুনের পরশমণি নয়? কেন তার দেহ সেই দেবালয়ের প্রদীপ হবে না, যার স্পর্শে অন্ধকারের অলিন্দে এসে দাঁড়ায় অনন্তকালের ইশারা!

বাড়ি যাবে না ?—সুতনুকার ভাবনায় উর্ণনাভ ছিন্ন হয়।

পঞ্চু এসে দাঁড়িয়েছে সুতনুকার পাশে অনেক দিন বাদে।

ভিড় একটু কমলে বেরুব ভাবছিলাম—

এই অধম ছাড়া আর একটি মশাও হাউসে নেই এখন। কিসে যাবে ?

ট্যাক্সিতে—

ট্যাক্সির দরকার হবে না—

কেন ?

এসো না আমার সঙ্গে—

চলো—

ছোট্ট হিলম্যান। পাশাপাশি বসল গাঙ্গুলীদের বেচে দেওয়া পাঁচ নম্বর বস্তির মেয়ে ঝুমা আর ভদ্রলোকের মিস্ত্রি-ছেলে পঞ্চু। মাটির নাগালের সীমাহীন ঊর্ধ্বে আকাশ ভরে গান গেয়ে উঠল পুরোনো চাঁদ। দীর্ঘ সময় তার মুখ ঢাকা ছিল মেঘে।

গাড়ি কিনলে কবে ?

মাস ছয়েক। তুমি বেহালার বাড়িতে উঠে যাবার পর যে কারখানাটা চালু করলাম সেখানেই ভাঙ্গা দেশলায়ের এই বাক্সটা ফেলে দিয়ে গিয়েছিল একজন। যখন তাকে মেরামত করে যে গ দিতে গেলাম সে জিজ্ঞেস করল, এ কার গাড়ি আমি কাকে দিতে যাচ্ছি। —নিল না। দিয়ে দিল গাড়িটা। বলল, কারখানা বড় করবার জন্যে টাকা লাগলে টাকা দেবে। টাকা নিইনি। গাড়িটা নিয়েছি অবশ্য, তার জন্যে কিছু টাকাও দিয়েছি—

হঠাৎ ছবি দেখতে এলে যে ?

ছবি বলছ কেন জলছবি বল—

বেশ। তাহলে দেখতে এলে কেন পয়সা খরচ করে ?

এমন দুর্লভ দৃশ্য দেখতে পয়সা দেব না! পৃথিবীর কোনও চিড়িয়াখানাতেও এ দৃশ্য দেখতে পাব না কখনো—

কি দৃশ্য?

এই, ময়ূর কি ভাবে দাঁড়কাক বনবার চেষ্টা করছে!

বাড়ি এসে গেছে ঝুমার। গাড়ি থেকে নামবার আগে ঝুমা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল: দেশলাই আছে?

দেশলাই কি হবে?

সিগারেট ধরাব—

একটা সিগারেট সত্যি মুখে দেয় ঝুমা। দেশলাই কাছে আনে পঞ্চু ধরাবার জন্যে সিগারেটটা, ধরায় না। সিগারেটটা মুখ থেকে খুলে নেয়। ছুঁড়ে দেয় রাস্তায়।

হাও ডেয়ার য়ু!—ঝুমা তার গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে একটা চড় মারে পঞ্চুর গালে।

গাড়ির দরজা খুলে বাড়িতে ঢুকে কোন রকমে দোতলায় দৌড়ে উঠে নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়তেই বাধা মানল না আর। চোখের দুকূল ছাপিয়ে ঝুমার অযুত অশ্রুতে ভেসে গেল চোখ, মুখ, গলা বুক, সব। বালিশ, বিছানা ভিজে গেল মুহূর্তে। মনে হলো যত জোরে সে চড় মেরেছে পঞ্চুকে তার দ্বিগুণ দীপ্ত আঘাত ফিরে এসে লেগেছে তার সেইখানে যেখানে ঝুমার অনন্তকালের অপেক্ষা একজনের জন্যে কখনও শেষ হবার, আবার সার্থক হবারও নয়। যাকে পেলে এই অভিনয় অর্থহীন হয়, তাকে পেয়েও সে এজীবনে পাবে না, কারণ বস্তি থেকে তাকে পৌঁছতে হবে আইসোলা বেলায়। সেই পৌঁছবার পথে একমাত্র কাঁটা,—পঞ্চু। পায়ে পায়ে জড়াতে চাইছে, পঞ্চুর জন্যে অকারণ কান্না। পঞ্চুকে দলে পিষে উঠে যেতে হবে ওপরে, যেখানে পঞ্চুর নাগাল কোনও দিন পৌঁছয় না। যে সমাজ তা— মায়ের মৃত্যুর কারণ সেই সমাজের মাথায় তাকে উঠতেই হবে। ওঠার পথে এমন কোনও বাধাকে সে মাথা তুলতে দেবে না যে বাধা তাকে মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার একমাত্র প্রতিজ্ঞা থেকে পথভ্রষ্ট করে। টাকা আর খ্যাতি আর ক্ষমতা। মনি অ্যাণ্ড পাওয়ার অ্যাণ্ড ফেম। এই তিন আলোয় জীবনের মুখ দেখবে ঝুমা। না। ঝুমা নয়, সুতনুকা সেন। প্রেম তার কাছে আলো নয়। আলেয়া। কাউকে ভালোবাসে না সে। পঞ্চুকেও না। কাউকে ভালোবাসতে দেবে না সে। না। পঞ্চুকেও না।

সরলা জানলা থেকে ডাকল : ঝুমা, অজিতবাবু এসেছেন—

ধড়মড় করে উঠে পড়ল ঝুমা। বলল: পাঠিয়ে দাও এখানে। চোখের জল মুছল না। খুলে যাওয়া কালো চুলের দলকে বাঁধল না নতুন করে। পাওডার মুছে যাওয়া মুখে বুলোল না প্রসাধনের আবার প্রলেপ। যেমন ছিল তেমন করেই মুখ তুলল অজিত চৌধুরী যখন এসে বলল: শোনো, অসময়ে এলাম বাধ্য হয়ে—। কথা শেষ করতে পারল না চৌধুরী। চমকে গেল সেই চোখের দিকে তাকিয়ে। সেখানে তখনও অভিমানের শিশিরে ভেজা দুটো চোখের পাতায় জল শুকোয়নি। টলমল করছে দুফোঁটা তখনও। ঠিক করতে পারছে না সেই দুটি ফোঁটা,—তারা পড়বে কি পড়বে না ঝুমার গালের রক্তিম জমিতে গড়িয়ে।

তুমি কাঁদছিলে?—ধরে এল অজিত চৌধুরীর গলা ওইটুকু বলতে।

এতদিনে মনে পড়ল বুঝি? সুতনুকা সেনের চোখের জল যে অজিত চৌধুরীর না আসার জন্যেই জমেছিল কালো মণির মেঘে, যেই সেকথা স্পষ্ট হলো সুতনুকার অভিমানাশ্রিত ওষ্ঠে, অজিত চৌধুরীর চোখের পাতাও চিক্‌চিক্ করে উঠল সেই।

এই শোনো, রাগ কোরো না, ইচ্ছে করেই আসিনি এতদিন—

জানি। রাগ করব কেন? অ্যাফটাওল আমি তো বস্তির মেয়ে, তোমার জন্যে যারা পথ চেয়ে বসে আছে তারা তো আমার মতো হাঘরে নয় কেউ—

এখনও অবিশ্বাস?

তোমাকে আমার মতো কেউ অবিশ্বাস করলেও তোমার কিছু এসে যায় না, বিশ্বাস করলেও,—না। ওকথাগুলো শুধু শুধু কেন বলো? সত্যিই তো, আমি তোমার কে?

তুমি আমার সব—

একথা আর কতজনকে বলবে?

আর একজনকেও বলবার দরকার হবে না—

আমাকেও আর বলবার দরকার হবে না—

কেন ?

কি হবে বলে সেকথা তাকে, যার কাছে তুমি আসতে সময় পাও না—

সময়ের অভাব নয়। আমার সাহসের অভাব—

নেকামি করছ ?

না। তোমার কাছে ঘন ঘন এলে তুমি বলবে, সবাই যে জন্যে তোমার কাছে আসে, আমারও মতলব তাই। তোমার কাছে না এলে, তুমি বলবে,—

বাকিটুকু শোনবার তর সয় না সুতনুকার। উচ্ছ্বসিত ঝর্নার হাসিতে সোচ্চার হয় সুতনুকা। বাচ্চা মেয়ে কাটাকুটি খেলায় দোর্ফাদে ফেলতে পারলে কাউকে যেমন খুশিতে ঝলমল করে ওঠে, প্রজাপাতর ডানায় দিনের প্রথম আলোর মতো, তেমনই মিষ্টি জব্দ করতে পারার সাকসেস শুকিয়ে দেয় দুচোখের ভিজে। অনেকক্ষণ কথা কাটাকাটির বৃষ্টি হবার পর রোদ জ্বলে ওঠে আবার মনের আকাশে। মেঘ কেটে গিয়ে বেরিয়ে পড়ে ওয়াড়-ফাটা বালিসের তুলোর মতো পেঁজা পেঁজা সূযালোক।

কথা দাও, অজিত চৌধুরীর হাত ধরে সুতনুকা সেন শবরীর গলা হয়ঃ কথা দাও, যত কাজ থাক, হপ্তায় একবার দেখা দেবে ?

দিলাম—

এখন বলো কি জন্যে এসেছ এত রাতে ?

বলছি। তুমি যখন মডেল ছিলে তখন তোমার কোনও খুব খারাপ ছবি তুলেছিল ওরা ?

খারাপ ছবি ? মানে ব্যাড ফোটোগ্রাফি বলছ ?

না, না। আই মিন, তোমার কোনও খালি গায়ের ছবি ?

ন্যুড পিকচার ? হ্যাঁ। অনেকগুলো ছবি, দে আর ওয়ান্ডারফুল স্টাডিস—খারাপ হবে কেন ?

সর্বনাশ করেছ।

কেন?

সেই ছবি এবার পুষ্পকরথ কাগজ ছাপছে, তার কোন্ লোককে তুমি নাকি একদিন অপমান করেছ?

ছাপছে তো কি হয়েছে? সো হোয়াট?

তুমি কি বলছ, ভেবে বলছ—

খুব ভালো করে ভেবে বলছি—

তোমার কত শত্রু আছে এলাইনে জানো?

সংখ্যা জানি না, তবে দিনে দিনে তারা সংখ্যায় বাড়বে, এটুকু জানি—

এই ছবি ছাপা হলে তোমার দুর্নামে টলিউড ছেয়ে যাবে—

নোটোরাইটি ইস দ্য ফোরানার অব ফেম! আর্টিস্ট কখনও বদনামকে ভয় করে না, শত্রুকেও না। আমি কখনও অজাতশত্রু হতে চাইনি। যার রাইভ্যাল নেই তার এর‍্যাইভ্যাল সম্পর্কেই কেউ অবহিত নয়, তার চেয়ে পিটিয়েবল আর কে? কিন্তু সেকথা থাক,—তার আগে বলো ম্যুড ছবি খারাপ হবে কেন? গায়ে জামা নেই বলে?

ওবভিয়াসলি তাই!

তাহলে পৃথিবীর সমস্ত ল্যাণ্ডস্কেপ, অ্যানিমাল স্টাডিসও নিশ্চয়ই খারাপ, কারণ তাদের গায়েও কাপড় নেই—

তাদের বেলায় যা চলে, মানুষের বেলায় তা অচল—

মোটেই নয়। বরং উল্টো। মানুষের বেলায় তা আরও বেশি চলে, কারণ পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ল্যাণ্ডস্কেপের চেয়েও মানুষের শরীর অনেক সুন্দর, কারণ তা জ্যান্ত—

তুমি ছাড়া তাহলে টলিউডে আর কেউ এমন ছবি। একজনও একখানাও তোলাতো নাকি—

না। তোলাঁতো না—

কেন?

কারণ তারা সবাই সেই মাঠের মতো যা দূর থেকেই সবুজ দেখায়। ম্যুড ছবি তাদের, কারুর হাতে পড়লে ছবির পর্দায় মশা মাছিতেও দেখতে যাবে না আর তাদের যে—

বেশ, মানলাম। কিন্তু তুমি কেবল ছবি তোলবার সময়ই জামাকাপড় পরবে না কেন? বাইরে বেরুবার সময় তাহলে ওদের মতো ফুললি মেড আপ হয়ে বেরোও যে?

বেরোই তার কারণ এই শরীর সুন্দর রাখতে দেবে না, যারা দেখবে তারা,—

ঠিক ওই কথাই আমি বলতে চেয়েছিলাম। ওই ছবি ছাপা হলে যা করবার জন্যে তুমি টলিউডে এসেছ, সে রোল কেউ করতে দেবে না তোমাকে। সবাই চাইবে তোমার শরীর দেখিয়েই বাজিমাৎ করতে। তা তুমি হতে দেবে কেন? তুমি আর্টিস্ট, শরীর তোমার মিডিয়াম মাত্র। মিডিয়াম কেন হবে মেসেজের চেয়ে, বডি কেন হবে সোলের চেয়ে বড়? যে নোটোরাইটি তোমার কাজের ক্ষতি করবে, সে হাল্লা তুমি চাইবে কেন?

পকেট থেকে একটা প্যাকেট বার করে সুতনুকার হাতে দেয় অজিত চৌধুরী: এই নাও, তোমার ওই ছবিগুলো আমি পুষ্পকরথ থেকে নিয়ে এসেছি। এগুলো যেন কারুর হাতে আর কখনও না পড়ে—

ছবি খাম থেকে বার করতে যায় সুতনুকা। অজিত চৌধুরী হাত চেপে ধরে। সুতনুকা হাসে: তুমি দেখেছ এছবি?

না।

কেন?

দেখব যদি তো আসলকেই দেখব, ছবি দেখতে যাব তার কোন দুঃখে—

বেশ, একদিন দেখো যেদিন তোমার চোখ ফুটবে, যে চোখে মেয়েছেলের শরীর শুধু উত্তেজনার খোরাক নয়, উদ্দীপনার আলো—

চৌধুরী চলে যাবার পর, অনেকক্ষণ পর, শুতে যাবার আগে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয় সুতনুকা সেন। পঞ্চুর জন্যে চোখের জল বৃথা যায় নি বলে। সেই চোখের জলই মজিয়েছে চৌধুরীকে আজ আরও একটু বেশি। টলিউডের ভীষ্মদেব,—প্রোডিউসার অজিত চৌধুরীকে। মনে হয় এবার বাড়িতে টেলিফোনের এবং দরজায় একটা গাড়ির, সহজ কিস্তিতে, ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ব্যবস্থা করে দেবে চৌধুরীই। নিজের তাগিদেই করবে। সুতনুকার গলা নাকি অজিত চৌধুরীর কাছে সোনার চেয়েও দামী। টেলিফোনটা হলে সে-গলা যখন তখন বাজাতে পারবে পি কে ডাবল নাইন ডাবল নাইন, টলিউডের সব চেয়ে চেনা নম্বর। একটা মোমেণ্টও খালি থাকে না। অনবরত শোনা যাবে আড়ি পাতলে ঃ চৌধুরী কথা বলছি। সে টেলিফোন তখন এনগেজড থাকবে একটা নাম্বারের সঙ্গেই কেবল। কেউ না পেয়ে পেয়ে যখন অপারেটারের কাছে ধরনা দেবে তখনই কেবল ছাড়াছাড়ি হবে দুটি নাম্বারের। দারুণ লজ্জা পেয়ে রেখে দেবে ফোন দুজনেই। কারণ দূরভাষগৃহিণী ফোনের মধ্যেই জিজ্ঞেস করবে ঃ হ্যাভ্যু ফিনিশড ?

পুষ্পকরথ কাগজে সাড়া পড়ে গেলো সেদিন দ্বিপ্রহরে হঠাৎ ঃ চম্পাবতী ফোন করছে, অপরূপদা, তোমার ফোন—

হ্যালো ?

আমি চম্পাবতী কথা বলছি—

বলুন—

আপনি অপরূপবাবু কথা বলছেন ?

হ্যাঁ।

সুতনুকা সেনের যে ছবিটা ছাপার কথা ছিল—

সেটা সম্পাদক মশাই ছাপতে রাজি হলেন না—

কেন ?

পুলিশে ধরবে—

পুষ্পকরথ কাগজের এডিটরের তাতে লজ্জা কি? এর আগেও তো একবার ধরেছিল না আপনাদের?

সেই থেকেই তো ভয়, ঘরপোড়া গরু কি না!

ঘরপোড়া কি না জানি না, তবে বাকিটা যা বলেছেন!—

টেলিফোন কেটে দেয় চম্পাবতী। সুতনুকার ছবিটা ছাপাবার জন্যে সেই অনুরোধ করেছিল অপরূপকে। রাজি করতে পুরো আধঘণ্টা বরদাস্ত করতে হয়েছিল অপরূপের অসহ্য নেকামি। মাছের চোখ ফসকে যাওয়ায় অসম্ভব রাগ হয় নিজের ওপরেই চম্পাবতীর। পুলিশে ধরবে? অশ্লীল হবে? যেন পুষ্পকরথের কোনও সংখ্যা এমন বেরোয় যাতে নোংরা ছবি না ছাপা হয় আর তা পুলিশের চোখে না পড়ে।

আসলে উচিত ছিল সম্পাদকটাকেই টেলিফোনের কান ধরে টেনে আনা। কিন্তু এখন সেকথা ভেবে শোক করবে না চম্পা। ধনুক থেকে তীর, টুথপেস্টের টুাব থেকে টুথপেস্ট বেরিয়ে গেলে, নতুন তীর, নতুন টুথপেস্ট চাই। সেই নতুন অব্যর্থ তীর কে হতে পারে, সুতনুকা সেন নামে লক্ষ্য ভেদ না করে ফিরে আসবে না যে অমোঘ শব্দভেদী!

কে হতে পারে সে? বিদ্যুৎ চমকের মতো নামটা মনে পড়তেই চম্পাবতীর চোখে সেই হিংস্র আলো খেলে গেল যে আলো বাঘিনীকে পাবার জন্যে পাতা ফাঁদের অব্যর্থতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত প্রত্যয়ে শিকারীর চোখে জ্বলে।

অজিত চৌধুরীর সুতনুকার বাড়ি না আসার কারণ. তার বন্ধু ও ব্যবসার পার্টনার, সুবিনয় ঘোষাল। সুবিনয় ঘোষাল সাধারণের স্ল্যাঙে, 'একটি' মাল। ছ ফিট দু ইঞ্চি; বিরল টাকওয়ালী। বুকের ছাতি মহেন্দ্র দত্তর আমব্রেলা খুলে ফেললে যত বড় হয়, তার অর্ধেক। হাতের কব্জিতে ওয়াল ক্লক রিস্ট ওয়াচের চেয়ে জমে বেটার। সারা

বুকে ভালুকের গায়ের মতো ঘন কালো লোমে পুরুষত্বের পতাকা উড়ছে বোতাম খোলা সার্টের উইংগুোয়। পায়ের মাপ রেডিমেড জুতোর আয়ত্তে নেই। জোড়া ভুরুর তলায় চোখ-ঢাকা সূর্যকাচ। গোঁফ কোলম্যানের কায়দায় ছাঁটা। চওড়া কপাল। তেলবিহীন চুল পাতলা, লালচে, পতনোন্মুখ। হাতের থাবায় বাঁদরের স্ট্রেন্‌থ্‌। যা কিছু বেস্ট তাই হচ্ছে স্থবিনয় ঘোষালের পক্ষে জাস্ট ইনাফ।

স্থবিনয় ঘোষাল বন্ধুত্ব ও শত্রুতায় সমান সোচ্চার। প্রাণ দিতে ও প্রাণ নিতে তার ডিসিসন নেওয়ার টাইম জাহাজ থেকে ম্যারিক্যান প্লেনের শূন্য নিতে যতটুকু সময় তার চেয়েও, তার চেয়েও অনেক, অনেক কম।

এই স্থবিনয়, তার সব চেয়ে বড় বন্ধু অজিত চৌধুরীকে বলেছিল, স্থতনুকা সেনের ওখানে না যেতে। কেন? ন্যাচারালি জিজ্ঞেস করেছিল অজিত চৌধুরী। আরও ন্যাচারালি উত্তর করেছিল স্থবিনয় ঘোষাল: মেয়েছেলের কাছে যেজন্যে যাওয়া সেজন্যে যাও, নো হাম। কিন্তু ওই প্রেম ফ্রেম, শরীর বাদ দিয়ে রোমান্স, ওসব হাওয়ায় মেতো না ফ কে ভন্স সেক--

তুমি বলতে চাও, শরীর ছাড়া মেয়েদের কাছে আর কিছুর জন্যে যাওয়া যায় না?

যায়। ক্ষমতা ফুরিয়ে গেলে যায়। দাঁত পড়ে গেলে যেমন যায় নিরামিষাশী হওয়া—

যদি তাই হয়, তাহলেই বা ঝুমার কাছে গেলে ক্ষতি?

দারুণ ক্ষতি।

কি রকম?

শরীরের জন্যে একবার দুবার যেতে, তারপর ভুলে যেতে। আর এ ভুলবেও না, নিজেকেও ভোলাবে। ব্যবসাপত্তর সব যাবে। মুখ পুড়বে, পেট ভরবে না—

তুলসীদাস ছবির রিহার্সালের ডাক উপেক্ষা করল সুতনুকা সেন। বলল, ডায়লগ পাঠিয়ে দিতে। যে সহকারী সুদর্শন দত্তের কাছে সে বার্তা নিয়ে গেল সে ভেবেছিল এবং সুদর্শন দত্তের সমস্ত ফোড়ের দল ভেবেছিল, সুতনুকা সেন এবার সীমা অতিক্রম করল দেবতার পক্ষেও হজম করা শক্ত আস্পর্ধার। সুতনুকার কাছ থেকে রিহার্সাল অ্যাটেণ্ডেন্সের প্রস্তাব নাকচ হয়ে যখন নতুন প্রস্তাব এল ভগ্নদূত মারফত, ডায়লগ পাঠাবার, তখন দেবতা ভূতপ্রেতপেত্নী পরিবৃত হয়ে, কি অসুবিধের মধ্যে জীবনে এত বড় হয়েছেন সেই অটোবায়োগ্রাফি ব্যাখ্যা করছিলেন। ভগ্নদূত তারই মধ্যে রিফ্যুসালের খবর দিল রং চড়িয়ে। অন্যান্যরা অপেক্ষা করতে লাগল, বোমা কখন ফাটে তারই জন্যে। দেবতা খুব আস্তে, চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন : তাহলে ডায়ালগ পাঠিয়ে দাও। ডায়ালগ রেডি আছে ?

ফ্যুস হয়ে গেল হাজার পাওয়ারের বাতি দেবতার এক ফুঁয়ে।

সব চেয়ে পুরোনো সহকারী যে সেই শুধু দুঃসাহস করল : সবাই রিহার্সাল দেবে, উনি দেবেন না। কেন ?

অত্যন্ত সোজা কারণে। যে গরু বক্স অফিসে দুধ দেবে, সে গরুর 'ডায়লগ পাঠিয়ে দাও' বলবার স্পর্ধার চাট সহ্য করতেই হবে। টলিউডে এমন কোন্ প্রোডিউসার আছে যে আমার হাজার বায়নাক্কা সহ্য না করে ? কেন করে ? আমার ছবি পয়সা দেয় বলে। যেদিন দেবে না, সেদিন তারা যা বলবে সেই অনুযায়ী চলতে হবে আমাকে। এতো অত্যন্ত সহজ কথা। একথা মেনে নিতে আপত্তি কোথায় ?

সুতনুকা সেন কি বক্স অফিস ?

এখনও নয়। কিন্তু আর দুয়েক বছরের মধ্যে সব চেয়ে বড় বক্স অফিস সুতনুকা—

যখন হবে, তখন বলবে—

না। যারা হবার অপেক্ষায় থাকে বলবার জন্যে, তারা কোনও দিন বলতে পারে না। যে বলে, সে প্রথম দিনেই বলে, কারণ সে জানে তার হবে—

চম্পাবতী আর চুপ করে থাকতে পারল না। বলল: কি হবে সুতনুকার? বক্স-অফিস হবে, এই তো?

না। দেবতা থামিয়ে দেন চম্পাকে: সুতনুকার নবজন্ম হবে।

মানে?

এর মানে তোমার বোঝা শক্ত চম্পা—

কেন?

কারণ তুমি হওয়া বলতে সাকসেস বোঝো—

আপনি কি বোঝেন? ফেলিয়া?

না; তা বুঝি না। তবে এটুকু মনে হয়, যে, শুধু বক্স অফিস দিয়ে যার বিচার সে আর্টিস্ট নয়। আর্টিস্টের বক্স অফিস হতেও পারে, নাও হতে পারে; তাতে কিছু এসে যায় না। সুতনুকা আর্টিস্টের মধ্যেও আর্টিস্ট। তার বক্স অফিস হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু তারপর হবে তার নবজন্ম। বক্স অফিসেই আটকে থাকবে না সে। আর্টিস্টও হবে সে একদিন। তার চেয়ে বড় আর্টিস্ট জন্মায়নি এখনও পর্যন্ত—

চম্পাবতী কথা খুঁজে পায় না অনেকক্ষণ। যখন পায় তখন দেবতা উঠে দাঁড়িয়েছেন আসন ছেড়ে। উঠে দাঁড়াবার আগে বলেছেন স্টেশন ওয়াগন বার করতে। ঘরসুদ্ধু লোক বুড়বাক বনেছে। পয়লা অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সকলের হয়ে জিজ্ঞাসা করল: বেরুবেন এখন? রিহার্সাল হবে না?

হবে—

তাহলে?

রিহার্সাল হবে, সুতনুকার ওখানে—

পর্বত শেষ পর্যন্ত একবার মহম্মদের কাছে এল।

অবাক যে হলো না তার নামই সুতনুকা সেন। দলবল সমেত টলিউডের মুকুটহীন রাজা সুদর্শন দত্ত আর যে কারুর বাড়ি গেলে যে অত্যধিক বিস্ময়ের বিস্ফোরণ অবশ্যম্ভাবী হতো, তার বিন্দুমাত্র আভাস কোথাও চমকাল না। বরং সুতনুকাকে দেখে মনে হলো, তার বক্তব্য, দিনের আলোর চেয়েও স্পস্ট, সে বলতে চাইছে এই কথাই কেবল যে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিই কুয়োর কাছে আসে। কুয়ো কখনও এক পা-ও নড়ে না।

সুদর্শন দত্ত কিন্তু ভণিতা করলেন না এতটুকু। বালাই রাখলেন না গৌরচন্দ্রিকার। মেয়েমানুষের বাড়িতে গিয়ে কামার্ত বেটাছেলে যেমন ঘরে বসেই নিরাবরণ হবার জন্যে নিঃশব্দ প্রস্তাব করে, তেমনই প্রায় চোখ দিয়ে আদেশ করলেন: নাও। লেট আস প্রসিড। আ যু রেডি ফ এ রিহার্সাল সুতনুকা? এই নাও, তোমার ডায়ালগ। —একজন 'অ্যাস', সুদর্শন দত্তের, ফ্ল্যাগ করা পাতাটা এগিয়ে ধরে। সুতনুকা বুঝতে পারে, দলবল নিয়ে এসেছে দেবতা তাকে বেইজ্জত করবার জন্যে। রিহার্সালে যাবার গাড়ি ফিরিয়ে দেবার জবাব। দাঁতে দিল দাঁত সুতনুকা। তবে তাই হোক। সুদর্শন দত্ত দেখে যাক। তিলোত্তমার অহঙ্কার দেহ নিয়ে নয়। পৃথিবীর রমণীয়তম অভিনয়ের তিল কুড়িয়ে তৈরি হয়েছে এই পরমাশ্চর্য প্রতিভা। যে কোনও মুহূর্তে যে কোনও অভিব্যক্তি যার মুখে অনায়াসে আবির্ভূত, সেই আরেক সুতনুকাকে আজ দেবতার তৃতীয় দৃষ্টিতে দেখুক টলিউড। দিগ্বিজয়ী কবির বীণার তার যে অসীমের রঙে বাঁধা তার মতোই সুতনুকার দেহের দীপে যে অনির্বচনীয়ের আলো জ্বালা আছে বিধাতার নিজের হাতে, আজ মর্ত্যের নির্বোধ দৃষ্টিকে অহেতুক কৃপায় ধন্য করুক সে।

রূপের খাপ থেকে চোখের পলক পড়বার আগে বেরিয়ে এলো অপরূপ এক তলোয়ার।

তুলসীদাসের স্ত্রী একটু জল চাইবে ঝিয়ের কাছে,—এই একটি কথার একটি দৃশ্য। জল চাইবে এমন তৃষ্ণার্ত হয়ে, যাতে মনে হয় এখনই ছাতি ফেটে মরে যাবে মানুষটা, জল দিতে দেরি হলে একটু। পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিলেন সুদর্শন দত্ত। ডায়ালগ-লেখা কাগজটা হাতে নিয়ে সুতনুকা জল আনতে বলল তার চাকরকে। এক, দুই, তিন গেলাস জল সকলের চোখের ওপর খেল। তারপর সেই কথাটা বলল যা লেখা আছে কাগজে: আমাকে একটু জল দিবি? মনে হলো তেষ্টায় ফেটে যাওয়া জিব বার করে একটা মরুভূমি একখানা মেঘ ধার চাইছে নীলাকাশের কাছে।

চম্পাবতী বসে থাকতে পারল না সোফায়; তার মনে হলো, জল না পেলে মরে যাবে মেয়েটা। তারপর মনে পড়ল তিন চার গেলাস জল খেয়ে তবে সুতনুকা একটু জল চাওয়ার অভিনয় করেছে মাত্র। মনে পড়তেই দেবতার দিকে তাকাল চম্পা। দেবতার ঠোঁটের কোণে সেই হাসি। সে হাসি অর্জুনের তীরে মাছের চোখ বিঁধলে, হেসেছিলেন দ্রোণ। সুতনুকা যে অর্জুন নয়, একলব্য, একথা সুদর্শন দত্তের হাসির মনে নেই।

সবাই চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াতে চম্পা বলল আপনারা যান, আমি একা যাব। সুতনুকাকে জড়িয়ে ধরল চম্পা: আমাকে তুমি আজ দারুণ লজ্জা দিলে ঝুমা—

কেন?

তোমার বিরুদ্ধে প্রথম দিন থেকে আমার ভারি রাগ, জানো?

জানি।

তারপরেও এত সহজ হয়ে তুমি কথা বলছ আমার সঙ্গে?

না বলবার কি আছে? আপনার রাগ তো আমার অভিনয়ের প্রতি সব চেয়ে বড় কমপ্লিমেণ্ট—

কমপ্লিমেণ্ট ?

হ্যাঁ। অর্জুন দ্রোণের সব চেয়ে বড় শিষ্য নয়। দ্রোণের সব চেয়ে বড় শিষ্য একলব্য,—একথা মানেন ?

তুমি কি বলছ ঝুমা ?

হ্যাঁ। ওই কথাই বলছি—আমার অভিনয়ের সব চেয়ে বড় প্রেরণা চম্পাবতী। স্টুডিওর গেটে দাঁড়িয়ে থেকেছি কতদিন শুধু আপনাকে একবার বেরুতে কি আসতে দেখব বলে—এখনও, এই মুহূর্তে এই জল খাবার সিনটা যা করলাম তা আজ আপনি এখানে উপস্থিত না থাকলে, যা করেছি তার খানিকটাও করতে পারতাম না—

গ্লিসারিন ছাড়াই চম্পার চোখে পাতা এই প্রথম ভিজে গেল।

চম্পাবতী চলে যাওয়ার পর ক' সেকেণ্ড। সোফাতে লুটিয়ে পড়ল সুতনুকা। লিটারালি গড়িয়ে পড়ল মাটিতে হাসতে হাসতে। ধাড়ি থেকে কুচো পর্যন্ত, বুড়ি থেকে ছুঁড়ি পর্যন্ত টলিউডের সব কটা কি অদ্ভুত বোকা যদি বাইরের লোক তা জানত! যারা অভিনয় করে খায় তারা কি করে একজনের অভিনয়ে এত অভিভূত হয় কে জানে!

সুতনুকার এই হাসি শুধু চম্পা নয়, অজিত চৌধুরীও যদি দেখতে পেত প্রথম রাতে সুতনুকার বাড়ি থেকে বেরুবার পর, তাহলে সুবিনয় ঘোষালের সঙ্গে তর্ক করে বৃথা সময় নষ্ট করত না। সুতনুকা যে আলেয়া, আলো নয়, একথা অজিত চৌধুরীর বুঝতে তাহলে যতটুকু সময় নিত, তার চেয়েও কম টাইম নিত তা ভুলতে।

কারণ ধরা পড়ে যাওয়া হাসিকে মোমেণ্টেরও কম সময়ে চোখের জলে ছায়ারূপান্তর দিতে যার ভাবতে হয় না সেই খেলোয়াড়ের নামই তো সুতনুকা। আবার আলেয়াকে মনে হোত চৌধুরীর—আলো। মরীচিকাকে জীবনের একমাত্র মরূদ্যান। আবার বৃষ্টি থামত। রোদ উঠত। রোদে বৃষ্টিতে রামধনু খেলত. সেই দুচোখে, যে চোখের দিকে তাকিয়ে সুবিনয় ঘোষালকে সত্যি সত্যি আরেকবার মিথ্যে মনে

হতো চৌধুরীর। সুতনুকা জানে, পুরুষ মানুষের কাছে মোহিনীরা কখনও ধরা পড়ে না। যে পুরুষ ভালোবাসা খোঁজে তারই রক্ত-লোভাতুরা মোহিনী। যে পুরুষের আমন্ত্রণ রক্তে বাজে তাকে ঠকানো যায় না। কারণ সে কিসের জন্যে আসছে তা সে জানে। আর যে দেহবিনিময়ে ঊর্ধ্বে উঠতে চায়, মনবিনিময়ের হাজার মরণে নুপূরের মতো বাজতে চায়, মেয়েমানুষের চরণ ছাড়া তার কপালে আঃ যা জোটে তারই নাম প্রতারণা। এবং এ প্রতারণার হাতে মার খেয়ে মার হজম করতে হয়, কারণ একথা যদি না কাউকে বলা যায় যে মাহিনীকে মুঠোর মধ্যে পাইনি তাই সে বেঁচে গেছে, একথা কিছুতেই বলা যায় না তবুও যে যাকে মনে করেছিলাম প্রেরণা আসলে সে প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। একথা বলতে পুরুষ-মাত্রেরই সে পরিমাণ লাগে যে পর্যাপ্ত পরিমাণ লাগে পিতৃপরিচয়ে কোনও অজ্ঞাত-কুলশীলতার কুণ্ঠা থাকলে।

মন দেওয়া-নেওয়ার খেলায় সুতনুকা সেন কেবল নেবে, দেবে না, কখনই দেবে না, কারণ বস্তি থেকে আইসোলা বেলায় পৌঁছতে মনের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন পার্সের। যার আছে সে সুতনুকার বন্ধু। যার নেই, সে মোটর মিস্তিরি মাত্র, সুতনুকার সে কেউ নয়।

পার্ক ডাবল নাইন ডাবল নাইন ?

হ্যালো ?

হ্যালো ?

দুজনের গলাই দুজনের এত চেনা যে ওর চেয়ে বেশি দরকার হয় না আইডেন্টিফিকেশনের। সুতনুকা সেন আর অজিত চৌধুরী। অজিত চৌধুরী আর সুতনুকা সেন। শুটিং ছাড়া দিনে বাড়ি থেকে। শুটিংওলা দিনে স্টুডিও থেকে। অজিত চৌধুরী কলকাতার বাইরে থাকলে ট্রাংক কলে এক কথা অনবরত বেজে চলেছে সুতনুকার বাড়িতে ফোন এসে ওঠবার দিন থেকে।

এতক্ষণে মনে পড়ল? সুতনুকার অভিমান ভিজিয়ে দিল টেলিফোনের কান।

তুমি তো বলেছ, আমার মন নেই—

ঠিকই বলেছি, তোমার মন কি এক জায়গায় পড়ে আছে?

এখনও অবিশ্বাস?

তোমাকে বিশ্বাস করে যারা ঠকেছে তাদেরও তো ওই কথাই বলেছ? অন্তত একজনকে নতুন কিছু বল—

আচ্ছা, সু, এই ঝগড়া করেই আমাদের কাটবে?

তা কেন? ঝগড়ার পর আবার ভাব, আবার ঝগড়া—

সুতনুকার কথায় বৃষ্টি কেটে গিয়ে অজিত চৌধুরীর দিগন্ত নীল হয় আবার। একটু চুপ করে চৌধুরীই আবার বলে:

তোমার গাড়ি রাখবে কোথায়? দেখবে কে? চালাবে কে?

গাড়ি তো আগে, চাবুকের জন্য আটকাবে না—

গাড়ি তোমার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াবে সোমবার দুপুর দুটোয়। ঠিক আছে তো?

সব ঠিক আছে, যতক্ষণ তুমি ঠিক আছ—

দুপুর একটা থেকে তিনটে যদি অজিত চৌধুরী হয় তো, তিনটে পাঁচ থেকে পালারম্ভ হবে, ম্যাটিনি আইডল হতে চলেছে যে সুতনুকা সহযোগে, সেই নবারুণকুমার। মাঝখানের পাঁচ মিনিট ডায়ালগের মেক আপ পালটাতে সময় নেবে সুতনুকা। অজিত চৌধুরীর সঙ্গে যে সংলাপ, সে সংলাপ নবারুণের সঙ্গে অচল। চৌধুরীর বেলা পড়ে এসেছে। সামান্য কথার সুড়সুড়িতেই টেলিফোন এসেছে, গাড়ি আসছে। নবারুণ তিরিশে পা দিয়েছে, বিবাহিত, ছেলের বাপ, কিন্তু দিনে দিনে বক্স অফিস হয়ে উঠেছে। নবারুণ-সুতনুকা জোড় যদি একবার পয়সা দিতে শুরু করে তাহলে সুতনুকার সুবিধে বেশি। নবারুণ রাঙামুলো। সুতনুকার পাশে দাঁড়ানো অসম্ভব। প্রথমে

ওকে শিখণ্ডী করে তারপর ওকে ছেড়ে দিলে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না নবারুণকে।—তাই চায় সুতনুকা। নবারুণ নিজেই সব প্রযোজকের কাছে বলে বেড়াচ্ছে, সুতনুকাকে ওর অপজিটে নিতে। তাহলে নাকি নবারুণের মুড আসে পার্ফেক্ট। মুড? মনে মনে সুতনুকা বলে। আরশোলার আবার ওড়া!

মুখে বলে অন্য কথাঃ আমার সঙ্গে অভিনয় করতে শুধু আপনারই মুড আসে? আপনার সঙ্গে নামলে আমার বুঝি আসে না? সেই নবারুণ কুমার টেলিফোন তুলেই বলবেঃ আমি নবারুণ কুমার। আর একটু নিঃশব্দ থেকে দিঘল জলের অতল আহ্বান মাখা গলায় সুতনুকা জানাবেঃ আমি অস্তগামী সন্ধ্যা।

কি আশ্চর্য ভালো কথা বল তুমি—

সবায়ের সঙ্গে বলি না। তুমি বলাও যে—

এমন কণ্ঠস্বর তুমি কোথায় পেলে?

যে বলছে তার মতো ভেলভেট ভয়েস তবু যদি পেতাম!

তোমার সঙ্গে কথায় পারবে কে?

একজন পারে, কিন্তু বেলা তিনটে বেজে পাঁচ মিনিটের আগে তার আমাকে মনে পড়ে না যে--

মনে পড়ে। বাড়ি থেকে ফোন করার অসুবিধে আছে, বোঝ না?

তা বুঝি। কিন্তু যা বুঝি না কিছুতেই তা হচ্ছে, আমার জন্যে একটু অসুবিধে না হয় হলোই।

আজ সন্ধ্যায় ফ্রি—

রোজ সন্ধ্যায়ই তো ফ্রি। আমাকে বেঁধে রেখেছে কে?

একটু বেরুবে আমার সঙ্গে?

কোথায়?

যেদিকে দুচোখ যায়—

আমার চোখ ত বেশি দূর যায় না, তোমার দুচোখে গিয়েই ঠেকে যায়, তার কি?

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় লেকের সীমানা ছাড়িয়ে গাড়ির অন্ধকার নির্জনে যখন নবারুণের হাত খুঁজতে উদ্যত হয় সুতনুকার শরীর, ঠিক তখনই, হঠাৎ মনে পড়বে সুতনুকার ঃ ওই যাঃ! গয়নার সেফের চাবি ফেলে এসেছি টেবলের ওপর। চল চল, গাড়ি ঘোরাও এক্ষুনি।

নার্ভাস নবারুণের কেটে যাবে তাল। অফিসের জন্যে তাড়াহুড়ো করে বেরুতে অভ্যস্ত পেনসন পাওয়া বড় বাবুর মতো মনের অবস্থায় ফিরে যাবে রাস্তায় পা দেবার আগেই। মনে পড়বে, অফিস যাওয়া তো নেই আর।

সাতটা আটচল্লিশে হর্ন শোনা যাবে সিন্ধুস্থান ইনস্যুরেন্সের সিন্ধু-ঘোটক—জোয়ারদারের জাগুয়ারের। জোয়ারদার বসে থাকবে গাড়িতেই। শাড়ি ছেড়ে, চুড়িদার পায়জামা আর শালোয়ারেতে সেজে বেরুবে সুতনুকা। দুই কানে লাল পাথর জ্বলবে। শার্দুল চক্ষু। শালোয়ারের ওপর ফুরফুরে উড়ুনি। আকাশের নীলে সাদা মেঘের মতো। বুকে সাদা মুক্তোর মালা। চোখে সুর্মা। চুল মন্দিরের চূড়ার মতো। এক হাতে সোনার মোটা ব্যাংগল। আরেক হাতে রেডিয়াম সময় বাঁধা। পায়ে নাগরা। লজ্জার যার রক্তের মতো তারও রং লাল। চোখ দুটো রাতের আলোতেও সূর্যকাঁচে ঢাকা। ঠোঁটে দারুণ লাল ওষ্ঠমাজা। সাদা ঝকঝকে দাঁতে সকালের রোদ হেসে উঠছে বারবার কারণে অকারণে। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ—একদিক শিশুর মতো সাদা, আরেকদিক সন্দেহের মতো কালো।

গাড়ি গিয়ে উঠবে বাগান বাড়িতে; যার গায়ে লেখা ঃ পান্থশালা।

আধঘণ্টার মধ্যে সই হবে রেণ্টাল কণ্ট্রাক্ট। সিন্ধুস্থান ইনস্যুরেন্সের পার্ক স্ট্রীটের এয়ারকণ্ডিশনড ফ্ল্যাট যার ভাড়া হাজার টাকা, তাই দেওয়া হবে চারশো টাকায় সুতনুকা সেনকে। কেন?

ফর্মে লেখা হবে, রিফুজি বলে। খবরকাগজে একদিন পত্রাঘাত হবে অবশ্য যে, রেফ্যুজি কেউ পার্ক স্ট্রীটে এয়ারকণ্ডিশনড ফ্ল্যাটে থাকবে কেন? সে চিঠি বেরুবে না কাগজে আরও অতি অবশ্য। তার বদলে বেরুবে সিন্ধুস্থান ইনস্যুরেন্সের স্পেশাল অ্যাড: ইনস্যুয়া উইথ সিন্ধুস্থান। য়ুস্যুঅ্যাল রেটের দেড়া দামে অতিরিক্ত সাপ্লিমেণ্টের উদ্দেশ্য সফল হবে সুনিশ্চিত।

তারওপরে রঙ্গিন মুহূর্তে জোয়ারদারের হাত ধরতে আসবে সুতনুকার সারা গা। সবে গিয়ে সুতনুকা বলবে: আজ শরীর খারাপ—

তাহলে এলে কেন কষ্ট করে?

বাঁশী শুনলে যার শরীরের কথা মনে থাকে, সে কি তোমার সুতনুকা হতে পারে কখনও?

গদগদকণ্ঠ হবে জোয়ারদার তৎক্ষণাৎ। বললে, চলো, তোমায় এখনই বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। কিন্তু শনিবার শরীর খারাপ টারাপ কিছু শুনব না, মনে থাকে যেন—

মাথার ওপর টিন তেতে আগুন হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। পায়ের তলার মাটি পুড়িয়ে দেবে খালি পা পেলে মুহূর্তের মধ্যে। শনিবারের অপরাহ্ণ আসতে আরও ঘণ্টা দুয়েক। গ্যারাজে খান তিন চারেক গাড়ি এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে। একটা গাড়ির তলায় পুরোনো ওয়াটারপ্রুফ পেতে পঞ্চু শুয়ে পড়ে একটা ভাঙা যানকে নতুন জীবন দেবার কাজে ভুলে গেছে জগৎ সংসার। কোনও কাজ ইমপসিবল না হলে সে কাজে পঞ্চুর উৎসাহ অতীব অল্প। যেই কেউ বলছে এ গাড়ি বিয়ণ্ড রিপেয়ার সেই পঞ্চুর শিরায় শিরায় উত্তেজনার বাণ ডাকে। পঞ্চুর হাতে অচল গাড়ি যদি পাখা না মেলল তাহলে সে বস্তু আর যাই হোক গাড়ি নয়। ছেলেবেলা থেকে স্বপ্ন এই এক। সবাই ঠাট্টা করত, হেনরি ফোর্ড। পঞ্চু আজও জানে, হেনরি ফোর্ডের দেশে জন্মালে তার কাছেই লোকে আসত একজোড়া পাখার জন্যে। যেকোনও পাখার আওয়াজ শুনে সে বলে দিতে পারে গাড়ির শরীরের কোন্ কবজা আলগা হয়েছে, কোন ভেইনে রক্ত যেতে আর্টারি কাজ করছে না। সে গাড়ি ভাবে, গাড়ি বলে, স্বপ্নও দেখে—গাড়ি।

লোকে আসে পঞ্চুর গ্যারাজে একটা দেশলাইয়ের খোল নিয়ে। ফিরে যায় পক্ষীরাজে। যাবার আগে বলে যায়, পঞ্চুবাবু আপনার বিলটা একটু—। কথা শেষ করতে দেয় না কখনও পঞ্চু। বলে: হ্যাঁ, আপনার বিলটা একটু কম হয়েছে খাটনির তুলনায়। তার কারণ, সবাই বলেছিল, এ গাড়ি আবার চালু করা যাবে না। দেখলাম যায়। তাতেই বিল কম হবার দুঃখ আমার পুষিয়ে গেছে। যান, এখন

আর এক বছরের মধ্যে বড় কোনও খরচার ধাক্কায় পড়বেন না। অ্যাকসিডেণ্ট করে যে এসেছিল অন্য কথা বলতে, সে অন্য কথা শুনে চলে যায়। অ্যাকসিডেণ্টটা যে বিলেই ঘটে গেছে, একথা বলতে ভরসা পায় না আর।

কিন্তু বিল একবার হয়ে গেলে তা থেকে একটা এক পয়সার ফিগারও পালটাবে যে, সে পঞ্চু মিস্ত্রি নয়। মাড়োয়ারী মিলিওনেয়ারের চেক তারই মুখের ওপর ছিঁড়ে ফেলে দেবে পঞ্চু। বলবে: আরেকটা চেক লিখে দিন রাধাকিষেণজী। ওটা তিনশো সাতান্ন টাকার বিল নয়। তিনশো সাতান্ন টাকা, তের আনা তিন পয়সা ডিউ আমার।

তের আনা তিন পয়সা না পেলে আপনার কুছ লোকসান হয়?

আমার হয় না, আপনার হয়—

রাম, রাম, আমি জাত বেবসাদার, আমাক ভি তাজ্জব লাগছে আপনার কথা। বিল কমে গেলে হামার লোকসান কেন?

কারণ, আমি বজ্জাত ব্যবসাদার। আপনি তের আনা তিন পয়সা না দিলে এই বারো হাজার টাকার গাড়িটা আমার গ্যারাজেই থেকে যাবে কি না?

আরও দুবার রাম নাম নিয়ে, রাধাকিষেণজী, কাটা-কাপড়ের কারবারে ক'বছরের মধ্যে কোটিপতি বনতে চলেছে যে, চেকের বদলে নগদ টাকা গুণে গুণে দিয়ে যায় পঞ্চুর টেবিলে।

চেক কিংবা নগদ ছাড়াও গাড়ি ছেড়ে দেয় না যে পঞ্চু তা নয়। যাদের দেয় তারা ঠিক টাইমেই যে বিল মিটিয়ে দেয় তা নয়। কিন্তু ইচ্ছে করেই করে তা কখনও কখনও ভীষণ পাজি পঞ্চু। তাদের মুখোশ খুলে দেবার জন্যেই এরকম করে। চন্দ্রপ্রসাদ, পঞ্চুর বিল কালেক্টর, পথে, ঘাটে, বাড়িতে জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে অধমর্ণের। তারপর যায় পঞ্চুর টেলিফোন: সুবিকাশ আছে? ওদিক থেকে সুবিকাশ রায়ের নির্দেশেই দূরভাষযন্ত্রে বেজে ওঠে ভীত জিজ্ঞাসা:

দেখছি, আছে কি না? আপনি কে কথা বলছেন? পঞ্চুর সরু গলায় সাপের জিব সড়াৎ করে বেরিয়ে আসে: দেখবে কি আবার? দুখানা ঘরের ফ্ল্যাটে আবার দেখতে হবে কেন? বর্ধমানের প্যালেস তো নয়। জিজ্ঞেস কর, ফোন ধরবে, না, যাব?

পঞ্চুদা?—শুধু গলায় যতখানি লুটিয়ে দেওয়া যায় নিজেকে তা দিয়ে জানান দেয় সুবিকাশ, সে আছে।

টাকা দিতে পারছ না যখন, তখন সবাইকে বলবে যে স্ট্যাণ্ডার্ডটা তোমার নয়, পঞ্চুদা দয়া করে চাপতে দিয়েছে। মনে থাকে যেন কথাটা—

মনে থাকে সেকথা সুবিকাশ রায়ের। বেলা সাড়ে সাতটায় পঞ্চু ফোন করেছিল সুবিকাশকে। বেলা সাড়ে দশটা না হতেই পঞ্চুর কলকাতার বিখ্যাত বিল কালেক্টরের হাসি আর ধরে না। বাবু!—সুবিকাশবাবু টাকা দিয়ে দিয়েছে।

তোকে টাকা দেবে না? নিজের বাড়ি ছেড়ে যমের বাড়ি না যাওয়া পর্যন্ত রেহাই আছে তার?

পঞ্চু মিস্ত্রি কাউকে বুঝতে দেয় না কোথায় কখন কোন কলকাঠি সে নাড়ছে। বিল বানায় যে সেই বিশ্বাসবাবু মনে করে তার জন্যেই কারখানা চলছে। কাজের এস্টিমেট দেয় বীরেন; তার ধারণা পঞ্চুর গ্যারাজ তার জন্যেই টিকে আছে। শালিমুদ্দীন একসময়ে পঞ্চুকে প্রথম হাতে খড়ি দেয় গাড়ির কাজে, সে এখন পঞ্চুর গ্যারাজের এক নম্বর মিস্ত্রি; তার বিশ্বাস, এ গ্যারাজ বিশ্বাসের অযোগ্য অল্প সময়ে এত বড় গ্যারাজ হতো না, যদি সে না ন্যাশনাল গ্যারাজ ছেড়ে এখানে আসত। যে কাউকে রাখে না, অথচ সকলকেই মনে করায় তার জন্যে চলছে তার হাঁড়ি,—সেই হচ্ছে পঞ্চু। আর বোঝে যে একজন, তার নাম দুলাল। পঞ্চু যার হিরো। সে এক কথায় জান দিতে পারে পঞ্চুর জন্যে। সত্যি সত্যি পারে, পঞ্চুকে যখন গাড়ির তলায় শুয়ে আজও কাজ করতে দেখে সে, এই আজকের

শনিবার ছুটোয় যখন ছুটি হয়ে গেছে কারখানার, চলে গেছে সবাই, এই এখনও পঞ্চুকে গাড়ির তলায় শুয়ে পড়ে বিশ্ব-সংসারের বার্তা বিস্মৃত হয়ে বাঁচিয়ে তোলে মড়া গাড়িকে, সেই তখনও পঞ্চুকে তার মিস্ত্রি মনে হয় না, মনে হয় আর্টিস্ট।

যদি দুলালের মতো কোনও রসিক চোখ দেখত পঞ্চুকে এই অবস্থায় তাহলে সেও পঞ্চুকে মিস্ত্রি মনে করত না। পঞ্চু একটা গাড়ি মেরামত করছে মাত্র, ভাবতে পারত না কিছুতেই। তার মনে হতো, না, মনে না হয়েই পারত না যে মাইকেল এঞ্জেলো চার্চের ডোমের ভেতরটা ফ্রেস্কো করছে চিৎ হয়ে শুয়ে। মুহূর্তের মধ্যে আর্টের চরমতম সত্য ধরা পড়ত তার চোখে, সমস্ত জন্ম শিল্পচর্চা করেও যা ধরা পড়ে না পণ্ডিত মূঢ়ের দৃষ্টিতে। সে সত্য হচ্ছে এই যে,—যে প্যাসনের খাপ থেকে প্রতিভার তরোয়াল প্রসূত হয় তা কেবল ছবি, গান, কবিতা, অভিনয়ের উৎস নয়। জীবনের যে কোনও কাজ সেই প্যাসনের স্পর্শে আর্টের পর্যায়ে উঠে যায়। মূল্যহীনকে যা সোনা করে দেয় তা ওই প্যাসন।

ঝুমাকে না পাওয়ার বেদনাও পঞ্চুর প্যাসন। পঞ্চু সেই প্যাসনের সবটুকু ঢেলে দিয়েছে মরা গাড়ির শরীরে প্রাণ দেবার মন্ত্রোচ্চারণে। গাড়ির বদলে বাড়ি তৈরির স্বপ্ন দেখলে সে তৈরি করত তাজমহল, বাড়ি তৈরি করার পরিবর্তে কথার পর কথা গাঁথার কাজে লাগলে সে-ই লিখতো, এ থিং অব বিউটি ইজ এ জয় ফর এভা। যে লেখে, যে গায়, যে আঁকে, সে কোনও লোক নয়, সে একটা প্যাসন, একটা ইডিওসিংক্রেসি, লাস্ট্ ফর লাইফ। গাড়ি মেরামতের তুচ্ছ কাজে লাগলেও সে যার জন্ম দেয় তা ওই, এ থিং অব বিউটি—এ জয় ফর এভা।

দুলাল জানে ঝুমাকে না পেয়েই এই দুর্বার নির্জীবকে জীবনদানের মন্ত্র খুঁজে পেয়েছে পঞ্চু। ঝুমাকে পেলেও সে গাড়িই মেরামত করত। এবং নিপুণভাবেই করত। কিন্তু তা এ থিং অব বিউটি হতো

না কখনই, তা কখনও হয় না। পাবার আনন্দ থেকে দক্ষতার আবির্ভাব ; আর না পাবার বেদনাই সৃষ্টির গর্ভ-যন্ত্রণা। এ যন্ত্রণা যার কেবল সেই জানে সে যন্ত্র না, বিধাতার মতো সেও যন্ত্রী। সৃষ্টির মূলে আনন্দ নেই, আছে বেদনা। অসীম বেদনার নামই ঈশ্বর।

এতক্ষণ ভুল বলেছি। দুলাল এত কথা নিশ্চয়ই জানে না। জানেও জানাতে পারে না নিশ্চয়ই। তবুও আমার কথা ভুল নয়। বুদ্ধি দিয়ে জানে না দুলাল। বিদ্যা দিয়েও নয়। জানে, কারণ পঙ্কুকে সে ভালোবাসে। ভালোবাসা বললেই যারা পুরুষ ও রমণী বোঝে তারা দুলালকে দেখেনি। একজন পুরুষ, আরেকজন পুরুষকে একজন মেয়ের চেয়ে কত বেশি ভালোবাসতে পারে, দুলাল তারই দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয়রহিত। পঙ্কু যখন কাজ করে তখন দুলালের কানে আসে বিশ্ববিহীন বিজনবাসের কান্না। ঝমার জন্যে পঙ্কুর সেই কান্নার চেয়ে পঙ্কর জন্যে দুলালের কাঁদা এক বিন্দু কম নয়।

আজও এই দ্বিপ্রহর পার শনিবারে, পঙ্কুকে দেখে দুলালের আরেকবার মনে হলো, সে কেন ঝমা নয়। ঝুমা হলে পঙ্কুর পায়ে সে নিজেকে লুটিয়ে দিত। পঙ্কুকে না পেলে ঝমা কি পাবে যাতে ক্ষতিপূরণ হয়। পঙ্কুকে না পাওয়া কোন মরীচিকাকে পাওয়া দিয়ে হবে শোধ। দুলাল যা বুঝতে পারে মেয়ে না হয়ে, মেয়ে হয়ে ঝুমা তা বুঝতে পারে না কেন, ভেবে উত্তর পায় না দুলাল।

কখনও কখনও তার মনে হয় কেবল ঝমাও বোধ হয় মেয়ে নয়। আরেক তৃষ্ণা, আরেক প্যাসনের নামই বোধ হয় ঝুমা। এবং পঙ্কুকে গ্রহণ করলে ঝুমার বোধ হয় সুতনুকা সেন হওয়া হয় না। কিন্তু, সুতনুকা সেন হওয়া পঙ্কুকে ফিরিয়ে দিয়ে কি পঙ্কুকে নিয়ে ঝমা হবার চেয়েও বড় ?

চিন্তার জাল ছিন্ন করে দেয় গাড়ির হর্ন।

গাড়ি থেকে যে নেমে এল সে ঠোঁটের ওপর পাপোশিকুলার আঙুলে জানাল দুলালকে তার নাম না ঘোষণা করতে। গাড়ির

তলা থেকে বেরিয়ে এল পঞ্চুর গলাঃ যে গাড়ি এল তার ড্রাইভারকে বল গাড়িটা দারুণ তেল খাচ্ছে। তুই দেখতো কি হয়েছে—। দুলাল চলে যায়, কাছে এসে দাঁড়ায় যে তাকে উদ্দেশ্য করে পঞ্চু বলেঃ গাড়ি নিজের নয় বলে কি একটুও দেখতে শুনতে নেই? জানতে নেই কি অসুখ করেছে গাড়ির? নিয়ে যেতে নেই একবারও ডাক্তারের কাছে? এতদিন যার পিঠে চেপে ঘুরল তোমার মালিক তার দানাপানি জুটছে কি না ঠিক মতো, এটা দেখাও কি কাজ নয় একটা? মানুষ তো পোষা কুকুর বেড়ালের জন্যেও ডাক্তার ডাকে, হাসপাতালে যায়, গাড়ি কি কুকুর-বেড়ালের চেয়ে কম কাজ দেয়, না, গাড়ির প্রাণ নেই?

তখনও যার উদ্দেশ্যে এই অমৃতবাণী উৎসর্গ, তার হ্যাঁ না কোনো উচ্চিবাচ্চি না পেয়ে রেগে যায় পঞ্চুঃ কি রে শালা? কথা বলিস না কেন? তখনও চুপ করে থাকে কাছে দাঁড়ানো আগন্তুক। গাড়ির তলা থেকে মাথাটা শুধু বার করে আনে পঞ্চু মধুরতর কিছু বলবে বলে। বলা হয় না হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে ওঠে মুখের কাছে। শুধু অস্ফুট কথা আধো উচ্চারিত হয়ঃ 'তুমি'?

হ্যাঁ। আমিই ড্রাইভার তেল বেশি-খাওয়া ওই গাড়িটার—

বেরিয়ে আসে পঞ্চু। চীৎকার পাড়েঃ দুলাল, এতক্ষণ বলতে পারোনি কে এসেছে? আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল পঞ্চু, আগন্তুক বাধা দেয়ঃ ওর দোষ নেই, ওকে কিছু বলো না। আমি আঙুল দেখিয়ে বারণ করেছিলাম আমার নাম বলতে।

ডিসেম্বরের নিশ্ছিদ্র নীলাকাশের এক টুকরো গায়ে জড়িয়ে এসেছে ঝুমা। পাতলা চুলের কুচি হাওয়ায় উড়ছে। পরিচিত সুবাস উঠে আসছে গা থেকে। রোদ্দুরকে মনে হচ্ছে পঞ্চুর আলোর সমুদ্দুর। মাথার ওপর রোদে রাঙা টিনকে মনে হচ্ছে চন্দ্রাতপ। পায়ের তলার মাটিকে শেওলায় ঠাণ্ডা দীঘির তল। নিজেকে মনে হচ্ছে সম্রাট।

একটু বসো। সভ্য হয়ে আসি—দুলালকে তাড়া দেয় পঞ্চুঃ তুমি এখানে এসো। ঝুমাকে সিগারেট এনে দাও। কি সিগারেট খাও তুমি?

টকটক করে ঝুমার মুখের লাল। বলেঃ আমার কাছে সিগারেট আছে—

চান করে, ধোপদুরস্ত হয়ে আসে পঞ্চু। ঝুমা একা বসে। দুলাল চলে গেছে। কেন? কারণ সে জানে টু্য ইস এ কাম্পানি, থ্রি ইস নান। আমার গাড়িটা একটু দেখে দিতে হবে।

কিন্তু সে কদিন কি গাড়ি চাপবে?

কেন, তোমারটা।

বেশ, কিন্তু চালাবে কে?

কেন, আমি।

না, তুমি চালাতে পারবে না।

কেন, অ্যাকসিডেণ্ট করব? করলেও তোমার ভয় নেই। গাড়ি ভাঙলে, গাড়ির দাম আমি দিয়ে দেব।

ঝুমার কথা চলতে চলতেই কালো হয় পঞ্চুর মুখ। কাছে আসে ঝুমা। গায়ের ওপর এসে পড়ে ঝুমার গায়ের উত্তাপ। বুকের কাছে পঙ্গুবুকের ওপার থেকে আবার আসে পঞ্চুর মনে। দক্ষিণ সমীরে দূর গগনে সুর লাগে বেদনার। নীলাঞ্জন ছায়া ছড়ায় দ্বিপ্রহরের দীপ্ত রৌদ্র হঠাৎ। অসীম কালের আকাশপ্রদীপে জ্বলে জীবনের অনির্বাণ শিখা আবার। সুতনুকা নয়, ঝুমা। খুব আস্তে প্রায় হুইস্পার করে সেঃ আচ্ছা তুমি এত অল্প রাগ কর কেন?

কার কারণ, আমার কাছে সব, সব কিছুর চেয়ে তোমার জীবনের দাম অনেক, অনেক বেশি—

তা যদি হতো, তাহলে সেদিন চলে যেতে না তুমি। কেন তুমি সেদিন উল্টে মারলে না? কেন, চলে গেলে সেদিন? বলো, কেন আমায় একা ছেড়ে দিলে—

সব মেয়েকেই কোনও এক সময়ে একা থাকতে দিতে হয়, কাঁদতে দিতে হয় তাকে—

আমি না এলে, তুমি আর যেতে না তো আমার কাছে ?

যেতাম না। অপেক্ষা করতাম। তোমার জন্যে আমার অপেক্ষা কখনো ফুরোবে না—

সুতনুকা সেন নয়। ঝুমা। পঙ্কুর বুকে মাথা রাখে। মিডসামার ডে-র উত্তপ্ত শেডের তলায় আমার শ্রাবণ-রাতের মতো কালো চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে পঙ্কুর ভালুকের মতো লোমশ বুকে। পঙ্কু জিজ্ঞেস করে প্রায় অনুচ্চারিত উচ্চারণে : তুমি কি চাও বলোতো ?

যা চাই তা করবার উপায় নেই।

কি চাও করতে তুমি ?

আত্মহত্যা !

তাইতো তুমি করছ—

একবারে করতে চাই, পারছি না। এই তিলে তিলে আত্মহত্যা নয়—

উপায় নেই কেন ?

নেই কারণ, অনেকদূর যেতে হবে আমাকে। তোমাকে ছাড়িয়ে অনেকদূর। জবাব দিতে হবে এই সোসাইটিকে, আমার মা-কে খুন করার জবাব—

একজন লোকের অপরাধে গোটা সমাজকে দায়ী করবে কেন ?

কারণ গোটা সমাজ সেই একজনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেনি, —শুধু এই জন্যে—

তাতে শান্তি পাবে তুমি ?

না—

তবে ?

কাউকে শান্তি পেতেও দেব না আমি। সকলকে পাগল করে দেবে সুতনুকা সেন, নিজে পাগল হবে না কারুর জন্যে—

কিন্তু ঝুমা? তার কথা ভেবেছ?

তার জন্যে ভাববার আজও আছে একজন, ঝুমার অপেক্ষা যার জন্যে কোনও দিন ফুরোবে না।

সুতনুকা সেন নয়। ঝুমা। তার মুখ তুলে ধরল পঙ্কুর মুখের কাছে। চলতে চলতে মাথার ওপর বিরাট শূন্যে দীপ্ত দ্বিপ্রহরের রথ থেমে গেল মুহূর্তের জন্যে। অন্তহীন মুহূর্তের মিছিল থেকে ছিটকে পড়া একটি মুহূর্ত জন্ম নিল সেই। একটি অনন্ত মুহূর্ত। অ্যান ইটার্ন্যাল মোমেন্ট।

পঙ্কুর ঠোঁট নেমে এল ঝুমার ঠোঁটের ওপর। অসীম আরেকবার [illegible] সীমাকে

ওলড থিয়েটার্স-এর দুনম্বর স্টুডিওতে তাকিয়ে দেখে সবাই। চোখে তাদের পলক পড়ে না। স্টুডিওর লোকেরা সাধারণত শুটিং-এর ধার ধারে না। ময়রার মতোই টলিউডের চিনিতে আসক্তি কম। যেকজন কাজ করে তারা কর্তব্য করে মাত্র। প্রুফ রিডার যেমন বইয়ের রিডার নয়, তেমনই স্টুডিওর কর্মীরা নয় শুটিং-এর দর্শক। সেই স্টুডিওর সেখানে যে আছে অন্য ফ্লোরের অন্যত্র আছে যত মাছি তারাও এসে জোটে সুতনুকা সেনের গন্ধে গন্ধে তুলসীদাস ছবির শুটিং-এ। সুতনুকা সেন মিস্ত্রি থেকে ডিরেক্টর পর্যন্ত যার সঙ্গেই কথা বলে, মনে হয়, তার সঙ্গেই সেই মানই কথা বলতে না পারলে মরে যাবে বুঝি সুতনুকা। সুতনুকার শুটিং যেদিন থাকে না সেদিন ওই দুনম্বরের তুলসীদাস ফ্লোর কানা মাছি ভোঁ ভোঁ। কেউ নেই কোথাও। যারা পেটের দায়ে রং মাখতে সং সাজতে এসেছে তারা. আর. যারা না খেয়ে স্টুডিওকে খাইয়ে-পরিয়ে রেখেছে সেই ইলেকট্রিসিয়ান, কুলি, অ্যাসিস্ট্যাণ্টেরাই কেবল ঘুর ঘুর করছে খাঁ-খাঁ-করা ফ্লোরে। ছুটি হবার পর ড্যালহাউসি স্কোয়ারের সঙ্গেই সে ফ্লোরের মিল।

সুদর্শন দত্তর কথাও মনে থাকে না কারুর। সুতনুকা সেন ছাড়া আর কোথাও কেউ আছে, সেকথাই মনে রাখতে চায় না, চাইলেও পারে না ওলড থিয়েটার্স-এর দুনম্বর স্টুডিওর তুলসীদাস ফ্লোর।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের ইতিহাস জুড়ে যেমন রিজিয়া, দুনম্বর স্টুডিওর তুলসীদাস-শুটিং-এর টলিউডের ক্ষণকালীন ইতিহাস জুড়ে তেমনই সেদিন শুধু সুতনুকা। অসংখ্য তারারা দেখতে দেখতে

পুড়ে ছাই হয়ে গেলে চোখের ওপর সেদিন বুঝতে বাকী রইল না কারুর, যে তারা কেউ তারা ছিল না; সবাই ছিল হাউই। তারা ওই একটিই,—সুতনুকা সেন। না। তারা নয়। বিদ্যুতের বীণা।

সেই সুতনুকা সেনের সঙ্গে আজ সাংঘাতিক লেগে গেল প্রোডিউসারের। তুলসীদাস ছবির প্রায় ক্রোড়পতি প্রযোজক রাধাশ্যাম ঘনশ্যাম বাজোরিয়া। যেদিনের কথা বলছি সেদিন ছিল সুতনুকার সব চেয়ে মারাত্মক দিন। তুলসীদাসের বউ বাপের বাড়ি চলে এসেছে তুলসীদাসের অবর্তমানে। জেনেই এসেছে যে বউ-পাগল তুলসীদাস এক মিনিট তিষ্ঠতে পারবে না। ছটফট করবে। ঝড়, জল, তুফান, বজ্র উপেক্ষা করে আসবে শ্বশুর বাড়িতে, বউকে দেখতে, বউকে নিয়ে যেতে তুলসীদাস এসে আছাড় খেয়ে পড়বে স্ত্রীর কাছে। এবং তখন তুলসীদাসের বউ বলবে :

'লাজ না লাগত আপুকো,
দৌরে আয়েহু সাথ।
ধিক ধিক ঐসে প্রেমকো,
কহা কহৌ মৈ নাথ॥
অস্থিচর্মময় দেহ মম—
তামো জৈসী প্রীতি।
তৈসী জো শ্রীরামমহ—
হোত ন তব ভবভীতি॥'

স্বামীকে জগৎস্বামীর পায়ে সমর্পণের উদ্দীপনা উজ্জ্বল দু'চোখে তুলসীদাসের স্ত্রীর ভূমিকায় সুতনুকা সেনকে একই সঙ্গে রৌদ্র মেঘের রামধনু জ্বালবার অবিস্মরণীয় দৃশ্যে সেদিন হাজির হয়েছিল প্রযোজকের এক গেলাসের ইয়ার, নিশাকর মজুমদার। সুতনুকা সেন বেছে বেছে তারই উদ্দেশ্যে আপত্তির তীর ছুঁড়ল : ও ভদ্রলোক ফ্লোরে কেন? একজন সহকারী, সুতনুকা সেন, অশ্লীল কথা বলেছে কিছু, এমনভাবে থামাতে এল। উনি, বাজোরিয়াজির ভীষণ বন্ধু। সুতনুকাকে

থামানো গেল না তাতে ঃ ভীষণ কি বিভীষণ জানি না। বন্ধু বন্ধুর বাড়িতে যাবে। ফ্লোরে আসবে কেন? দেবতার কানে গেল উত্তপ্ত কথাবার্তা সুতনুকাব।, তিনি এলেন মহম্মদের কাছে আবার ঃ কি হয়েছে সুতনুকা?

না। আপনার কানে নেবার মতো কিছু হয়নি–

উনি, মিঃ মজুমদারেব ফ্লোরে থাকায় আপত্তি করছেন,— সোনালিবরণ কর জানায় মুখে। মনে মনে, মনে করে নারদকে।

ও, নিশাকব থাকার জন্যে আপত্তি? সুতনুকা তুমি জানো না. ওকি জলি গুড ফেলো?

সো হোয়াট?—সুতনুকা বাগ মানে না।

ও থাকলে ক্ষতি কি?

যথেষ্ট ক্ষতি আছে আমার। এটা আমাব বেস্ট মোমেন্ট তুলসীদাস ছবিতে, আই ক্যাণ্ট অ্যাফোর্ড টু লেট ইট ফল ফ্ল্যাট–

নিশাকরের উপস্থিতিতে তোমাব কি অসুবিধে?

মুড আসবে না—

তর্কের জল কোন পর্যন্ত গড়াত বলা শক্ত, নিশাকব মজুমদার উঠে এল। এসে বলল ঃ মনে হচ্ছে, আমিই আপনাদের ঝগড়াব মূল। আমার ধারণা কি কোরেক্ট?

স্যুয়া। সেণ্ট পা সেণ্ট—

কি করেছি আমি জানতে পারি?

কি করেন নি তাই বলুন। আপনি ফ্লোরে এসেছেন কার পার্মিশনে জানতে পারি আমি তাব বদলে–

কারুর অনুমতিব অপেক্ষা রাখিনি আমি—

কেন?

কারণ, আপনার অ্যাডমায়ারার আমি আর রাধেশ্যাম আমার বন্ধু। দুয়ে দুয়ে যোগ করলে যা হয় তার চেয়ে বেশি কিছু করেছি আমি?

আমার মুড নষ্ট করেছেন আপনি—

আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। চলি এখন। আবার দেখা হবে—

ঝগড়া না করে লোকটা ঝগড়ায় হারিয়ে দিয়ে গেল সুতনুকাকে।

কথা রেখেছিল নিশাকর মজুমদার। শুটিং সেরে পার্ক স্ট্রীটের এয়ারকণ্ডিশাণ্ড ফ্ল্যাটে ফিরতেই, গাড়ি থেকে মালপত্তর নামাতে নামাতেই খবর দিল বেয়ারা, একজন বাবু বসে আছে ড্রয়িং-এ। বিরক্তিতে কুঞ্চিত হলো চোখের ওপর একজোড়া ধনুক। কোন্ ন্যাকাটা আসতে পারে এখন? অজিত চৌধুরী? না। রাঁচি গেছে কাল রাতে। জোয়ারদার। হ্যাঁ, হতেই পারে। খুবই হতে পারে। কাল ফোন করার কথা ছিল জোয়ারদারের। পারেনি কেন সেই কথা বলার অছিলায় এসেছে আজ। সমস্ত সন্ধ্যেটা মাটি করবে। না বলা শক্ত হবে, এখনও কাজ বাকি জোয়ারদারকে দিয়ে। সস্তায় একটা জমি চাই ন্যুয়ালিপুরে। সিন্ধুস্থান য়ুনস্যুয়ারেন্সের সিন্ধু ফাটক ছাড়া তের হাজার কাঠার জমি আড়াই হাজারে বার করা আর কারুর কাজ নয়। ভাবতে ভাবতেই মনে হলো নবারুণ কুমার নযতো? নবারুণকুমার হলে না বলা আরও শক্ত। সামনের কটা বই, নবারুণই পাইয়ে দিচ্ছে বলতে গেলে। একটারও কণ্ট্রাক্ট সই হয়নি এখনও।

ঘরে ঢুকে যার সঙ্গে দেখা হলো সুতনুকার সে সুতনুকার সমস্ত ইনট্যুইশন, রিসনিং, আন্দাজ মুহূর্তের মধ্যে ছত্রভঙ্গ করে দিল।

আপনি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। কথা দিয়েছিলাম আবার দেখা হবে—

কিন্তু আজকেই দেখা হবে তা বলেননি তো?

হু নোস বাট হু ওয়ান্ডার্স মে এণ্ড টুনাইট! কিন্তু সে ধাক ফ্লোরে আপনার মুড স্পয়েল করেছিলাম, এখন আপনার গোটা সন্ধ্যেটা নষ্ট করব না তো?

না। আপনি চলে যাবার পর, মনটা খারাপ হয়েছিল—

জানি। মনে হয়েছিল আমাকে অমন কুকুরের মতো দূর দূর করে তাড়িয়ে না দিলেও হতো—

কি করে জানলেন ?

মহাভারত পড়ে—

ফানি—

না, না, মহাভারত মোটেই ফানি নয়, ভেরি সিয়েরিয়াস সাবজেক্ট—

মহাভারত পড়ে কি জেনেছেন আপনি ?

জেনেছি যে দ্রৌপদী কর্ণকে মাছের চোখ বিঁধতে না দিয়ে রিপেণ্ট করেছে সারা জীবন—

চুপ করে গেল সুতনুকা সেন। যেমন চুপ করে যায় মোটরের এঞ্জিন রক্তচক্ষু ট্র্যাফিক সিগন্যালের সঙ্কেতে।

কথাটার মোড় ঘোরাবার জন্যেই হবে হয়ত, সুতনুকা সেন জিজ্ঞেস করে : কি খাবেন ?

সন্ধ্যের পর হুইস্কি ছাড়া আর কিছু প্রায় খাই-ই নে—

ড্রিঙ্ক তো নেই আমার এখানে—

ড্রিঙ্ক করতে এসেছি, বলিনি তো—

তবে—, বলে সুতনুকা সেন আবার মোড় ঘোরায় সাংঘাতিক কোনও দুর্ঘটনা এড়াবার মুহূর্তে ওয়াগুারহাত যেমন করে স্টিয়ারিং সুইং করে তার চেয়েও অনেক স্মার্টলি। অনেক ইসিলি। ভারি ক্যাসুয়াল কায়দায়। দাঁড়ান, আগে, কাপড়টা ছেড়ে আসি—

দাঁড়ান। কাপড় ছেড়ে আসবেন না দোহাই। কাপড় ছেড়ে আবার একটা কিছু পরে আসবেন, দোহাই আপনার—

ডোণ্ট বি সিলি—। সুতনুকার সঙ্গে হেসে ওঠে সন্ধ্যাদীপের ফ্লুরেসেণ্ট শিখাও।

আধঘণ্টা বাদে ফিরে আসে সকাল বেলার সুতনুকা সন্ধ্যে

'বার ছবি দেখতে লাগল
বেলার সুতনুকা সেজে। তাকিয়ে থাকে
মজুমদার। যেমন করে মাটির প্রদীপ সমস্ত রা...ন্যই জাস্ট্ ফর্মাল
চাঁদের দিকে। চন্দ্রহীন মধ্যরাত্রির অমাবস্যা গায়ে ...ন যে?
সুতনুকা সেন। সাদা শরীরে রাত্রির অন্ধকার। হাতির দাঁ।
মেহগনির কারু কাজ। চোখ রাখা যায় না। চোখ ফেরানো য।
বুকের লালচে আভাস কালোর পাতলা আবরণ ভেদ করে উ
আসছে। সমুদ্রের অতল থেকে মৎসকন্যা উঠে আসছে অপরূপ
একরাশ লাবণ্যের পাখায় ভর করে। কাঁধ থেকে হাত খালি। বুকের
ঠিক নীচে থেকে কোমর পর্যন্ত কেবল গৌরবর্ণ। পিঠের প্রায়
পুরোটাই চাঁদের আলোয় পড়ে থাকা বালির চিকচিক করা চড়া।

সমস্ত শরীর থেকে সুবাস ক্ষরিত হচ্ছে আর ড্রিঙ্ক না করে মাতাল হচ্ছে এই প্রথম নিশাকর মজুমদার।

নিজের অজান্তে গান উঠে আসছে নিশাকরের গলা দিয়ে সন্ধ্যেবেলার প্রতীকে মূর্তি ধরে এসে দাঁড়াতে দেখে, ইংরিজি গানঃ ডোণ্ট বি আফ্রেড-

আপনি বাংলা গান, গান না?

বাংলা গান বলে তো কিছু নেই, বাংলা কবিতা আছে, আবৃত্তি করি,-

সে কি রবীন্দ্র সঙ্গীত?

ও-ও আসলে কবিতা, কথাটাই আসল, সুর আছে নামে মাত্র—

রবীন্দ্রনাথের অনেক গান ক্লাসিকাল সুরে বসানো তা জানেন?

জানি—

তবে?

তাতে রবীন্দ্র কাব্যকে সঙ্গীতের সম্মান দিলে শার্লক হোমসকে সাহিত্য বলতে হয়। বলিও আমরা কখনও কখনও তাই বটে, কিন্তু আমরা তো যা বিশ্বাস করি তা বলি না; অথবা উল্টো করে বলা চলে, যা বলি তা বিশ্বাস করি না- -

আপনি ভারতীয় সঙ্গীতেই বিশ্বাস করেন না?

করি। ক্ল্যাসিকাল গানে করি, কিন্তু সে গান ঘরে বসে গাওয়ার নয়—

কোথায় বসে গাইবার তবে?

বনে--

আব্দুল করিম, খাঁ সাহেব, বড়ে গোলাম,—এঁরা তো বনে গিয়েছেন গান শোনাবার জন্যে বলে কখনও শুনিনি—

ওঁরা প্রতিভাকে পণ্য করেছেন, ওঁদের কথা ভেবে বলিনি—

কার কথা ভেবে বলেছেন?

তানসেনের গুরু হরিদাস-

উনিশশো তিপান্নয় হরিদাস?

(সেহাজার তিপান্নতেও আমার কাছে ক্ল্যাসিকাল গান মানে তানসেনের গুরু ওই একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস, বাকী সব, হয়, ফিল আপ দ্য গ্যাপস, নয় কমার্সিয়াল আর্টিস্ট-

হরিদাসের গান তো আপনি শোনেননি, তার গল্পই শুনেছেন শুধু--

বাল্মীকি যখন রামায়ণ লেখেন তখনও শ্রীরামচন্দ্রের নামই শুনেছিলেন কেবল- -

চুপ করে যায় সুতনুকা সেন। টেবলের ওপর ঠাণ্ডা হয়ে আসা চায়ের কাপের দিকে তাকিয়ে থাকে চুপ করে। মৃদু হাসির ছোট একটা ঢেউ নিশাকর মজুমদারের পাতলা ঠোঁটের তীরে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। নিশাকর গম্ভীর গলায় বলে: জবাব খুঁজছেন? জবাব খুজে পাবেন না আমার কথার কোনও দিন। যেকথার জবাব খুঁজে পাওয়া যায় সেকথা নিশাকর মজুমদার বলে না। জবাব খোঁজা থাক। চা খান' বরং। আমাদের একজন লেখক চমৎকার কথা বলেছেন চা সম্পর্কে। চা বড় ভালো জিনিস, হাতে গরম ঠেকে বটে, কিন্তু খেলে মাথা ঠাণ্ডা হয়।—মাথা ঠাণ্ডা করে চা খান।—

নিঃশব্দে চায়ের পেয়ালায় হেরে যাবার ছবি দেখতে লাগল স্ুতনুকা সেন।

একটু পরে সুতনুকা সিটুয়েশন হালকা করবার জন্যেই জাস্ট্ ফর্মাল হবার প্রয়াস পেল ঃ আপনি আজই হঠাৎ এখানে এলেন যে ?

এমন্ই।

না—

তবে ?

স্টুডিওতে আমার ব্যবহারের জবাব দিতে, নোবল রিভেঞ্জ—

না।

তবে ?

আপনাকে বিবাহের প্রস্তাব করতে এসেছিলাম—

চা ছিল মুখে সুতনুকার। সোডার বোতলের মুখ খুলে যাওয়ায় শব্দ করে যেমন ফোয়ারা ওঠে তেমনই সমস্ত চা-টা সুতনুকার মুখ থেকে বিশ্রী আওয়াজ করে ছেতরে যায় নিশাকর মজুমদারের মুখে, চোখে, বুশশার্টে, ট্রাউজারে। টেবলঢাকাও নষ্ট হয় আংশিক। শুরু হয় সুতনুকার বিষম ধ্বনি। কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে আসে সুতনুকার। গালের আপেলে ফেটে পড়ে রক্তের লাল। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসে। দুহাতে মুখ চেপে ধরেও, কাশি থামাতে পারে না সুতনুকা কিছুতেই। জল এগিয়ে দেয় নিশাকর। ইঙ্গিতে না করে সুতনুকা। তবুও এগিয়ে দেয় নিশাকর। জলটা খায় সুতনুকা। কাশির ধমক একটু কমে। কাশতে কাশতেই সুতনুকা জিজ্ঞেস করে ঃ আপনি কি পাগল ?

শুধু পাগল নই ; সুতনুকা-সেন-পাগল—

আমার সঙ্গে আপনার আলাপ কতক্ষণের বলে আপনার ধারণা—

এখন অব্দি পঁয়ত্রিশ মিনিট টু বি একস্যাকট—

এর মধ্যে কোনও লোক কাউকে বিয়ের প্রস্তাব করেছে বলে ফিকশনেও পড়িনি কখনও—

তার কারণ, আমার মতো লোককে নিয়ে এখনও ফিকশন লেখেনি কেউ—

আপনার স্পেশাল ফিচার্স কি ?

— আমি এই পৃথিবীর প্রথম সম্পূর্ণ অপদার্থ লোক—

চমৎকার !—

এখনই সমস্ত বিশেষণ উজাড় করে ফেলবেন না। আগে শুনুন, কেন ছত্রিশ মিনিট পর্যন্তও অপেক্ষা করলাম না বিবাহের প্রস্তাব করবার ব্যাপারে—

বলুন।

তাহলে আপনিই ধরে ফেলতেন যে আমি পুরোপুরি অপদার্থ। সত্যি কথা বলতে আমাদের সমাজে মেয়েরা যদি চিনবার সুযোগ পেত ছেলেদের তাহলে বোধ হয়, বোধ হয় কেন, মোস্ট ডেফিনিটলি কোনও পুরুষেরই বিয়ে হতো না—

সত্য কথা বলার জন্য ধন্যবাদ—

সম্পূর্ণ বাজে খরচা করলেন একটা নিটোল ধন্যবাদ—

কেন ?

কারণ সত্য কথা বলাও একটা পোস যার পার্পাস সম্পূর্ণ আলাদা—

আপনার আমাকে এই সত্যভাষণের পেছনে কি পার্পোস জানতে পারি ?

স্বচ্ছন্দে ! আমি নিজের মুখে নিজেকে অপদার্থ বললে যদি আপনি ততটা অপদার্থ আমাকে না মনে করেন—

বেশ, মনে করলাম না। তাতে আপনাকে আমি বিয়ে করতে রাজি হব কেন ?

তাহলে আমি বুঝব আপনি বোকা—

কি রকম ?

সব জাহাজেরই যেমন রিভারের মিডস্ট্রীমে বয়া লাগে, তেমনই

বস্তি থেকে আইসোলা বেলায় ওঠবার মাঝ রাস্তায় আপনার দরকার একজন স্বামীর, বলুন দরকার কি না—

মানলাম দরকার, কিন্তু আপনাকে দরকার কেন ?

কারণ কোথায় পাবেন আমার মতো স্বামী যে আপনার কোনও পাকা ধানে মই দেবে না—

আপনার স্বার্থ ?

আপনার টাকা—

টাকার জন্যে আপনি বিয়ে করবেন আমাকে ?

হ্যাঁ। সব চেয়ে সেরা কারণ ম্যারেজের তো ওই একটাই ম্যাডাম—

আপনার ভ্যানিটিতে ঘা লাগবে না ?

লাগবে—

তাহলে ?

আপনার ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতরে রাখা চেক বুক প্রত্যেকবারই সে ঘা শুকিয়ে দেবে—

য়ুহদি মেন্যুনের বেহালায় শেষ ছড় টানার ওপর পর্দা নেমে আসার অনেকক্ষণ পর পর্যন্তও যেমন সুরেলা ঘরে কোনও কোনও কানে কথা ঢোকে না একটাও, মনের মধ্যে কেঁদে বেড়ায় সে কোন্ বনের হরিণ। বয়ে যায় সুরের সুরধুনী। মনে হয়, জীবনের সোনার তরী আর তীরে বেঁধে রেখো না, ওই দেখো বাতাস বইছে মরি মরি। আধো আলো আধো অন্ধকার ড্রয়িংরুম অডিটরিয়াম এম্পায়ার মুহূর্তে স্বর্গের সুরসভায় উত্তীর্ণ হয়। অবারিত হয় হৃদয়ের আবরণ। মধুকরগুঞ্জরণে ছায়াতল কাঁপা দিন যেন গানের ঝরনাতলায় বসতে এসেছে, বসেছে সাঁঝের বেলায়। রিমঝিম করতে থাকে শরীরের বেহালা অব্যক্ত বেদনার ছড়ে। বলতে চায়, 'তোমার আপন হাতের দোলে, আমায় দোলাও, দোলাও, দোলাও।'

নিশাকর মজুমদার, সেদিন সুতনুকার ফ্ল্যাট সন্ধ্যার ফ্রক ছেড়ে রাতের শাড়ি গায়ে জড়াবার আগেই, বিদায় নেবার পর কতক্ষণ সুতনুকা জানে না, সুতনুকা উঠতে পারেনি, নড়তে পারেনি, ভাবতে পারেনি কোন কথা। নিশাকর মজুমদার এসেছিল কি না, সত্যি সত্যি ছত্রিশ মিনিটের মধ্যেই সুতনুকাকে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল কি না, এখন নিশাকর মজুম চলে যাবার পর সুতনুকা সেনের হঠাৎ মনে হচ্ছে হোল্ ব্যাপারটাই রূপালী পর্দায় দেখা ছায়াছবি। অলীক। অলৌকিক। আরব্যোপন্যাসের আরেকটি পাতা সময়ের হাতে উল্টে গেছে। আর সেখান থেকে উঠে এসেছে কোন্ আশ্চর্য মনিমুক্তার চেয়েও আশ্চর্যতর সংলাপ। স্ফটিকের মতো দীপ্যমান। চলে যাবার পরেও অন্ধকারে জ্বেলে রেখে গেছে প্রদীপ্ত সৌরভ।

এখন অন্ধকার ঘরে দূরের বন থেকে উড়ে এসেছে এইমাত্র একটি জোনাকি। তার দিকে তাকিয়ে সুতনুকা সেনের মনে হয়, জোনাকি নয়; আলোকিত বেদনা।

সময়ের অন্তহীন স্বপ্নে আরও কতক্ষণ বুঁদ হয়ে থাকত সুতনুকা সেন সেই নির্জন নিরুপম নিঃসীম অন্ধকারে ঘড়ি তার স্থূলত্বের মাপ নিতে পারে মাত্র; নির্জীব দুই কাঁটায় তার গভীরত্বের আস্বাদন অসম্ভব। খুট করে একটা আওয়াজ হলো। জ্বলে উঠল হঠাৎ আলোর ঝলকানি। সুতনুকার চোখে চাবুক মারল। দুহাতে চোখ ঢেকে ফেলল সুতনুকা সেন। আর তার রজনীগন্ধার মতো সাদা নরম সরু আঙুলে জল গড়িয়ে এলো চোখের। এতক্ষণ কাঁদছিল সুতনুকা। এতক্ষণে বুঝল সে। বিদ্যুতাহতের মতো দাঁড়িয়ে উঠেই ছুটে চলল ভেতরের ঘরে। আর বাইরের ঘরে স্বপ্নভঙ্গের জন্যে দায়ী অজিত চৌধুরী ভেবে পেল না, কি করবে সে। ফিরে যাবে, না, বসবে। ঠিক তখনই চোখে পড়ল সুতনুকার মুঠো থেকে খসে-পড়া পাকানো কাগজের দলা। কাগজটা খুলতেই বেরিয়ে পড়ল, নিশাকর মজুমদারের সুতনুকা সেনের কাছে ম্যারেজ-অ্যাপ্লিকেশন।

ঘরে কেউ ছিল না তাই। নাহলে সে অজিত চৌধুরীর মুখে এই সত্যের সাক্ষাৎ পেত যে কথামালার গল্প কত মিথ্যে। জীবনের দৌড়পাল্লায় কচ্ছপ যতক্ষণে গুটি গুটি এগোয় নিরলস পদক্ষেপের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে, ঘুমিয়ে, গান গেয়ে, একে ওকে তাকে দুহাতে সময় বিলিয়েও, খরগোস তাকে মেরে দেয় বারবার একটি মাত্র গুণে। লক্ষ্যবস্তুকে কাছে টেনে আনে সে। বাধা দিলে, উপড়ে আনে পায়ের জোরে।

দুর্বার হাসির ঢেউ মুখে তুলে ফিরে আসে সুতনুকা। অজিত চৌধুরী হাতে তুলে দেয় নিশাকরের অ্যাপ্লিকেশন। তারপর বলে, চলি—।

কেন?

তোমার লোক এসে গেছে। নিশাকর মজুমদার ইস ইয়া ম্যান—

ডোণ্ট বি সিলি। আজ প্রথম দেখা—

অর্জুনের সঙ্গে দ্রৌপদীর প্রথম সাক্ষাতেই দ্রৌপদী মজেছিল—

নিশাকর মজুমদার অর্জুন?

পঞ্চুর সঙ্গে ডুয়েল শেষ না হওয়া পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না, নিশাকর অর্জুন না কর্ণ। তবে একটা জিনিস বেশ বোঝা যাচ্ছে—

কি সেটা?

বাকী সবাই 'ওলসো র‍্যানের' দলে—

তুমি কি মনে কর? আমি আলেয়া?

আলেয়া হলে তো বাঁচতাম। কিন্তু তুমি যে আলো—

এত আলো দেখলে কোথায়?—কৌতুক পিছলে পড়ে সুতনুকার দুচোখভর্তি কালোয়।

পঞ্চুর দুচোখে দেখছি প্রায় রোজই—

তবে আর বলছ কেন যে নিশাকর মজুম 'ইস ইয়্যা ম্যান'—

বলছি তার কারণ, দ্রৌপদী যে ঠিক এই ভুলই করেছিল যখন অর্জুনকে সে মনে করেছিল অজুনই তার একমাত্র লোক—

সে রাতে অজিত চৌধুরীকে আর ধরে রাখা গেল না কিছুতেই। ডাঙ্গা থেকে আধমরা শোল লাফিয়ে ফিরে গেল জলে। যাক। সুতনুকা এমন কিছু স্যাড হবার কারণ খুজে পেল না। বঁড়শিতে এখনও কত রাঘব বোয়াল বিদ্ধ হবে বলতে পারে কেউ। একটা তো গেঁথেই আছে। জোয়ারদার। বিলেত নিয়ে যেতে চাইছে আসছে বছর। বিদেশ ভ্রমণের জন্যে, স্বাস্থ্যোদ্ধারের কারণে নয়। অকারণ পুলকে। ভাবছে বিদেশে অনুকূল হাওয়া বইবে। বেচারা জানে না, পৃথিবীর কোথাওই দেশলাইয়ের আগুনে জমাট তুষার একবিন্দুও গলে না; কেবল বারুদ নষ্ট করে।

তুলসীদাস ছবির প্রথম প্রদর্শনের মুহূর্ত থেকে জানতে বাকী রইল না কারুর যে, যে রেটে সুতনুকা সেনকে পাওয়া গেছে এতদিন রোলে নামবার জন্যে সে রেটের ছিপে ওই মাছকে ধরা যাবে না আর। যারা ইতিমধ্যে কনট্রাক্ট সই করেছিল তারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল। শুধু সুতনুকা সেনের নাম ভাঙিয়েই ডিস্ট্রিব্যুট'রের তেলের টিন উবুড় করে নেওয়া যাবে শেষ তলানির শেষ চুয়োনো-টুকু পর্যন্ত। কপাল চাপড়াল যে বেচারা সেই ভাগ্য-নিহত ব্যক্তির নাম—, না, নিজের নাম বললে তাকে টলিউডে নয় কেবল, তার বাড়িতেও কেউ চিনবে না। য়ুনিভার্সাল ভাগ্নে, ভবানীপুরেব নির্মলচন্দ্র মৌলিক। সকলের ভাগ্নে মৌলিক মশায়। সেই বিখ্যাত সার্বজনীন ভাগ্নে টলিউডের একমাত্র দেবতার একমাত্র ঢাকের কাঠি প্রচার-সচিব নাগার্জুন অধিকারীর কাছে তার নতুন ছবি রথযাত্রার নায়িকার ভূমিকার জন্যে সস্তায় সুতনুকা সেনকে চাইছিল। নাগার্জুন তাকে দেবতার সুস্পষ্ট নির্দেশ অগ্রাহ্য করে নিয়ে গিয়েছিল তুলসীদাস ছবির প্রাইভেট প্রোজেকশনে। সেখানে ছবির মাঝখানে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মৌলিক ভাগ্নে তার নতুন ছবির ডিস্ট্রিব্যুটার, ন্যাড়া চাটুজ্যেকে ফোন করে বলেছিল, সুতনুকা সেন তুলসীদাস ছবিতে ফ্রাণ্ট র‍্যাংকে পৌঁছে যাবে। ওকে ছবিতে নিলে মফস্বল ঢেলে দেবে নিজেকে রথযাত্রা ছবির দাদন দিতে।

কিন্তু সুতনুকা সেনের সঙ্গে বেশি দর কষাকষি করতে গিয়ে সে দাঁও ফসকেছিল মৌলিক মশাই। তারপর মনের মধ্যে ক্ষীণ আশা পোষণ করেছিল যে সুতনুকা বোধ হয় পযন্ত এত বড় স্টার হয়ে বেরুবে না তুলসীদাসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুলসীদাস ছবি থেকে যে বেরিয়ে এল সুতনুকা সেন নামে সে নিজেও ভাবেনি এত বড় বক্স অফিস এত অল্প সময়ের মধ্যে এত সহজে তার হাতের মুঠোয় এসে যাবে। ভাগ্নে মৌলিককে, নাগার্জুন অধিকারী, তুলসীদাস ছবি বাজারে বেরুবার পর দেখা হলেই জিজ্ঞেস করে: কি হলো ভাগ্নে

মশাই ? [illegible] বলেছিলে যে তুমি [illegible] বোকো। দাঁওতে পাচ্ছিলে না সুতনুকাকে ? এখন আঙুল কামড়াও সারাজীবন।

আঙুল কামড়ে ওলয়েডি ক্ষতবিক্ষত করেছিল টলিউডের একমাত্র ভাগ্নে—নির্মলচন্দ্র মৌলিক। নাগার্জুনের মিষ্টি কথা সেই কাটা ঘায়ে নুন ছড়াচ্ছিল। মৌলিক পাওনাদারের চেয়েও এখন যাকে ডরায় বেশি, টলিউডের দেবতা সুদর্শন দত্তের জ্যান্ত হংসবিমান সে। সেই ব্যক্তি, যার সঙ্গে দেখা হয়, তাকেই ভাগ্নের ব্যবসাবুদ্ধির পরিচয় দেয়। ভাগ্নেমশাই যেখানেই শোনে, এবার কাকে দাঁওয় পাচ্ছ ভাগ্নে ?

সব চেয়ে হেসেছিল যে, সে সুতনুকা সেন। একদিন রোল দেবার নাম করে যারা তাকে ঘুরিয়েছে, তাদের নামধাম সব তার নখাগ্রে। একটি একটি করে জবাব দিতে হবে তাদের। মুখের মতো জবাব। প্রত্যেক শুটিংএ, প্রত্যেক মুহূর্তে বুঝিয়ে দেবে, সে, সুতনুকা সেন। যে ক্ষমা করে না শত্রুকে ; জ্বালা ভোলে না প্রত্যাখ্যানের। শুটিং-এ যাবে দেরি করে। ডেট দিয়ে ক্যান্সেল করবে, এক বছরের ছবি শেষ করবে চার বছরে। বুঝিয়ে দেবে, যার সঙ্গে একদিন খেলা করতে চেয়েছিল টলিউডের আলালের ঘরে দুলালেরা, সে ঢোঁড়া নয়। কাল নাগিনী।

আর ঢুকিয়ে দেবে বিষ সেই সমাজের রক্তে, যে সমাজ পিতাকে ভদ্রলোক বলে মেনে নেয়, কিন্তু তার প্রমোদের প্রমাণকে ঠেলে দেয় বস্তিতে, ঝিয়ের মেয়ে এই পরিচয় নিয়ে বড় হতে হয় তাকে।

সেই ঝিয়ের মেয়েই পথের ধুলোয় নামিয়ে দেবে এবার বড় ঘরের বউঝিদের হাত থেকে স্বামীদের কেড়ে নিয়ে।

তুলসীদাস ছবির অভাবিত সাফল্যে বেসামাল সুদর্শন দত্ত শেষ পর্যন্ত সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করলেন সুতনুকা সেনের ক্ষেত্রে যে ভুল প্রায় সবাই করে থাকে। অত্যন্ত মেয়েলি গলায় যতখানি ধিক্কারজনক নেকামো সম্ভব তাই সম্বল করে একদিন গাড়ির নির্জন

অন্ধকারে সুতনুকাকে বললেন ঃ তোমার হাতটা একটু দেবে, আমার হাতে ? সুতনুকার গা গুলোচ্ছিল। হাত বাড়িয়ে দিল সে যেমন ভাবে কুকুরকে হাত চাটতে দেয় প্রভু। হাতটা ধরে দেবতা বসে থাকেন চুপ করে লক্ষণের ফল ধরে থাকার পোসে। গাড়ি থেকে ড্রাইভার নেমে গেছে দেবতার নির্দেশে। একটু চা-টা খুব কাছাকাছি কোথাও খেতে বলেছেন ড্রাইভার অনিলকে গাড়ির মালিক সুদর্শন দত্ত। চা খেতেও ভুলে বলেন না গিনি কখনও, টা খেতেও যখন একটা আস্ত টাকা বার করে দিয়েছেন অনিলকে তখনই অনিল বুঝেছে, দত্ত মশাই গাড়ির হর্ন না দিলে আসা চলবে না ফিরে। সব বড়লোকের ড্রাইভারই একথা জানে। গাড়ি চালানোর চেয়েও এদের মর্জিমতো নিজেকে চালানোই হচ্ছে চাকরি বজায় রাখার সব চেয়ে বড় হাতিয়ার। টলিউডের ড্রাইভারকে আর একটু বেশি জানতে হয়। একসট্রা মেয়ের কাছে যখন একসট্রা-ওর্ডিনারি পরিচালক অথবা নায়ককে নিয়ে যেতে হয় তখন গাড়ি রাখার নিরাপদ দূরত্ব কতটা, জানতে হয় তা। বাড়ির মেয়েরা যদি জানতে চায় বাবু কোথায় গিয়েছিলেন আগের দিন, তাহলে বলতে হয়, প্রোডিউসারের বাড়ি। গাড়ির মধ্যে কোনও মেয়ের কেশ কিংবা বেশাবশেষ কোথাও পড়ে না থাকে, গাড়ি গ্যারাজে তোলবার আগে তন্ন তন্ন করে দেখে নিতে হয়। খুনী যেমন করে তার হত্যার প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করে দেবার প্রয়াসী হয় তার চেয়েও দুঃসাধ্য ব্রত উদ্‌যাপন করে টলিউডের কেষ্ট-বিষ্টুদের গাড়ির বিশ্বস্ত ড্রাইভার। খুন যদিও তার হাতে হয়নি, খুনীকে রক্ষা করবার সব দায় তবুও তার হাতেই অনিবার্য এসে পড়ে। করতে হয় তার কারণ বোনের বিয়ে, মায়ের কাজ, কেবল মাইনের টাকার কুলোয় কুলোয় না। সেটাকা মালিকের পকেট থেকে অতিরিক্ত আসে যে কাজের জন্যে, সেকাজ রক্ষা করা ড্রাইভারের কাজের চেয়েও যে অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট, একথা যে জানে সেই বিশ্বস্ত। একথা যে জানে না সে শুধু

ড্রাইভার। ড্রাইভারও নয়। টেম্পোরারি স্টাফ। অত্যন্ত টেম্পোরারি।

অনিল টলিউডের দেবতার বিশ্বস্ত সারথি দীর্ঘকাল ধরে। দেবতা হাঁ করবামাত্তরই তাকে বুঝতে হয়, দেবতা আজ কি উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন? নতুন প্রযোজক বধের মৃগয়ায়, না অভিসারে। আজও 'চা-টা খাও, কাছাকাছি কোথাও' শোনার সঙ্গেই ড্রাইভার অনিল বুঝল, সুতনুকা সেনের সঙ্গে আজ দেবতার পূর্বরাগজ্ঞাপনের পালায়, টু ইস এ কাম্পানি থ্রি ইস নান।

অনেকক্ষণ হাত কচলাবার পর সুতনুকা বলল: কি হচ্ছে ওটা? কি বলবেন বলে ডেকেছিলেন, বলুন না?

বলছিলাম, প্রাগৈতিহাসিক বন্য মুখ দেবতার যতখানি সহনীয় করা সম্ভব তাই করে বললেন সুদর্শন দত্ত, বলছিলাম,—ছবি তো রিলিস হলো, তুমিও ওভারনাইট স্টার হয়ে গেলে, আমার গুরুদক্ষিণা?

আপনি তো আমার গুরু নন। আমার যা কিছু শেখা তার জন্যে ইথেল সোয়ানসন আর নিজের কাছে আমি যথেষ্ট গ্রেটফুল আছি—

আমি তোমার জন্যে কিছুই করিনি?

করেছেন। তুলসীদাস ছবিতে ওই রোলটা করতে দিয়েছেন। দিয়েছেন তার কারণ ও রোল করবার লোক কোনওদিনই ছিল না, আজও নেই আমি ছাড়া। তবুও প্রায় মাগনা করিয়ে নিয়েছেন কাজ। আমিও করেছি, তার কারণ আমি সারা জীবন ধরে পুষিয়ে নিতে পারব এই প্রথম দিকের লোকসান। আসলে এ আমার লাভ। তার বিনিময়ে যদি আপনি গায়ে হাত দিতে ডেকে থাকেন আজ, তাহলে ভুল করেছেন, কারণ আপনার যা বয়স, সে বয়সের কোনও লোক আমাকে ছুঁলে আমার এক্সাইটমেণ্ট হয় না, তেলাপোকা গায়ে উড়ে এসে পড়লে যেমন, তেমনই ঘিন ঘিন করে ওঠে সারা গা। আর ভবিষ্যতে কোনও ছবিতে যদি আমাকে চান তাহলে কম টাকায়

সে কাজ আমি করে দেব, কথা দিচ্ছি। আপনি সেদিন যা দিতে পারবেন, সেই টাকাই আমি নেব।

কথা শেষ করে, সুতনুকা নিজেই মোটারের শিঙা বাজায়। অনিল দাস চমকে ওঠে। এত তাড়াতাড়ি তো অভিসার সাঙ্গ হবার কথা নয়। তাহলে কি? হ্যাঁ, এই ভয়ই অনিলের মনে ছিল বরাবর। যে রাস্তায় এতকাল সব মেয়ের কাছেই গুরুদক্ষিণা আদায় করেছেন দেবতা, সেই পুরোনো গৎএ যে এই নতুন বাজনা সাড়া দেবে না, একথা অনিল ড্রাইভার হয়ে বোঝে, আর সুদর্শন দত্ত টলিউডের একচ্ছত্র দেবতা হয়েও বোঝে না কেন, অনিল পাল এই মুহূর্তে তা বোঝে না। বুঝে উঠতে পারে না।

গাড়ির চাবি ঘোরাবার আগে আয়নায় ড্রাইভার অনিল সুতনুকা আর সুদর্শনের মুখ দেখে। পাশাপাশি সে দুটি মুখ হচ্ছে, দ্য বিউটি এণ্ড দ্য বিস্ট!

বাড়ি ফিরতেই শুনল, স্বপ্না মুভিস থেকে মহাদেব ভট্টাচার্য ফোন করেছিল। নেচে উঠল সুতনুকার মন। ময়ূরের মতো নয়। মানুষের গন্ধে মাতাল বাঘিনীর মতো। বহুযুগের ওপার থেকে দাঁড়াল অপমানে বিবর্ণ একটি দিনের রক্তাক্ত পাণ্ডুলিপি। সে দিনটি ভুলবে না, ভোলা যাবে না,—সুতনুকা জানে। তখন প্রোডিউসার, ডিস্ট্রিব্যুটার, কে নয় যে না নাচিয়েছে সুতনুকাকে একটি রোলের অলীক প্রতিশ্রুতিতে। তারই মধ্যে সব চেয়ে নির্মম পরিহাস যে করেছে যে করেছে সে ওই মহাদেব ভট্টাচার্য। একটি দিনের, একটি বিশেষ দিনের জ্বালা এখনও সুতনুকার যায় নি। নিরাময় হয়নি ক্ষত। স্বপ্না মুভিসের বেন্টিংক স্ট্রীটের অফিসে বসিয়ে রেখেছিল ঝুমাকে মহাদেব ভট্টাচার্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তারপর বলেছিল: আজ ব্যস্ত আছি। তুমি আসছে হপ্তায় দেখা কোরো। সেদিন কি ভূত পেয়েছিল ঝুমাকে, কে'নও স্বেচ্ছায় অপমানিত হবার অশুভবুদ্ধি ভর করেছিল তার ওপর। ঝুমা বলেছিল, ট্রামে ভিড় হয়ে

গেছে, যদি আপনার গাড়িতে একটু ছেড়ে দিয়ে আসতে বলেন আপনার ড্রাইভারকে।—

ড্রাইভারকে কি বলেছিল মহাদেব তা স্বয়ং মহাদেবের পক্ষেও বলা শক্ত। হাইকোর্টের কাছে গিয়ে স্বপ্না মুভিসের ড্রাইভার বলল নেমে যেতে ঝুমাকে। এই অব্দি পৌঁছে দেবার অর্ডার হয়েছে তার ওপর। কাজেই আর পাদমেকং ন গচ্ছামি। হাইকোর্টের ট্রামে তখন আরও ভিড়। ঝুমা ড্রাইভারকে বলল, এখন তো ট্রামে ওঠা অসম্ভব। ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে এল আবার অফিসে। ভট্টাচার্য বলল, না, গাড়ি এখন তার কাজে বেরুবে, শ্যামবাজার-মুখো।

সেই মহাদেবের সঙ্গে এবার মনসার পাঞ্জা কষার দিন এল। টলিউডের চাঁদ সদাগর,—মহাদেবকে, না, মনসাকে কাকে পূজো দেবে, কোন হাতে দেবে, এবারে তা দেখে নেবে সুতনুকা সেন।

টেলিফোন বাজল আবার। এত রাতে কে? নিশাকর? জোয়ারদার? নবারুণ? না। একটাও মিলল না। রিনি ফোন করছে। প্রিন্সের রিনি।

কি ব্যাপার? হঠাৎ? এত রাতে?

ভীষণ বিপদ—

কার?

আমার—

কি হয়েছে?

পাঁচ হাজার টাকা কাল সকাল দশটার মধ্যে না পেলে আইসোলা বেলা বেহাত যাবে—

পাঁচ হাজার টাকা এখন খোলামকুচির চেয়েও সস্তা। আইসোলা বেলা,—ঝুমার স্বপ্ন। সকাল দশটা বাজবার এক ঘণ্টারও বেশি

আগে পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে পাট্টা বদল হলো আইসোলা বেলার। সিন্ধুস্থান ইনস্যুয়ারেন্সের বদলে মর্টগেজহোল্ডারের ঘরে ব্লক লেটারে নাম বসল, সুতনুকা সেনের।

যৌবনের স্বপ্নে আচ্ছন্ন আকাশে দ্বিতীয় তারাটি সবে দেখা দিল দূর দিগন্তে। ওর আলো স্পষ্ট হবে দিনে দিনে। আইসোলা বেলা, —কি মিষ্টি নাম! কি দুষ্টু হাতছানি!

একহাতে আইসোলা বেলার বন্ধকীপত্র গর্বপেটিকায় ভরে, আরেক হাতে রিনির হাত ধরে যে ফিরে এল পার্ক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে, সে সুতনুকা সেন নয়; সে আবার আরেকবার ঝুমা। রিনির দিকে ভালো করে তাকাতে হয় না ঝুমাকে। রিনির সমস্ত জীবন যে তীর খুঁজে না পাওয়া অন্ধকার নদীতে হালভাঙা পালছেঁড়া নৌকোর মতোই দিশাহারা তা যে কোনও লোকের চোখেও দৃষ্টি এড়াবার নয়। খেতে ঘুমোতে না পারা, এক মিনিট তিষ্ঠতে না পারা বিনি কয়েক বছরের মধ্যে এই প্রথম ঝুমার ফ্ল্যাটে নিজের কথা ভাববার অবকাশ পেল। আয়নায় দেখতে পেল নিজেব খোলসটাকে। এতই জরাজীর্ণ হয়ে গেছে সে খোলস যে তার সমস্ত ভেতরটা সমস্ত বাইরে হয়ে গেছে। দারুণ ভয় পেল না। দারুণ দুঃখ পেল না। পেল অনাস্বাদিত দুর্ঘটনার আভাস। বাঁচবে না সে বেশিদিন। আত্মহত্যা করবার উপায় নেই তার।. বাচ্চা হয়ে গেছে একটা। বাচ্চা না হলেও আত্মহত্যা করা তার হতো না। পৃথিবীকে, প্রিন্সের পৃথিবীকে সে এতো ভালোবেসেছিল যে মরে ফুরিয়ে যাবার কথা একদিনও সে ভাবতে পারত না। আজ, মরবার কথা তার মনে আসছে, এতে বিস্মিত হলো সে। সারা ভুবন কালো হয়ে গেছে কত আজ, এইমাত্র অন্যলোকের কাচের ঘরে বসে তা দেখতে পেল নির্ভুল, রিনি, যেমন দেখে রঞ্জন রশ্মির চর্মভেদী চোখ মানবদেহের অন্তঃসারশূন্যতাকে। দেখে, রিনির মনে হলো, ভালোবেসে একজন কি পায়? রিনিকে দেখে ঝুমার মনে এল অন্য কথা। রিনিকে দেখে তার মনে হলো প্রিন্সকে সত্যি তেমন ভালোবেসেছিল যেমন ভালোবেসেই কেবল একজন এমন নিঃশব্দে ক্ষয়ে যেতে পারে।

আর সেই মুহূর্তেই ঝুমার খাপ থেকে বেরিয়ে এসেছিল যে বাসনার বহ্নিবীণা তারই নাম সুতনুকা সেন। ক্ষয়ে যাবে না সে, রয়ে যাবে। রয়ে যাবে কীর্তিতে, অর্থে, সামর্থ্যে। সব চেয়ে বেশি রয়ে যাবে পুরুষের স্বপ্নে। ঘর ভাঙবার পর এখন একের পর এক বাইরে এসে দেখবে মিলিয়ে গেছে মরীচিকা তখন তারা ঘরেও নয় পারেও নয়, ত্রিশঙ্কুর মতো শূলবিদ্ধ ঝুলবে। দূর থেকে দেখবে সুতনুকা সেন। পুরীষোৎসর্গ করবার পর কারুর মাথায় যেমন মজা দেখে বৃদ্ধ বায়স নাগালের সীমাহীন ঊর্ধ্বে বসে। মায়ের আত্মার তৃপ্তিতে মরে সুখ পাবে সুতনুকা সেদিন। তার আগে তার কাজ আছে। মাঠভরা।

সুতনুকা সেন মরবে না; মারবে। পাগল হবে না; পাগল করবে। আলো হতে চায় না সুতনুকা; আলো থেকে সরিয়ে আনতে চায় পুরুষকে। সুতনুকা সেন আলেয়া। আজ রিনিকে দেখে আত্মপ্রসাদ অনুভব করল ঝুমা। পঞ্চুর ভালোবাসায় গলে যায় নি সে। মনে মনে সাংঘাতিক অশ্লীল কথা উচ্চারণ করল সুতনুকা সেন। মুখে সে কথা বলল না ঝুমা। যে টাকা, অপ্রিয় সত্য আর প্রিয় স্ল্যাং মুখ ফুটে বলবার জন্যে দরকার হয়, ঝুমা এখনও, ততবড় সুতনুকা হয়ে ওঠেনি, তাই। তার বদলে শুধু বলল; কাম সত্য; ভালোবাসা বাংকাম।

বলে দেখল, রিনির, কানে একটা কথাও যাচ্ছে না। রিনি খাচ্ছেও না; কাঁদছে। গা জ্বলে গেল দেখে ঝুমার। তবু অবস্থার কথা মনে রেখে শান্ত স্বরে বলল ঝুমা: কি হয়েছে? কাঁদছ কেন? প্রিন্সের কথা ভেবে?

হ্যাঁ। মুখে বলল না রিনি। ইঙ্গিতে বোঝাল।

কি হয়েছে তার? হোয়া ইস হি নাউ?

জেলে—, অনেক দ্বিধার পর অস্ফুট উচ্চারিত হল রিনির সবিং-এর ইন্টারল্যুডে।

কেন? কি করেছিল প্রিন্স?—ঝুমার পক্ষেও একটু বেশি রূঢ় মনে হলো ফ্যাক্টটা।

ডিফলকেট—। সবিং বন্ধ হয়ে স্বর স্পষ্ট হলো রিনির।

কত টাকা?

দেড় লাখ—

সে টাকা ছিল না আইসোলা বেলায়—

না। আমার বিয়ের পরই জানলাম দেনায় ডুবে আছে আইসোলা বেলা। আমার নামে একলাখ টাকা ফিক্স্‌ড ডিপসিট ছিল ব্যাঙ্কে। আর গয়না বেচে টাকাটা জোগাড় হলো কিন্তু তারপরেও তারা ছাড়ল না। জেলে দিল প্রিন্সকে।

টাকাটা ডিফলকেট করার দরকার হলো কেন? রেস, না মদ?

মেয়েছেলে—

কারুর বউ?

হ্যাঁ—

ড্যামেজ দিতে হলো?

হ্যাঁ—

সে মেয়ের স্পেশাল ফিচার্স?

তাকে তোমার মতো নাকি দেখতে—

হাউ সিলি, আমার কাছেই তো আসতে পারত তোমার প্রিন্স, —আটকাতো কে?

আসতে চাইতো তোমার কাছে প্রিন্স, আর প্রত্যেকবারই আমি, —শেষ করা অসম্ভব হয় রিনির সেণ্টেনস।

তুমি আটকাতে? কেন?

ভয় হতো পাছে প্রিন্স আমার না থাকে—

রিডিকিলাস! আমি হচ্ছি প্রিন্সের পাগলামি। আমার কাছে প্রিন্সকে আসতে দিলে আজ শুধু প্রিন্স নয়, আইসোলা বেলা-ও তোমার থাকতো—

আরও বলতে গিয়ে দেখলো ঝুমা, আর একটা কথা বলাও বাহুল্য। রিনির চেয়ে বেশি সেই বক্তব্য আর কারুর পক্ষেই অনুধাবন করা অসম্ভব।

রিনি চলে গেল বিকেল হবার আগেই দ্বিপ্রহরে। দ্বিপ্রহরেই অপরাহ্ণ ঘনিয়ে আসা রিনির দুচোখে ঝুমা যে বার্তা পড়তে পারল তা হচ্ছে সংসারের নির্মমতম সত্য। প্রিন্সকে রিনি আজও একই রকম ভালোবাসে। তেমনই প্রথম নববর্ষার ঘন মেঘ আজও ঘোরে ফেরে প্রথম আষাঢ়ের আকাশে। যেমন নবীন ছিল সে উজ্জয়িনীর দিনে, আজও তেমনই উজ্জ্বল, হয়ে আছে, রিনির ঘরভাঙা শূন্যতার দুর্দিনে। ঘর ভেঙেছে, স্বপ্ন ভাঙেনি রিনিব।

রিনির পক্ষে আত্মহত্যা করা সম্ভব হবে না কোনওদিন। এখন মরলে বেঁচে যাবে রিনি। কিন্তু তাও সম্ভব হবে না যে তা জানে ঝুমা। (মৃত্যুর দেবতা হয় লেট, নয় ট্যু আর্লি। প্রায়ই যে পাংচুয়াল নয়, তার হাতেই সময়ে সবাইকে সরাবার ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে আছেন দূরে যে মানুষের ভাগ্যবিধাতা, তিনি স্যাডিস্ট। মানুষের যন্ত্রণায় তাঁর অদ্ভুত আনন্দ। বাঁচতে চায় যে সুন্দর ভুবনে তাকে সরিয়ে নেয় তাঁর মিনিস্টার ইন চার্জ অভ ডেথ। আর মৃত্যু ছাড়া যার বাঁচবার পথ খোলা নেই তার পরমায়ু ফুরিয়ে আসা দেহের প্রদীপে নতুন করে উস্কে দেয় সলতে; তেল ঢেলে দেয় অন্যের স্টক উজাড় করে।)

দাঁতে দাঁত দিয়ে সুতনুকা ঈশ্বরসমীপে যমের নাম ডাকে। বলে, এ সুযোগ ব্যর্থ করে দেবে সে তার বেলা। সাকসেসের শিখরে দাঁড়িয়ে, সূর্যাস্তের অপেক্ষা করবে না সে। নিজের হাতে নিবিয়ে দিয়ে যাবে, বাতি। সে বাতির দিকে তাকিয়ে লোকে বলবে, এখনও জ্বলতে পারত উজ্জ্বল দীপ্তিতে আরও অনেকক্ষণ। যেমন বলে লোকে বিস্ময়ের অর্ধপথে মেন্যুনের বেহালা হঠাৎ থেমে গেলে। স্তব্ধ প্রহরে সমস্ত অডিটরিয়াম কান পেতে থাকে যদি

আবার বেহালার বুক সুবাস ভরে দেয় কোনও নবতর রাগের দীপ্তশিখা।

ভাগ্যবিধাতার সঙ্গে সংগ্রামের শেষ হাসি হাসবে সে। ঝুমার জন্মপরিহাস স্বেচ্ছামৃত্যুর ইরেস মুছে দিয়ে যাবে এমনভাবে সুতনুকা সেন যাতে পেডিগ্রী আছে যাদের তারাও ঈর্ষ্যা করবে একজনকে, জন্মের ঠিক ছিল না যার সামাজিক আইনের আঙ্গিকে।

বিশ্বস্ত বেয়ারা শ্রীমান আনন্দ পর্দা ঠেলে ঢোকে ঃ একজন বাবু এয়েছেন—। স্পষ্ট বোঝা যায় আগন্তুক বড়লোক নয়। গাড়ি করে আসেনি। বেয়ারাদের ফেস হচ্ছে যে কোনও ভিসিটারের পকেটের কারেক্ট ইনডেক্স। সে ইনডেক্স, পড়তে আটকাল না সুতনুকার, সুস্পষ্টই শূন্য পকেটের। ভদ্রলোককে অপেক্ষা করতে বলল না সুতনুকা। তৎক্ষণাৎ বসবার ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। এবং মুখের ওপরই বলল ; আপনাকে চিনতে পারলাম না তো ?

কেউ পারে না মা, তুমি নতুন কিছু বললে না। দুঃসময়ে যে লোকের সঙ্গে লোকের পরিচয় হয়, ভালো সময়ে সব চেয়ে আগে তাকেই ভুলতে চায়। তুমিও ভুলে গেছ। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল মহাদেব ভট্টাচার্যের ওখানে। স্বপ্না মুভিসের অফিসে—

মনে পড়েছে, আপনি হচ্ছেন পণ্ডিত মশাই—

ওটা ব্যাজস্তুতি। আমি আসলে মুখ্যু মশাই—কিন্তু আমি যা শুনলুম তোমার সম্পর্কে সে কি ভুল—

কি শুনেছেন ?

তোমার খুব ভালো সময়। নাম টাকা বিস্তর নাকি হয়েছে—

যতটা শুনেছেন, তত কিছু নয়—

তাই হবে। না হলে এত চট করে তোমার মনে পড়বে কেন আমাকে। সে যাক, তোমার কুষ্টি আছে।

না।

না থাকারই কথা—

জন্মমুহূর্তের ওপর কটাক্ষ করলেন কি না জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত মশাই, সুতনুকা সুনিশ্চিত হবার জন্যে তাই জিজ্ঞেস করল : না থাকারই কথা কেন ?

আমার চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা বলে যে যাদের ভাগ্য ভালো তাদের কুষ্টি থাকার দরকার করে না। যাক। তোমার হাতটা দেখব একবার। যদি আপত্তি না থাকে।

যাদের হাত ছুঁতে ঘেন্না করে তাদেরই হাত ধরতে বাধ্য হই আমি। আপনি হাত ধরলে তো জানব, পাঁক থেকে উঠোবার মতো একজোড়া হাত এখনও দুনিয়ায় আছে। দেখুন—

হাতটা মেলে ধরে সুতনুকা।

তোমার বেলায় বাঁহাত নয় মা, ডান হাতটা দেখি। ডানহাত দেখতে দেখতে পণ্ডিত মশাই প্রশ্ন করেন : তোমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মা মারা যায় তোমার ?

তাই শুনেছি।

তোমার বাবা কে তা তুমি জানতে না ?

মারা যাবার কয়েকদিন—

শুধু হ্যাঁ কি না বলো। তুমি সব বলে দিলে আমি আর কি বলব ?

না।

তোমার বাবার মৃত্যুর ঠিক আগে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে একবার ?।

দুবার !

না। হতে পারে না। একবার মাত্র দেখা হয়েছে। আরেকবার বোধ হয়—

হ্যাঁ। আরেকবার যখন দেখা হয় তখন বাবা বেঁচে ছিলেন না—

তোমার জন্মতারিখটা কি ?

জানি না।

তোমার জন্মতারিখটা লিখে রাখো। ১৩৪৬-এর ১৫ই আশ্বিন। মনে থাকবে?

আপনি হাত দেখে কি করে জন্ম-সময় বলছেন?

যেমন করে অন্যগুলো বললাম। তোমার হাতে লেখা আছে যে—

কিন্তু আপনি হঠাৎ আমার হাত নিয়ে পড়লেন কেন? জাস্ট কৌতূহল, না, কোনও উদ্দেশ্য আছে এর?

তোমার বিয়ের ঘটকালি করতে এসেছি মা—

কার সঙ্গে?

আমি তো অনেক কথা বললাম, এবার তুমি বলো দেখি, কার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে বলে মনে হয়?

নিশাকর মজুমদার কি?

ঠিক বলেছ তুমি। ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে কি না জানতে এসেছিল নিশাকর আজ। তাই তোমার হাতটা দেখলাম, প্রেডিকশান করবার আগে নিশ্চিত হবার জন্যে—

এ বিয়ে কি সুখের হবে?

নিশাকরের পক্ষে সুখের, তোমার পক্ষে খুবই অসুখের—

তাহলে?

তাহলেও উপায় নেই মা, ভবিতব্য।

বিয়ে যদি আমি না করি?

যেখানে তুমি উঠতে চাইছ সেপর্যন্ত তুমি উঠতে পারবে না—

কেন?

একটা না মিললে অন্যগুলো মিলবে কি করে?

এসব আমি বিশ্বাস করি না—

তোমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছু এসে যায় না মা, এ হবেই। এ বছরেরই ২৭শে অঘ্রাণ তোমার বিয়ে হবে, নিশাকরের সঙ্গে। আমি উঠি তাহলে—

পণ্ডিত মশাই বেরিয়ে যাবার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এসে দাঁড়ায় স্বপ্না মুভিসের মহাদেব ভট্টাচার্য। পণ্ডিত মশাই, নিশাকর মজুমদার, বিয়ে, ২৭শে অগ্রাণ,—সব চিন্তা একসঙ্গে জট পাকায় সুতনুকার মাথার মধ্যে। ভট্টাচার্যকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও পাঞ্জা কষার জোর পেল না সুতনুকা। ভট্টাচার্য যেন টের পেয়েই ঢুকল সেই মোমেণ্টে, লক্ষীন্দরের ঘরের বাইরে সবাই যখন ঘুমে ঢুলেছে একটু।

নমস্কার হই ম্যাডাম।

নমস্কার। কি ব্যাপার? ফোন করেছিলেন?

হ্যাঁ। ছবির ব্যাপার ছাড়া আর কোনও জাহাজের ব্যাপারে আমি নেই, জানেন।

কি ছবি?

সূর্যসেনা।

কার গল্প?

প্রাণকুমার মৈত্র

ডিরেক্টর কে?

গৌবদাস ভট্টাচার্য।

আমি স্ক্রিপ্ট আগে দেখব, বোল পছন্দ হলে—

এই যে স্ক্রিপ্ট নিয়ে এসেছি সঙ্গে করে। পড়ে দেখুন আগে—

আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা নেব—

আগে পড়ে দেখুন, রোল পছন্দ হয় কি না—

রোল পছন্দ না হলে আবও বেশি নেব—

নেবেন।

ডেট দেব আমার মর্জি মতন—

দেবেন।

এবার আমার ভয় করছে যে—

কেন?

আপনার সঙ্গে ঝগড়া হবে আশা কবে পাঞ্জা কষছি এতদিন—

ঝগড়া হয় না কারুর সঙ্গে ভট্টাচার্যের—

আগে হয় না। কাজ শুরু হবার পরই আপনার সঙ্গে ঝগড়া হয় সকলের—

আপনার সঙ্গে তাও হবে না।

কারণ?

আপনি বক্স-অফিস। যে গরু দুধ দেয় তার চাট খেতেই হবে। এ মহাদেবের সতী হচ্ছে ওই বক্স-অফিস। আর কেউ নয়। কিন্তু আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চেয়েছিলেন কেন? একদিন গাড়িটা ছেড়ে দিইনি, বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যে, এই কারণে?

হ্যাঁ।

তার জন্যে আমার সঙ্গে আপনার সখ্য নিবিড় হওয়া উচিত ছিল—

কেন?

কারণ, সেদিন আপনাকে দেখে যদি মনে করতে পারতাম যে আপনি এত বড় আর্টিস্ট হবেন, তাহলে আমি ব্যবসাদার না হয়ে শিক্ষিত শিল্পরসিক হতাম। তাছাড়া—

তাছাড়া কি?

তাছাড়া আপনি তো সেন্টিমেণ্টাল নন নিজেও। আপনি তো জানেন যে কাল আপনার বক্স-অফিস না থাকলে এই মহাদেব ভটচায আবার আপনাকে লিফ্‌ট দিতে রিফ্যুস করবে। এ নাহলে আমি যেমন ব্যবসাদার থাকি না আর, তেমনই এতে রাগ করলে বস্তি থেকে আপনি যেখানে উঠতে চাইছেন সেখানে উঠতে পারবেন না তো।

হাত বাড়িয়ে দেয় সুতনুকা। পাঞ্জা কষার জন্যে নয়; শুভেচ্ছা করবার জন্যে। হাত নেয় না ভটচায। বলে, অত উচ্ছ্বসিত হবেন না। আমি দাঁও কষব—

হাত ফিরিয়ে নেয় সুতনুকা। প্রত্যাখ্যানের বৃশ্চিক দংশনে

জ্বলতে থাকে রজনীগন্ধার মতো সাদা, নরম, নিরাভরণ হাত স্তুতনুকার। যে হাত দেখে পণ্ডিত মশায় বলেছেন, ২৭শে অঘ্রাণ তার বিয়ে নিশাকর মজুমদারের সঙ্গে। আজ ভট্‌চাযের কাছেও তার হার হলো। মনে হচ্ছে ২৭শে অঘ্রাণও তার হার হবে, নিশাকর মজুমদারের কাছে।

না। হার মানবে না সে। জীবনের কাছেও নয়। জীবন-দেবতার কাছেও নয়।

ভট্‌চায উঠে পড়ে। চলি ম্যাডাম—

আচ্ছা—

রোলটা পড়ে দেখলে পঞ্চাশ হাজারে নয়, পাঁচ হাজারে সই করতে চাইবেন। রোলটা আপনার জন্যেই তৈরি করা—

আর্টিস্টের জন্যে রোল নয়। রোলের জন্যেই আর্টিস্ট। যে কোনও রোলে যে কলরোল আনতে পারে না, সে প্রফেশনাল বেগার। সে আর্টিস্ট নয়। যদি বা আর্টিস্ট হয়,—সুতনুকা সেন নয় সে নিশ্চয়ই।—সুতনুকাব হাতের বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা এতক্ষণে মাথায় রক্ত চালান করে। ফণা তুলে উঠে দাঁড়ায় আহত মার্জার।

সাপ তাই দেখে মাথা নীচু কবে বলে ঃ তাহলে আসি এখন।

পণ্ডিত মশাইকে কেবল তারিখটাই বলতে হয়েছিল স্পষ্ট করে; পণ্ডিত মশাই বলবার আগেই, সুতনুকা জানত যে নিশাকর মজুমদারই তার ভবিতব্য। আজ পণ্ডিত মশাই ডেট-টা স্পষ্ট করে বলা মাত্রই সে আর দেরি করল না। ফর্মালি এনাউন্স করবার অনুমতি দিল নিশাকরকে। স্টেটসম্যানের রোববারের পাতার পার্সন্যাল কলামে ঘোষিত হলো সিম্পলি কেবল এই বার্তা যে নিশাকর মজুম আর সুতনুকা সেন গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছে কয়েকদিনের মধ্যে। দেরি করার উপায় ছিল না সুতনুকার। আজ কয়েকদিন ধরেই বমি করতে শুরু করেছিল সে। আর দেরি করলে নিশাকর মজুম ধরে ফেলত যে নিশাকর মজুমের বেপরোয়ানায় আকৃষ্ট হয়নি সুতনুকা। তার নিজের স্বার্থেই নিশাকরের গলায় করেছে বরমাল্য দান। আর দেরি করলে শরীরের ভেতর যে আরেক শরীর ফুটতে আরম্ভ করেছে তাকে নষ্ট করে ফেলতে হতো, নয় বিয়ের কয়েকদিনের মধ্যে সেই নবজাতককে কেন্দ্র করে স্ত্রীকে সারাজীবন ব্ল্যাক মেইল করত নিশাকর মজুমদার। এসমাজের ও সমাজের কোনও সমাজেই এখনও পর্যন্ত মাথায় ঢোকেনি এই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিধান যে সন্তান কখনও অবৈধ হয় না। ইলেজিটিমেট হয়, যদি কেউ হয় আসো তো ইরেসপনসিবল পেরেণ্ট। ইদার অথবা বোথ।

নিঃশব্দে ঘটে গেল সেই দুর্ঘটনা কখন সুতনুকা ছাড়া কেউ জানল না। এমনি কি যে এর নিমিত্ত কারণ হলো সে-ও না। সুতনুকা মর্মে মর্মে বুঝল এই সমাজের প্রতি হিংস্র বিদ্বেষ পোষণের বদলে এখন তার স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতার অন্ত রইল না। তার মায়ের

প্রতি তার বাবা যে অন্যায় করেছিলেন আজ সুতনুকা-কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবে যখন সারাজীবন ধরে একজন কিছুই না জেনে তখন দিনে দিনে বাবার অক্ষমনীয় অবিচারের চেয়ে সুতনুকার পাপের বোঝা হবে ভারী। সে বোঝার ভারে সুতনুকা তলিয়ে যাবে কি না সুতনুকা জানে না। তবে এটুকু জানে সে, যে এজগতে কেউ জানুক আর না জানুক পাপের শাস্তি তাকে পেতেই হবে। তার জন্যে পরকালের ভয় দেখানো বাহুল্য। ইহকালেই সব দেনা শোধ করে যেতে হয়। ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্টেরই নাম, লাইফ।

যাদের দেখে আমরা বলি, অন্যায়ের পর অন্যায়ের দুর্বার গতিসম্পন্ন যাদের অর্থ ও সামর্থ্যের চুড়া থেকে হেলতে দেখি না একচুলও বলে, আমরা প্রায়ই বলি, ঈশ্বর অন্ধ, তাদের অন্ধকার ভেতর আমাদের চোখে ধরা পড়ে না বলেই এমন অর্বাচীন উক্তি আমরা করি। কিংবা, টাকাকড়ি, খ্যাতির স্বর্গ থেকে ইনসলভেন্সি ও স্ক্যাণ্ডালের নরকে নেমে যাওয়াকেই আমরা ভগবানের একমাত্র মার মনে করি, তাই, আর না হয় দুরারোগ্য ব্যাধিতে বিকল হওয়া অথবা একমাত্র সন্তানের অকালমৃত্যু,—একেই বলি আমরা ধর্মের চাকার বাতাসে নড়ার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া, তাই। কিন্তু ঈশ্বরের আঘাত যে এর চেয়ে কত সূক্ষ্ম তা আমরা জানলে অন্যায় করতে ভয় পেতাম।

যেমন ভয় পেয়েছে পণ্ডিত মশাই আর ভট্চায চ.া যাবার পর অন্ধকার নির্জনে ঈশ্বরের মুখোমুখী সুতনুকা সেন। ঈশ্বরের অনেক নাম। সব চেয়ে হাতের কাছে যে ঈশ্বরের বাস তার নাম বোধ হয় বিবেক। সেই বিবেকের মার আরম্ভ হয়ে গেছে তখনই, যখনই নিশাকর মজুমদার না জেনে রাজি হয়েছে সুতনুকা সেনকে বিয়ে করতে। সুতনুকা সেনের সঙ্গে বিয়ের পর যে সন্তানকে নিজের বলে যতবার আদর করবে নিশাকর, ততবার, মরে যাবে সুতনুকা। যে পাপের শাস্তি নামে অচিরাৎ সে পাপের গুরুত্ব কম। দেখিছে অনেকে পাপের পুরস্কার মেলে একদিন একমাত্র সন্তানের মৃত্যুতে,

সে পাপেরও মার্জনা হলো। যে পাপের মার্জনা বিধাতার হাতেও সেই সুতনুকা সেনের সেই ক্রাইম শেষ হয়ে গেছে; কিন্তু তার পানিশমেণ্ট শেষ হবে না কখনও।

কর্ণকেও একসময়ে বলতে পেরেছিল কুন্তী, তার জন্ম-পরিচয়। কিন্তু সুতনুকা সেন তার সন্তানকে কখনও বলতে পারবে না, তার পিতা কে! এই জগতে কেউ জানবে না সে কথা। এ পাপের যে অংশীদার, তাকেও জানতে দেবে না সুতনুকা কোনও দিন। জানাতে পারবে না নিশাকর মজুমদারকেও।

যতবার নবতর খ্যাতি, বিপুলতর বিত্ত দুহাতে জয় ঘোষণা করবে সুতনুকা সেনের, ততবার হার হবে ঝুমার। আজ অন্ধকারতম নিশীথিনী যখন তার মৃত্যুর মতো কালো চাদরে গা ঢেকে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে সুতনুকা সেনেব বিজন ঘরে, তখন সেই হার ঝুমা দেখতে পেল স্পষ্ট, ভীষণ দুলছে, বিবেকের গলায়। তীক্ষ্ণ মুখ তীক্ষ্ণতর হয়ে বিদীর্ণ করতে চাইছে সুতনুকা সেনের উদ্যত উদ্ধত বুক।

তবু সেই একটি কি দুটি কি তিনটি স্বপ্নভরা রাত যে এসেছিল জীবনে তা ভুলতে পারছে কই ঝুমা। মধুরতম ভুল করবার অক্ষয় রাত্রির বাসর পেতেছিল সুতনুকা সেন নয়, ঝুমা। নিজের হাতে পাততে হয়নি। দীঘার সমুদ্রতীরে যার চোখে তারায় ভরা আকাশের নীচে সর্বনাশ দেখেছিল ঝুমা, সে চোখ কি পাবে তার সন্তান। যদি পায় তবে সে চোখ যাকে মনে করাবে, সে কি পারবে না মুছে দিতে ঝুমার সমস্ত পাপ? যদি না পারে তার স্মৃতি, বিস্মৃতির [illegible] তলিয়ে দিতে বিবেকের ছবি তবে বৃথাই তাকে সব দিয়েছিল ঝুমা।

দীঘার বিচে সে রাতে আকাশ তার নিজের হাতে জ্যোৎস্নার চাদর বিছিয়ে দিয়েছিল। ঝাউবনে দোলা লেগেছিল [illegible] পূর্ণচন্দ্রের মায়ায় ভাবনা ভুলেছিল ঝুমা। কাক-জ্যোৎস্নায় রাতকে ভুল করেছিল দিন বলে পাখির গলা। ঢেউ এসেছিল। [illegible] নয়

শুধু। ঝুমার সমস্ত শরীরে। কামনার রাঙা ঢেউ। তার চোখে তা পড়তে ভুল করেনি প্রায়নিরক্ষর পঞ্চু। সমস্ত শরীর লিরিক হয়ে গিয়েছিল ঝুমার। ঝাউবনের অন্ধকারে ভেনাস এসেছিল দীঘার সমুদ্রতীরে ক্ষণকালের জন্যে। নিরাভরণ, নিরাবরণ শরীর কেঁপে উঠেছিল থেকে থেকে। চোখ বুজে এসেছিল ঝুমার। অবশ হয়ে এসেছিল সর্বাঙ্গ। তার গায়ে হাত দেবার জন্যে লোলুপ আঙুল পঞ্চুর পিছিয়ে যাচ্ছিল বারবার। মনে হচ্ছিল দুর্বার তৃষ্ণার স্বচ্ছ সেই গায়ে হাত দিলে ভেঙ্গে যাবে নিবিড় একটুকরো নীলমেঘ। কাছে টেনে এনেছিল ঝুমাকে তবুও। ঠোঁট নেমে এসেছিল পঞ্চুর,—ঝুমার ঠোঁটের ওপর। চাঁদের আলো এসে পড়েছিল সমুদ্রের জলে। ঘুমহারা স্তব্ধতারা আকাশ পড়েছিল সেই দেহের কাব্য একা। পাতা উল্টে গিয়েছিল একের পর এক। তারপর এসেছিল হঠাৎ সেই বড় ঢেউ। চলে গিয়েছিল কখন ঝুমা আর পঞ্চুর ওপর দিয়ে আকাশ তা জানে না। ঝুমা আর পঞ্চুও,—না। শুধু অব্যক্ত আনন্দধারায় স্নান করেছিল তারা দুজন। একজন অনন্তকালের ইশারা; আরেকজন অন্তহীন বাসনার বিমুগ্ধ প্রত্যুত্তর।

জীবনরণরঙ্গভূমির নায়িকা ঝুমা ছায়ারঙ্গভূমির নায়িকা সুতনুকার কাছে জানতে চায় শুধু, ক্রাইমের আনন্দ না পানিশমেণ্টেরও বেদনা, —দুর্বহ, দুঃসহ, এর মধ্যে কে? উত্তর না পেয়ে ঝুমা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। আর ঝুমার কান্নায় ভেঙ্গে যায় সুতনুকা সেনের ঘুম। কানে আসে গোবিন্দর খুব সফ্‌ট গলাঃ মেমসাব—

ধড়মড় করে উঠে বসে সুতনুকা। ভয়ে আর আনন্দে যুগপৎ সর্বাঙ্গ ঘামে ভেজা এবং উদ্বেল। স্বপ্ন দেখেছিল ঝুমা। পণ্ডিত মশাই, মহাদেব ভট্টাচার্য যাবার পর ঘুমিয়ে পড়েছিল কখন তা সে নিজেও জানে না। তাকিয়ে দেখল টেবিলের ওপর হাওয়ায় পাতা ওড়া, মিডসামার নাইটস ড্রিম। মিড সামার নাইটস ড্রিম তো সুতনুকা সেনের। ঝুমার খালি—দিবাস্বপ্ন।

মুখোস [illegible]গিয়েছিল সুতনুকার। বেরিয়ে [illegible] সুন্দর মুখ। শাওয়ার বাথের পর মুখোস আঁটতে বসল [illegible]বার ঝুমা। সুতনুকা সেনের মুখোসপরা শেষ হলে, গোবিন্দ এসে বলল, জোয়ারদার সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

জোয়ারদার ঘরে এল। সঙ্গে নিয়ে এল পারির সন্ধ্যা। তার সুরভি ঘুরে বেড়াতে লাগল ঘরময়। কী ব্যাপার? হঠাৎ মনে পড়ল বুঝি, টিজিং-এ পটু সুতনুকার দুচোখে কৌতুকের কটাক্ষ বিদ্ধ করল পুরুষ হৃদয় মুহূর্তে। পকেট থেকে একটা ফ্ল্যাপ টেবলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে জোয়ারদার যুদ্ধজয়ের সূচনা ঘোষণা করল।

হিয়ার ইট ইস,—তোমার পাসপোর্ট রেডি—

পাসপোর্টটা আঙ্গুলের ছিপে তুলে নিয়ে চোখ বুলাল সুতনুকা এমন ভাবে যেন সেটা তার বহুবার পড়া বই। মুখে সূচীপত্রায়িত হলো না একবার সমুদ্রপারে যাবার সুযোগের দুর্লভ দ্যুতি।

নভেম্বরে চল। ঘুরে আসি—

নভেম্বরে বিয়ে করছি, যাব কি করে?

কেন? হনিমুন করবে সিন্ধু পারে—

আপনার স্বার্থ কি তাতে?

আই শ্যাল একাম্পানি য়ু,—ছাটস ওল—

ছাটস নট ওল রাইট অ্যাটোল—

কেন?

এ পাসপোর্ট পাওয়া গেলেও, আপনার [illegible] পাসপোর্ট পাওয়া যাবে কি? যাকে বিয়ে করছি, সে বলবে কি?

কিছুই বলবে না, যদি—

যদি?

ইফ হি ইস এ জেন্টলম্যান—

ওই তো ট্রাবল, হি ইস নট এ জেন্টলম্যান—

হোয়াট ডু য়ু মিন?

হাই [illegible] ম্যাম, ভদ্রতায় বিশ্বাস করে না। একটু ইদিক ওদিক হলেই হাত চালাবে—

দেন হি মাস্ট বি এ ব্রুট—

লেডিস লাভ ব্রুটস, আপনি জানেন না?

এই সভ্য যুগেও?

অসভ্য যুগেও মেয়েরা যা ছিল, সভ্য যুগেও মেয়েরা তাই আছে। তারা চিরকাল ভালবাসে লোককে, ভদ্রলোককে শ্রদ্ধা করে—

নামটা শুনতে পারি সেই ভাগ্যবানের?

নিশাকর মজুমদার—

এ ফনি নেম আই মাস্ট সে; হোয়াটস হি এনিওয়ে?

সুতনুকা জবাব দেবার আগেই চৌকাঠহীন এণ্ট্রান্স থেকে উত্তর এল [illegible] এ ভাগাবণ্ড স্যাব টু বি একস্যাক্ট—

নিশাকর মজুমদারের সবল দীর্ঘ শরীর প্রবেশ করল সুতনুকা সেনের ড্রয়িং রুমে। জোয়ারদারের মুখোমুখি দাঁড়াতেই, স্লাইটলি এমব্যারাসড জোয়ারদার বললে: ইনিই নিশ্চয়ই—

সুতনুকা মুক্তোর মত ঝকঝকে হাসল: নিশাকর মজুমদার। আর ইনি—

মুখের কথা মুখেই থাকল সুতনুকার, বাজপাখীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টুক করে নিজের ঠোঁটে তুলে নিয়ে জো রদারের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিল নিশাকর: ওঁর পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। স্বনামধন্য পুরুষ আমাদের জোয়ারদার সাহেব—

খুশির হালকা আভা ছড়িয়ে গেল জোয়ারদারের দুচোখে। সাকসেসের কালো মণিতে আলোর ঝিলিক নিশাকর এবং সুতনুকার চোখ এড়াল না। একটু গ্যাপ দিয়ে নিশাকর বলে বসল হঠাৎ: তারপর মিস্টার জোয়ারদার হাউ ইস ইয়া লেটেস্ট প্লেখিং? —নাজমা?

সুতনুকা লক্ষ্য করল জোয়ারদারের হঠাৎ খুশির ঘুড়ি একটু হেলে

গেল। সে নিশাকরকে বকুনি দেবার প্রিটেনশনে বলল : তুমি কি কোনওদিন ম্যানার্স শিখবে না ?

কেন ?

ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবে কেন ?

ব্যক্তিগত ? কলকাতা শহরে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে জানে না এ কথা যে জোয়ারদার সাহেব তাঁর স্ত্রীকে বাতিল করে দিয়ে নাজমা নামে লাভলি এক যবনীকে বিয়ে করতে চলেছেন ?

আপনি ভুল শুনেছেন মিস্টাব মজুমদার। জোয়াবদার সপ্রতিভ হবার চেস্টা করেন : আমার স্ত্রীই আমাকে ত্যাগ করতে চান—

কেন ?

সে কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করুন—

সুতনুকা আবার মুখ খোলে। ফার্দার প্রোভোক করবার জন্যে, কি, নিশাকরের রাশ টানবার জন্যে সেকথা অভিনয়-পটিয়সীর মুখ দেখে টের পাবার জো নেই। সুতনুকা আঁকা ভ্রূ কুঞ্চিত করে : নিশাকর, দুমদাম করে যা তা বলছ যে, তুমি জানো কি জোয়ারদার সাহেবের কত টাকা ?

এক্স্যাক্ট ফিগার জানি না। সম্ভবত জোয়ারদারও তা জানেন না। তবে এটুকু জানি যে টাকাটার দুয়ানা ওঁর খাটনির রিসাল্ট ; বাকী চোদ্দআনাই পড়ে পাওয়া—

সোজা হয়ে উঠে বসে জোয়ারদার : যদি বলি আপনিও পড়ে পাওয়া চোদ্দআনার লোভেই মিস সেনকে বিয়ে করতে চাইছেন—

তাহলে বুঝব জীবনে এই প্রথম একটা খাঁটি কথা বলতে চাইছেন। —টাকা ছাড়া বিয়ে করার অর্থ কি হয় আর ?

ইটস নট ভেরি ফ্ল্যাটারিং প্রপোজ্যাল ফ মিস সেন, আই থিংক—

শ্রাগ করল নিশাকর মজুম : আই ক্যানট হেলপ ইট—

য়ু মিন টাকা ছাড়া বিয়ে করার কোনও মানে হয় না—

আমার বিয়ে করার মিস সেনকে আর কোনও মানে হয় না—

মিস সেনের কি মানে হয় আপনাকে বিয়ে করার ?

ওর একজন লোক দরকার যে টাকা ছাড়া ওর কাছে আর কিছু চাইবে না—

সেরকম লোক আরও থাকতে পারে—

থাকতে পারে কেন আছেই—

তবে ?

ক্রসওয়ার্ড পাজলে অনেক করেক্ট সল্যুশান এলে কি নিয়ম জানেন ফার্স্ট প্রাইজ দেবার ?

আমি ক্রসওয়ার্ড পাজলে মাথা ঘামাইনি কখনও—

নিয়ম হচ্ছে, যে প্রথম করেক্ট সল্যুশান পাঠায় প্রাইজ তারই

আপনিই প্রথম সেই লোক যিনি মিস সেনকে এই প্রপোস্যাল দিয়েছেন ?

এক্সাক্টলি সো—

কবে বিয়ে হচ্ছে ?

সাতাশে অঘ্রাণ—

অঘ্রাণ ? অঘ্রাণ ? ফাম্বল করে জোয়াবদাব শেষ করেন তাঁর জিজ্ঞাসা : এটা বাংলা কি মাস ?

আপনাকে সাহেব বলে সম্বোধন করে ভুল করেছি এতক্ষণ—

কেন ?

আপনি খাঁটি বাঙালী—

হঠাৎ ?

সেই হচ্ছে আমার মতে যথার্থ বাঙালী, যে—

যে ?

যে বাংলা মাস, তারিখ কোনওটাই মনে রাখে না—

নিশাকর মজুমদারের কথা শেষ হবার আগেই সুতনুকা আর

জোয়ারদারের ডুয়েট অট্টহাস্যে ঘরের সিলিং নেমে আসার জোগাড় হয়।

জোয়ারদার হাত বাড়িয়ে দেয় নিশাকর মজুমদারের দিকে : য়ু হ্যাভ সেড ইট মাই বয়—

নিশাকরের হাত জোয়ারদারের হাতকে ছোঁয় না শুধু, দারুণ ঝাঁকি দেয়। একজন গোটা নির্ভেজাল 'ম্যান'-এর ঝাঁকিতে ভিৎ নড়ে যায় বুঝি কেবল একজন জেন্টলম্যানেরই নয়, অ্যাংগলিসাইসড একটা সমাজেরই পায়ের তলা থেকে সরে যায় অনেকখানি মাটি।

বস্তির অন্ধকারে মুখোমুখী বসে ঝুমা একদিন স্বপ্ন দেখেছিল উজ্জয়িনীর। দিবাস্বপ্ন নয়। স্বপ্ন সার্থক করতে সাধ্য, সাধনা, সাধ,—অভাব ছিল না কোনওটারই। আজ পার্ক স্ট্রীটের অ্যারকণ্ডিসাণ্ড ফ্ল্যাটে আলোর মুখোমুখী বসে সুতনুকা সেন আনমনা হয়ে যায় কখনও কখনও। স্বপ্ন দেখে পঞ্চুর। দিবাস্বপ্ন। মনে পড়ে তার সেই ঝুমা বলে প্রায় নিরক্ষর কিশোরীকে। ক্ষুধার উপকরণ থেকে তাকে স্বপ্নের উদ্দীপনা করে তুলেছিল মিস্ত্রি পঞ্চু। তার প্রথম, তার একমাত্র প্রেম। ঝুমার মাকে ত্যাগ করার মতোই পঞ্চুর মা ফেলে পালিয়েছিল ঝুমার বাবাকে। পঞ্চু ভদ্রলোক হয়ে তাই নেমে গিয়েছিল মিস্ত্রিগিরিতে। ঝুমা বস্তি থেকে উঠতে চেয়েছিল আইসোলা বেলায়। পঞ্চু জীবন দিয়ে জেনেছিল জীবনের কোনও অর্থ নেই। বাঁচার মানে হয় না কোনও। মা মরে যায় কত লোকের, তারা মনে রাখে না সেকথা প্রতি মুহূর্তে। কিন্তু যে মা পালিয়ে যায় বাড়ি ছেড়ে সে মা-কে ভোলা যায় না এক মুহূর্তও। সাকসেস অর্থ, সামর্থ্য, প্রতিপত্তি, আরাম, লেখাপড়া, বুদ্ধি, চেহারা,—কিছু দিয়েই ক্ষতিপূরণ হয় না সেই ক্ষতির। পঞ্চুর মা পঞ্চুকে বাঁচিয়েই মেরে রেখে গেছে।

ঝুমাও ভুলতে পারেনি বাবাকে। মাকে হত্যা করেছে তার বাবা, দুরপনেয় কলঙ্কের মধ্যে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে, মেয়েকে দেয়নি পিতৃপরিচয়ের কবচকুণ্ডল, ঝুমা একথা ভোলেনি। এরই বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবার, সমস্ত সমাজকে ধুলায় লুটিয়ে দিয়ে রুখে দাঁড়াবার দুর্জয় প্রতিজ্ঞার প্রদীপশিখা সারাক্ষণ জ্বলছিল বস্তির অন্ধকারে একটি বছর বারোর কিশোরীর দুচোখে যে তা সে প্রথম

পড়েছিল এবং থমকে গিয়েছিল জীবনে প্রথম দীর্ঘ কালো মজবুত সেই ইস্পাতের নাম পঞ্চু।

গাঙ্গুলীদের বেচে দেওয়া বস্তির পেছনের মাঠে সিনেমা দেখাচ্ছিল বারোয়ারি পূজার পাণ্ডারা। আটানা করে টিকিট। বস্তির সবাই ভিড় করেছিল মাঠে। ঝুমাও গিয়েছিল দিদিমার আঁচল থেকে আধুলি খসিয়ে নিয়ে। দিদিমা ঘুমোচ্ছিল ; টের পায়নি। কিন্তু মাঠে গিয়ে কান্না এসে গেল ঝুমার কালো চোখের কোণে। টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। সবাই হাততালি দিয়ে উঠেছিল ঝুমাকে দেখে। বস্তির ওপর-নীচ ঝেঁটিয়ে এসেছে দুপুর থেকে। রাত নটায় আরম্ভ হবে ছবি। ঝুমার আসতে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল।

টিকিট ঘরের সামনে সাদা কাগজে কালো অক্ষরে দাগানো : হাউস ফুল।

ঝুমার কালো মুখখানা দেখে খুশি হয়েছিল সব চেয়ে বেশি বাসন্তী। তাকে দেখতে নিতান্তই বাজে। দাঁত উঁচু। ময়লা মুখ বসন্তর গর্তে ভর্তি। ঝুমা টিকিট পায়নি জেনেই নেকামি করল সে : ঝুমা, চলো ভেতরে গিয়ে বসি—

আমি টিকিট পাইনি—

'ঝুমা টিকিট পায়নি,' 'ঝুমা টিকিট পায়নি'-র খুশির প্লাবনায় ভরে গেল সন্ধ্যের আকাশ। বস্তিসুদ্ধ বাচ্চা থেকে ধেড়ে সবাই যেন ডবল খুশি হয়েছে। এক তারা টিকিট পেয়েছে, তাই খুশি ; প্লাস,—ঝুমা পায়নি, সেই খুশির ফাউ।

ঝুমা, বারো বছর বয়সে, প্রথম জানল, সে ঈর্ষ্যার পাত্র। সে-ও খুশি হলো একটু।

একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল সতের বছরে বাইশ বছর মনে-হওয়া পঞ্চু। আলো এসে পড়েছিল তার মোষের পিঠের মতো কালো শরীরে। চকচক করছিল পালিশ করা মেহগনি ওভ্যাল মুখ, বড় চোখ, জোড়া ভুরু, ভিশেপ শরীর চেয়ে দেখবার মতো ; হাজার লোকের ভিড়েও

হারাবার মতো নয়। খাকি ট্রাউজার; সাদা শার্ট, পায়ে কাবলি। রীতিমতো লম্বা। হাতের কব্জি, পায়ের ডিম দারুণ। কোঁকড়া কালো চুল কপালের ওপর এসে পড়েছে। দুটো চোখ কেবল ললিতে বিভাসে বলছে, সতের বছরের দুর্বার জীবন-দীপ্তি নেই সেখানে, বাঁচার কোনও মানে হয় না।

ঝুমার চোখে, পঞ্চুর চোখ গিয়ে থেমে গেল। বাঁচার জন্যে দুরন্ত ব্যাকুল দুটো চোখের সঙ্গে অর্থহীন বেঁচে থাকার বিষণ্ণতায় অস্বাভাবিক দুচোখের প্রথম দেখা হলো গাঙ্গুলীদের বেচে দেওয়া বস্তির পেছনের মাঠে। সন্ধ্যার শেষ আলো নিঃশেষে খরচা করে ফেলে আকাশ তখন সূর্যের ধার করা আলোর অপেক্ষায়। অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে আকাশের নীলাম্বরীর গায়ে বসানো চুমকির মতো। সব পাখি ফিরে গেছে · ᳡। সব নদী। শুধু অন্ধকার আলো করে দাঁড়িয়ে আছে ঝুমা।

সেই প্রথম পঞ্চুর মনে হয়। মনে হয় শুধু এই, যে, বাঁচার মানে হয়। আর পঞ্চুর চোখে বারো বছরের কিশোরী যাকে যোড়শী বলে না মনে করে উপায় নেই, হঠাৎ বিস্মৃত হয় তাব প্রতিজ্ঞা। পঞ্চুর চোখে প্রায় নিরক্ষর ঝুমা পড়ে তার সর্বনাশের বার্তা।

সেই সর্বনাশ, যা না ঘটলে জীবনে একবার, জীবনের অর্থ হয় না কোনও!

পঞ্চু ডেকেছিল ঝুমাকে আচমকা ঃ শোনো—

ঘাবড়ে গিয়ে ঝুমা তাকিয়েছিল এদিক ওদিক। হেসে ফেলেছিল পঞ্চু ঃ তোমাকে ডাকছি ঝুমা—

ঝুমা এগিয়ে গিয়েছিল হিপ্নোটাইসড হয়ে ঃ আমাকে ডাকছ? পঞ্চু ঝুমার চোখে চোখ রেখে আবার হাসল ঃ এখানে আর কে আছে, যাকে ডাকা যায়—

আমার নাম তুমি জানলে কি করে ;

সবাই চেঁচাল যে তোমার নাম ধরে—

তোমার নাম কি ?

পঞ্চু—

কিসের জন্যে ডাকছিলে ?

ছবি দেখবে না !

না—

কেন ?

টিকিট নেই—

আমার কাছে আছে—

সেতো তোমার টিকিট—

দুখানা আছে—

দুখানা কিনেছিলে কার জন্যে—

একখানা আমার—

আরেকখানা ?

তোমার জন্যে—

যাঃ। আমি আসব তুমি কি করে জানবে তা ?

জানতাম, দেখা হবে—

কি করে ?

কি করে ? আরেকদিন বলব,—এখন যাবে কি না বলো আমার সঙ্গে—

খুশিতে, লালেতে, ছেলেমানুষিতে উচ্ছ্বসিত ঝুমা হাততালি দিয়ে উঠল। মুখে বলতে হলো না, যাব।

অন্ধকার নির্জনে তার এতদিনকার অভিজ্ঞতায় যাকে অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নিয়েছিল ঝুমা, তা ঘটল না তাঁবুর মধ্যে। পঞ্চু হাত বাড়াল না একবারও ঝুমার দিকে।

পরের দিন সরলা জিজ্ঞেস করল : কার সঙ্গে ছবি দেখছিলিরে কাল ?

পঞ্চুর সঙ্গে—

সে কে? কি করে?

মিস্ত্রি—

জানিস না শুনিস না, হট করে যার তার সঙ্গে ছবি দেখতে গেলি কি বলে?

যাদের জানিশুনি এতকাল তাদের চেয়ে পঞ্চু অনেক ভালো—

কি রকম?

একবারও গায়ে হাত দেয়নি পঞ্চুদা—

এখন দেয়নি। পরে দেবে—

দরজার গোড়ায় কখন পঞ্চু এসে দাঁড়িয়েছিল, সরলা আর ঝুমা খেয়াল করেনি কেউ। পঞ্চু দরজার গোড়া থেকেই বললে: না পঞ্চু কখনই হাত দেবে না তোমার নাতনীর গায়ে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো দিদিমা—

চমকে উঠেছিল ঝুমা: পঞ্চুদা? সরলা সামান্য লজ্জিত হয়: তোমারই নাম বাছা, পঞ্চু?

হ্যাঁ—

তুমি কিছু মনে করনি বাছা, তোমাকে চিনিনা তো, তাই বলছিলাম—

যাদের চেন বলে তোমার মনে হয়, সত্যি করে তাদের চেন কি?

ওমা! দুমুয়ে এককথা যে—

ঝুমাও তাই বলছিলো বুঝি?

সরলা জবাব দেবার আগেই মালিনী মাসী থামায় সরলাকে: তুমি কাজে এসো দিখিনি এখন—

পঞ্চুর সঙ্গে ঝুমাকে কি চমৎকার মানাবে, পুত্রহীনা নারী, মালিনী সেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে ততক্ষণে। সে স্বপ্ন দিনে দিনে তারপর পুষ্পিত হয়েছে পঞ্চুর মনেও। মাতৃলজ্জা বিস্মৃত কর্ণ দ্রৌপদীকে পাবার জন্যে মাছের চোখ বেঁধবার দু'সাধ্য সাধনায় তৈরী করেছে নিজেকে সকলের অজান্তে। সেই সাধনা ব্যর্থ হবার জন্যে যে দায়ী

সে ঝুমা নয়। তার নির্মম নিয়তি। যে নিয়তি জন্মের প্রথম মুহূর্ত থেকে পিছু নিয়েছে পঞ্চুর। মায়ের পালিয়ে যাবার লজ্জা ভুলিয়ে দিয়েছিল যে মেয়ের দুচোখের দুস্তর লজ্জা, আজ সে যখন অর্জুনের গলায় মালা দিতে চলেছে, তখন কোথায় পালাবে পঞ্চু ?

আজ রবিবারের দ্বিপ্রহরে কারখানায় গাড়ির তলায় শুয়ে সেই কথাই পঞ্চু ভাবছিল। তার ভাবনার জাল ছিঁড়ে দিল দুলালের কথার একটি ঢিল : যা হয় একটা কিছু কর—

নিস্তব্ধতার দীঘিতে চক্রাকার কম্পন ছড়িয়ে গেছিল আস্তে আস্তে পঞ্চুর মনের তট পর্যন্ত। পরাজয় অস্বীকার করতে বৃথাই চেষ্টা করেছিল পঞ্চু। বলেছিল : কি আন্‌সান বকছিস ? হিলম্যানের ইঞ্জিনটা নামাবি কি না বল—

না। নামাব না—

গাড়ির তলা থেকে মাথা বার করে এনেছিল পঞ্চু। দুলালকে চটি ছুঁড়ে মেরেছিল শুয়ে শুয়েই। চটিটা লাগে নি। তার মুখের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে এসেছিল পঞ্চু।

তুই কাঁদছিস কেন ?

তোমার চোখে জল নেই বলে—

জল থাকবে কেন শুধুশুধু—

সুতনুকার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে কোন্ উল্লুকের সঙ্গে জানো না ?

জানি।

তবে ?

সুতনুকার সঙ্গে আমার কি ? আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম যাকে, তার নাম ঝুমা,—সে মরে গেছে—

না। তৃতীয় কণ্ঠের তীব্র 'না' শুনে চমকে ওঠে পঞ্চু আর দুলাল দুজনেই। নিঃশব্দে কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সুতনুকা, কেউ টের পায়নি। কারখানা থেকে দূরে গাড়ি রেখে সুতনুকা সেন নয়, ঝুমা হেঁটে এসেছে আরেকবার পঞ্চুর খুব কাছে। তারপর বলেছে

একমুহূর্ত না ভেবে, পঞ্চুর কথার পিঠে বেজে উঠেছে সেকথা বুকচেরা কান্নার মতোঃ না। যে মরবে সে সুতনুকা সেন। ঝুমা বেঁচে রইবে চিরকাল। পঞ্চুর ঝুমা—

দুলাল সরে গেছে তখন; দুজনের জন্যে রেখে গেছে মধুর অবকাশ।

মধ্যদিনে তখন গান বন্ধ 'করে বসেছে পাখি। ওল ইণ্ডিয়া রেডিওর কোলকাতা কেন্দ্রে কোনও রাখাল নয়, নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে, ধুতিপাঞ্জাবি পরা, হঠাৎ ভাগ্যোদয়ে ভরপুর, বঙ্গতনয় বাঁশিতে সবে ধরেছে দীপক। অসীম শূন্যতার অলিন্দে আলোর মুকুট পরে দাঁড়ানো সূর্যদেব সেই দীপ্ত দ্বিপ্রহরে জ্বলে উঠেছে অনেক অন্তহীন দিনের পর দুজনের চোখে। পঞ্চু তাকিয়ে আছে তার ঝুমার দিকে। কে বলবে তাদের দিকে তাকিয়ে, একজন মিস্ত্রি; আরেকজন বস্তিতে মানুষ। কে বলবে এই মিলনের জায়গা, একটা মোটর গারাজ। কে বলবে, বিংশশতাব্দীর বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে তখন। দুজনের চোখে চিরকালের ভাষায় একটিও না বলা কথায় একটি অনন্ত মহূর্ত জন্ম নিয়েছে সেই মাত্র। ঝুমা এসে দাঁড়িয়েছে পঞ্চুর লোমশ বুকের উপর। ঝুমার নিঃশ্বাসে পঞ্চুর বুকের চুল হেলছে-দুলছে। পঞ্চুর দুটো হাত ঘুরে এসেছে ঝুমার পিঠে। অক্টোপাস জড়িয়ে ধরেছে মৎস্যকন্যাকে। দুটি আঙুলের হলকা লেহন করছে পরস্পরকে। চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ছে। প্রতি লোমকূপে দুজনের বিদ্যুতের কণা ফুটে বেরিয়েছে। হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে। সময় চলতে চলতে থেমে গেছে কারখানার ভেতর বহুক্ষণ। হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি স্তব্ধ। দুটি রক্তের একটি মাতাল নদী বয়ে চলেছে শিরা উপশিরায়। দুজনের বুকে কান পেতে দুজনেই শুনছে, শরীরের বেহালায় কামনার ছড় আলাপ করছে সেক্স। তার মূর্ছনার প্রতিলিপি পড়তে হলে যেতে হবে প্রাচীন মন্দিরে। জীবন দেবতার দরজায় যেখানে চিরকালের জন্যে উচ্চারিত

যৌবনদেবতার বন্দনা। প্রতি অঙ্গের জন্যে প্রতি অঙ্গের কান্নাই, পরমাত্মার জন্যে জীবাত্মার কান্নার প্রতিধ্বনি। একটিকে বঞ্চিত করে আরেকটি পাওয়া যায় না। দুপাখায় যে ওড়ে সেই কেবল আকাশকে পায়। তারই নাম বিহঙ্গ। সেই বিহঙ্গের গান কারখানার ময়লা বাতাসে এই প্রথম বাজালো নিরুপম, নির্লজ্জ, নগ্ন অন্ধকার। দিনের কড়া আলোয় সেই প্রথম রজনীগন্ধার চোখ ফুটল।

মূর্ছা ভাঙ্গাল পঞ্চুই। মূর্ছনার জাল শব্দের তরঙ্গে ছিন্নভিন্ন করল সে। ঝুমাকে জিজ্ঞেস করল জোর করে: বিয়ের নেমন্তন্ন করতে এলে বুঝি?

নাহলে তোমার কাছে আসব কেন?

নেমন্তন্ন না করলেও যেতাম—

সে তো ঝুমার কাছে, এ নেমন্তন্ন তো করতে এসেছে সুতনুকা—

না। আজ যে এসেছে সে সুতনুকা নয়; ঝুমাই সে—

তবে যে বলছিলে দুলালকে, ঝুমা মরে গেছে?

দুলালকে বলছিলাম কান্না আটকাবার জন্যে, এখন যাকে বলছি তার কাছে তো আমার মুখোস আঁটতে হয় না। সেই তো একমাত্র লোক এই পৃথিবীতে যে আমার মুখ দেখতে পায়; যার কাছে আমি এই শহরের সেরা মোটর গারাজের মালিক নই,—আমি সেরেফ মিস্ত্রি পঞ্চু—

আর সে?

সে-ও শুধু আমার কাছে, আমার কাছেই কেবল টলিউডের মুকুটহীন সম্রাজ্ঞী নয়, সে আমার বস্তির বন্ধু ঝুমা,—আমার একার—

পঞ্চুর শেষ কথাটার ওপর বৃষ্টি নামল। গ্লিসারিনে ভেজা সুতনুকার আইল্যাশ থেকে নয়; ঝুমার দারুণ কালো, দারুণ গভীর দুটো চোখ দিয়ে গড়িয়ে এল জল। পঞ্চুর বুকের লোমে টপ টপ করে পড়তে লাগল ঝুমার কালো চোখের কান্না। রৌদ্ররুক্ষ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল রাত্রির কালো চোখ থেকে কয়েক ফোটা শিশির বিন্দু।

দীর্ঘ, দীর্ঘদিন ধরে যাকে অস্বীকার করেছিল, সেই ঝুমাকে আর আটকে রাখতে পারা গেল না কিছুতেই। জমাটতুষার গলে গেল জানবার আগে। আবেগে, কান্নায়, অভিমানে, অনুরাগে টলমল করতে লাগল দুটি হৃদয়। কাজের মধ্যে দিয়ে যাকে ভুলতে চেয়েছিল পঞ্চু তার পাগলামো আজ দ্বিগুণ শক্তিতে আঘাত করল কালাপাহাড়কে। দুজনের কারুর মুখ দিয়ে শব্দ বেরুল না একটাও। বেরুল ভোলার বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা ভালোবাসার দুরন্ত দামাল নদী! সিন্ধুর উদ্দেশে তার এগিয়ে যাবার স্পর্ধাকে বাধা দেবে এমন শক্তি তখন বিধাতারও হাতের বাইরে।

কান্নায় বুজে যাওয়া গলা দিয়ে পঞ্চুর অস্ফুট উচ্চারিত হলো শুধু ঃ সোনার হরিণের পেছনে দৌড়চ্ছ তুমি, রাবণ তোমার চুলের মুঠি ধরে তুলে না নি[illegible] যায়, এই শুধু আমার ভয়—

আমার ভয় নেই একটুও, ঝুমা নির্ভয় হাসল ঃ রাবণ ধরে নিয়ে গেলেও আমায় ছুঁতে পারবে না। অশোকবনে অপেক্ষা করব, যে আমায় উদ্ধার করতে আসবেই একদিন, তার, জন্যে ;—তবুও—

তবুও ?

তবুও, সোনার হরিণ আমার চাই—

কেন ?

আমার মায়ের প্রেমকে যে পথের ধুলোয় নামিয়ে [illegible]য়ে গেছে, তাকে, সেই সমাজকে, নিজের হাতে হত্যা করব আমি—

তারপর ?

তারপর আইসোলাবেলা থেকে বস্তিতে ফিরব আবার—

পঞ্চু জবাব দিল না কথার। হাসল কেবল। ঝুমা জিজ্ঞেস করল ঃ হাসলে যে ?

এম্‌নই—

না। এম্‌নই নয়। কেন হেসেছ বলব।

বলো—

বস্তি থেকে ইচ্ছে থাকলে আইসোলাবেলায় ওঠা যায়, কিন্তু আইসোলাবেলা থেকে স্বেচ্ছায় কেউ বস্তিতে ফিরে আসতে পারে না, এই তো ?

হ্যাঁ। এই—

যদি তোমার কথা সত্যি হয়, তাহলে এবারে তোমাকে পাওয়া গেল না—

তার বদলে যা পাওয়া যাবে তা দিয়ে এই না পাবার কষ্ট ভুলতে পারব আমরা ?

না—

তবে ?

ওই দুঃখই আমাকে মোশান পিকচারের আর তোমাকে মোটার মেরামতের মিস্ত্রি থেকে আর্টিস্ট করবে !

অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি তোমাকে কি দেবে ?

মাতৃঋণ শোধ করবার সুযোগ দেবে আমাকে। সে সুযোগ আমি চাইই—

পঞ্চুর মনে এলো কথাটা। মাতৃঋণ শোধ করা যায় না,—এই কথাটা। তবুও মুখে এল না কিছুতেই। এবারে হাসলও না সে।

ঝুমা কিন্তু হাসল। পঞ্চুর মনের অস্পষ্টতম ছায়াপাঠ করতে তার মন কখনও ভুল করে না। হাসির রেখা ঠোঁটের ফ্রেমে ধরে রেখেই বলল: মাতৃঋণ শোধ করা যায় না, জানি। যেটুকু যায় সেটুকু না করার সান্ত্বনা ওই কথায় নেই—

সমাজকে কলুষিত করে কি মাতৃঋণ শোধ হবে ?

কলুষিত করেই তাকে আমি নিষ্কলুষ করব,—এ আমার রোখ। আমার আর কিছু নেই, এই রোখটুকুই আছে। এই রোখই আমায় বস্তি থেকে এখানে এনেছে, এই রোখই আমাকে আইসোলাবেলায় পৌঁছে দেবে। এই রোখই আমাকে রক্ষা করবে রাবণের লালসা থেকে,—

কিন্তু যেদিন সব পাবে তুমি, মাতৃঋণ শোধ করবার তৃষ্ণা মেটাবার সব উপায়, সেদিন যা তুমি পাবে না, তার মূল্য শোধ হবে কি দিয়ে?

আমার জীবন দিয়ে—

দ্বিপ্রহরের দিবাকর কখন পায়ে পায়ে এসে পৌঁছেছিল দৈনন্দিন অবসর-এর সন্নিকটে, টের পায়নি ঝুমা। খেয়াল হয়নি পঙ্কুর। ছায়ার ঘোমটায় দিনের আলোর অনেকখানি ঢাকা পড়ে গেলেও, আবো কতক্ষণ ওরা দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে ভুলে থাকত এটা কাবখানা, বলা শক্ত। কিন্তু দুলাল এসে ঢুকল হইহই করতে করতে। একগাদা খাবার আর ট্রে হাতে দুলালকে চুমু খেয়ে ফেলতো পঙ্কু, ঝুমা না থাকলে। সাংঘাতিক ক্ষিদে পেয়েছিল তার।

খেতে খেতে পঙ্কু জিজ্ঞেস করে ঝুমাকে: এই, কথায় কথায় ভুলে গেছিলাম, তোমার বিয়েব চিঠি কই?

তুমি যে বললে নেমন্তন্ন না কবলেও আসবে—

আহা, তার জন্যে চিঠি দেবে না তুমি? অন্তত হাতে নিয়ে দেখি, সুতনুকা সেনের বিয়ের চিঠি সুতনুকা সেনের মতোই দেখতে হয়েছে কি না?

সুতনুকা ভ্যানিটির থলেতে হাত ঢুকিয়ে দিল। এটা ওটা বেরুল, কিন্তু পঙ্কুর ধৈর্য মানল না: চিঠি কই? আননি তো'

না। খোঁজা থামিয়ে সুতনুকা বলে।

কেন?

কারণ, চিঠি ছাপা হয়নি, তাই—

ছাপা হয়নি তোমার বিয়ের চিঠি? স্ট্রেঞ্জ! হোয়াই?

সিম্পলি বিকস,- -ঝুমা সাসপেন্স ক্রিয়েট করে সুতনুকার চেয়েও স্লাইটলি মোর ইনট্রিগিং, হঠাৎ থেমে গিয়ে তারপর পরিষ্কার করে কুয়াশা এক ঝলক হেসে: ছাপা হয়নি বিয়ের চিঠি তার কারণ আমার বিয়ে হচ্ছে না—

হোয়াট,—বাঘের থাবা এসে পড়ে টেবলের ওপর। পায়ের তলায় মাটি পর্যন্ত কেঁপে যায়। মাথার ওপর টিন পর্যন্ত কেঁপে ওঠে ঃ নিশাকরের সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে না ?

কারুর সঙ্গেই তোমার ঝুমার বিয়ে হচ্ছে না—

জল দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল দুলাল। কথাটা কানে যেতে এবাউট টার্ন করল সে। হাততালি দিয়ে উঠল বাচ্চা ছেলের মতো। মুখ দিয়ে বেরুল ঃ হুররে !

অব্যক্ত আনন্দ মুখ চেপে ধরল পঞ্চুর। মনের অবস্থা লুকোবার জন্যে দুলালের ওপর রাগের প্রিটেনশনে গাল পাড়ল ঃ তুমি চিল্লাচ্ছ কেন শালা ?

আমার খুশি।—দুলাল আজ ডোণ্ট কেয়ার করে জ্যান্ত সিংহকেও। সে জানে, লায়ন-টেমার রাশ ধরে আছে।

তবে রে ?—চটি তুলল পঞ্চু। হাতটা ধরে ফেলল ঝুমা ঃ ওকে কিছু বোলো না—

কেন ? বলব না কেন ? কিরকম বাড় বেড়েছে, দেখেছ ?

দেখেছি—

তবে ?

ওর চেয়ে বড় বন্ধু, তোমার-আমার আর কেউ নেই—

একটা গাড়ির আড়ালে ভ্যানিস হয়ে গেছে ততক্ষণে দুলাল। দারুণ অবাক হয়েছে সে। জীবনে লাঞ্ছনা তার ভাগ্যে কম জোটেনি। চায়ের দোকানে বয়ের কাজ থেকে পঞ্চুর অ্যাসিস্ট্যাণ্টের কাজ তক ক্ষতচিহ্নে তার পৃষ্ঠদেশ যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়ে বিধ্বস্ত অনেক বেশি। কিন্তু কখনও চোখে জল দেখেনি কেউ। আজ এ কি হোলো ? গালে হাত দিয়ে মুছল চোখের জল। আবার গড়িয়ে এল কান্না। দুঃসহ দুঃখের চেয়ে দুর্বহ আনন্দের অশ্রুজল যে অনেক বেশি অবাধ্য কে জানত !

কিন্তু পঞ্চু তার কে ? ঝুমা বিয়ে করলে কি না করলে পঞ্চুর

এসে যায় হয়ত। কিন্তু তাতে দুলালের কি? পঞ্চু তো তার মনিব ছাড়া কেউ নয়!

চুলে টান পড়ায় চেঁচিয়ে উঠতেই দুলাল দেখে পঞ্চুর হাতের মুঠো। ছাড়ো—

না। এখন তোকে কে বাঁচায় দেখি? ঝুমা চলে গেছে—

ছাড়ো। মুরোদ বোঝা গেছে তোমার—

কি বললি?

বললাম, তুমি মানুষ নও, গাড়ি মেরামত করতে করতে তুমিও যন্তর হয়ে গেছ—ছেড়ে দেয় চুল পঞ্চু। দুলাল এগিয়ে যায়।

সেই মুহূর্তে সেখানে তৃতীয় দৃষ্টি উপস্থিত থাকলে চলে-যাওয়া দুলালের দিকে তাকিয়ে মনে হতো তার, দুলাল পঞ্চুর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট নয়। পঞ্চুর আর ঝুমার মাঝখানে যে বিপুল বিচ্ছেদের নদী, দ্য গ্রেট রিভার অভ লাইফ, দুলাল তার জীবন্ত প্রতিবাদ। এ গ্রেট চ্যালেঞ্জ।

সকাল বেলায় সুতনুকা সেনের ভিসিটার্স রুমে যে কেউ দৈবাৎ হাজির হলে তার মনে হতো দিগ্বিজয়ী কোনো সম্রাটের দরবার বসেছে বুঝি। মন্ত্রী, সান্ত্রী, কোটাল, অমাত্য, ভিক্ষু সবাই খাড়া আছে। কারুকে তার প্রার্থনা মঞ্জুর করছে সুতনুকা। কারুর অ্যাপ্লিকেশনের বিচারের ডেট পডছে নতুন করে। ডিরেক্টর নিশীথ সেন বসে আছে প্রভুভক্ত কুকুরের মতো। কখন এক টুকরো মাংস অর্থাৎ একটা ডেট ছুঁড়ে দেবে মিস সেন। আর সেইটা নিয়ে ছুটবে প্রগ্রেসিভ স্কুলের নিও-র্যালিস্তিক ছবি করে হালে পানি না-পাওয়া বেকার ডিরেক্টর নিশীথ। সুতনুকা সেনের ডেট পেলে তবে ডিস্ট্রিব্যুটার টাকা দেবে; শুটিং চালু হবে তবে। মহরত করে বসে আছে বেচারা নিশীথ সেন কবে থেকে। ডেট দেবার আগে টিস করতে, ইনসালট করতে কসুর করে না সুতনুকা সেন। জিজ্ঞেস করে ঠোঁটের কোণে হাসির ছুরির খাপ একটু খুলেঃ মুক্তধারার কি হলো? আপনার অশ্রুধারা রোধ করতে পারল না বুঝি?

মুক্তধারা হচ্ছে ডিরেক্টর নিশীথ সেনের পরিত্যক্ত প্রগ্রেসিভ ছবির গালভরা টাইটল। ডিস্ট্রিব্যুটার সাফ বলে দিয়েছে, সুতনুকা সেনের ডেট যদি নিয়ে আসতে পারেন আর গল্প যদি সুতনুকার মনোমত হয় তবে ছবি হবে আর না হলে বন্ধ রইবে কাজকারবার সব। সুতনুকা সেন জেনেই কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেয়। জ্বলে যায় নিশীথের ঘায়ের মুখ। মুখে তবু যন্ত্রণার একটা রেখাও পড়ে না। সুতনুকা সেনের চেয়ে কিছু কম অভিনয় করতে হয় না নিশীথ সেনকে। ঘরসুদ্ধ লোক নিশীথের অভিনয়ে মুখ টিপে টিপে

হাসে। মুখব্যাদান করে হাসে না কেউ। অতীত অভিজ্ঞতায় তারা জানে এহাসি তাদের ঘুঁটে পুড়ছে দেখে গোবরের হাসির চেয়ে কিছু কম ট্রাজিক হবে না।

সুতনুকা সেন নির্বিকার। আরেকটু খেলায় অল্পজলের সফরীকে : আমাকে নিতে হলে কিন্তু রঞ্জন গুপ্তর গল্প নিতে হবে—

রঞ্জন গুপ্ত ? গোয়েন্দা গল্পের লেখক ? এতকাল রঞ্জন গুপ্তকে দিনে একবার গাল না দিলে যাদের ভাত হজম হয় না তাদেরই একজন নয় কেবল সর্বাগ্রজন ছিল নিশীথ সেন। যেখানে সেখানে বলে বেড়িয়েছে রঞ্জন গুপ্তের নামে। এখন সেই রঞ্জন গুপ্তকেও গিলতে হবে সুতনুকা সেনের কারণে। তবুও। তবুও টু শব্দ করল না নিশীথ সেন। শুধু জিজ্ঞেস করল : রঞ্জন গুপ্তর কোন্ বইটা ?

বসন্তসেনা বলে বইটা, অজিত চৌধুরী কিনে রেখেছে। ওর কাছে যান, বলুন দেব ডেট জুলাই-অগস্ট পুরো দুমাস। সেপ্টেম্বরে আমি বিলেত যাব,—একমাস শুটিং বন্ধ থাকবে—

আপনি বোম্বে যাচ্ছেন কবে ?

কাল।

তাহলে ?

তাহলে আবার কি ? বোম্বেতে ছাব করব বলে কলকাতার ছবি বন্ধ থাকবে কেন ? তাছাড়া বোম্বের ছবি জুনে শেষ হয়ে যাবে। নাহলে ওরা অপেক্ষা করবে বিলেত থেকে ফেরা পর্যন্ত। জুলাই-অগস্ট এ দুমাস আপনাকেই দেব শুধু—যান।

নিশীথ সেন দৌড়তে আরম্ভ করে। ছমাস স্ট্রাইকের পর কারখানা চালু হবার খবরে দৌড়য় যেমন হাংরি লেবরার, তার চেয়েও দ্রুততর স্পীডে।

নিশীথ সেনের চলে যাবার ছবি ফেড আউট করবার আগেই হেসে ওঠে সুতনুকা সেন। কই মাছকে আরও কদিন জিইয়ে

রাখবার পুলকে সেই হাসিতে ঝিলিক দিয়ে ওঠে সকাল বেলার রোদ। পার্ষদদের মুখ ঈষৎ গম্ভীর হয়। নিশীথ সেনটা আবার বেঁচে যাবে বেশ কয়েক বছরের জন্যে। ভাল লাগছে না তাদের। রঞ্জন গুপ্তের গল্প, সুতনুকার নাম নায়িকার রোলে, ছবি পর্দায় লাগবার আগেই বক্স অফিস হিট। এবং তারপর আরও তিনখানা ছবি অন্তত নিশীথ সেনের কব্জা থেকে বার হওয়া মোর অর লেস অ্যাস্যুর্ড।

আম-দরবার ভাঙল যখন, তখন অনেকেরই উৎসাহের বেলুন চুপসে রুগ্ন ঝিঙে হয়ে গেছে যে সুতনুকার চোখ তা মিস করল না। নিজেদের কাজ হয়নি বলে নয়, অন্যের একটা মস্ত কাজ হয়েছে বলেই আম-দরবারের আজ এহেন দুরবস্থা। নিজের নাক কেটে যাত্রা ভঙ্গ করতে বেরিয়ে, প্যাঁজ পয়জার দুই জোটার দুর্ভাগ্য তাদের নতুন নয়, আম-দরবারী কারুর মুখেই সে বার্তা সুস্পষ্ট মুদ্রিত কই? তাদের মুখ দেখে মনে হয়, কে তাদের রঙ্গমঞ্চে ঢুকিয়ে দেবার মুহূর্তে মুখোস কেড়ে নিয়েছে।

এই একই মেয়েকে রাত্রির নির্জন নগ্ন অন্ধকারে দেখতে পেত যদি কেউ তাহলে সে জানত, সুতনুকা সেন কারুর ঈর্ষার নয়, সকলের করুণার পাত্র। দুধের চেয়ে অনেক সাদা, মাখমের চেয়েও অনেক নরম বিছানায় সুতনুকা সেনকে দেখলে মনে হতো, কাণায় কাণায় ভরা কান্নার সরোবর বুঝি শুয়ে আছে একা। বাইরে থেকে দেখলে সুতনুকার এই মুখ, এই কান্না চোখে পড়বে না কারুর। কাজের মধ্যে তাকে দেখলে মনে হবে মানুষ নয়; সুতনুকা মেসিন। তার বাড়ি, তার গাড়ি, তার চলা, তার বলা, তার ছায়া পর্যন্ত সাকসেসের পর সাকসেসের মাইলস্টোন। মাঝখানে কোন নম্বর পড়ে যায়নি। একটানা সাফল্য। বিরতিহীন গতি তার এখন আর বিস্ময়েরও উদ্রেক করে না। যারা ঈর্ষা করত, মনে মনে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করত সুতনুকা-পতনের অত্যুগ্র বাসনায়, তারাও জেনে গেছে, সাকসেস

আর সুতনুকা সেন,—ওরা সহোদর নয় কেবল; ওরা যমজ। একেকে আরেকের মতই দেখতে অবিকল নয় শুধু; ওরা এক এবং অবিচ্ছেদ্য। তাই সুতনুকার খ্যাতির মুকুটে নতুন কোনও পালখ উঠলে আর চোখ তুলে তাকায় না কেউ। মনে মনে ভগবানের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়,—একজন মানুষকে এমন অঢেল আশীর্বাদের কোনও অর্থ হয় না। ঈশ্বর পক্ষপাতশূন্য,—এর চেয়ে অসত্যভাষণ আর হতে পারে না, এই হচ্ছে তাদের মনের কথা।

সুতনুকা সেন যখন কাজের মধ্যে থাকে তখন সত্যি সত্যি তাকে বোঝা শক্ত। একটা জীবন্ত আগ্নেয়গিরি থেকে ছিটকে ছিটকে পড়ছে কর্মের লাভাস্রোত। অর্জুনের চোখ থেকে বিশ্বসংসার বিলুপ্ত হয়েছিল মাছের চোখ বিদ্ধ করার মুহূর্তে। সাফল্যের মণ্ডচক্ষু ভেদ করার সাধনায় সুতনুকা সেনেরও ক্লান্তি নেই। সামান্য একটা কি দুটো কথা, কখনও কখনও কথাও নেই, কেবল চেয়ে থাকা, সেই দৃশ্যেও সুতনুকাকে দেখে মনে হয় ঠিক মতো টেক না হলে মরে যাবে বুঝি সুতনুকা। তার সমস্ত ভবিষ্যৎ যেন ঝুলছে এই মুহূর্তের ওপর। ভাবা যায় না, কোনও নামকরা শিল্পী এমন নীচু হতে পারে, সাধনার কাছে লুটিয়ে দিতে পারে এমন নিজেকে। কথা বললে তখন কথা কানে যায় না। মনে হয় স্বপ্নাচ্ছন্ন সেলফ হিপ্নোটাইসড সুতনুকা সেন। ভেতর থেকে কার নির্দেশে অভিনয় করছে সে। চেষ্টাকৃত অভিনয় নয়। অটোঅ্যাকটিং।

আর এই সুতনুকাকেই রাত্রির অন্ধকারে নিঃসঙ্গ বেদনায় কি অসহায় লাগে যদি কোনও অন্ধ অনুরাগী অথবা জন্মবিদ্বেষী কেউ দেখত তাহলে সে বুঝত, খ্যাতি আর ঐশ্বর্য কি বৃথা, কত তুচ্ছ, জীবনের চরম পাওয়া থেকে নিজেকে স্বেচ্ছায় সরিয়ে নেবার যাতনায় রক্তাক্ত ঝুমার কাছে। যে পাখীর জন্যে খোলা ছিলো অসীম আকাশ, ডানার ওপর রাগ করে সে পাখী যখন নিজেকে বন্ধ করে খাঁচায় আর খাঁচার বাইরে থেকে পুরুষবিহঙ্গ যখন কেঁদে কেঁদে ডেকে ফিরে যায়

তখন যে দুঃসহ গুমোটে ছটফট করে একটি একাকীতম পাখী তারই নাম তখন সুতনুকা সেন।

ঘুম ভেঙ্গে যায় থেকে থেকেই। পঞ্চু ডাকে ঘুমের মধ্যেই, এসে দাঁড়ায় মনের জানলা ধরে। বলে, ওই নরম শয্যায় তুষের আগুনে জীবনভোর জ্বলে কি পাবে তুমি। উঠে এসো ওই নরক থেকে। চলো যাই বস্তিতে ফিরে যেখানে তুমি আর আমি একা। দেখা যদি পেয়েছি দুজনে দুজনের তবে কোন অভিমানে, কিসের প্রলোভনে দুজনে দুজনকে পাবার দুর্বহ আনন্দের দুঃসহ যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি চাইব? কেন? কেন? কেন?

দিদিমা জিজ্ঞেস করে বন্ধ দরজার ওপার থেকে! ঝুমা? ঘুমুবি নি?

এই ঘুমুই,—আলো নিবিয়ে দেয় সুতনুকা সেন। আর আলো জ্বলে ওঠে ঝুমার মনে। সেই আলোয় পঞ্চুর সব সময় হাসছে আর ভালোবাসছে চোখ দুটো হাতছানি দেয়। তুচ্ছ করে এই আরাম, অস্বীকার করে সমাজ-সংসার, বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে খাঁচা ভেঙ্গে, আবার ওই আকাশের আল ধরে হাঁটতে চায় মন, পঞ্চুর হাত ধরে। মনে মনে চুঁইয়ে পড়ে সময়ের হৃদয় গলানো ভালোবাসার উত্তাপে উচ্চারিত সেই লাইনটা: নীল মেঘ কি নিবিড় দেখা প্রয়োজন।

পঞ্চু মিস্ত্রিকেও কাজের সকালে কেউ দেখলে বুঝতে পারবে না লোকটা কাজ করে কেবল ভুলে থাকার জন্যে। ঝুমাকে ভুলবার জন্যে কাজ করে পঞ্চু। কাজ শেষ হয়, ভোলা হয় না কেবল ঝুমাকে, যত বেশি কাজের মদে নিজেকে চুবোয় তত বেশি করে ধাক্কা খায় পঞ্চু মিস্ত্রি। দ্বিগুণ জোরে ডাকে তার নাম ধরে ঝুমা। কি হবে এই সাকসেসে? জীবনের চরম ফেলিঅরেকে অস্বীকার করা গায়ের জোরে, এর চেয়ে হাস্যকর ট্রাজিডি আর কি হতে পারে? দ্রৌপদীকে না পাওয়ার মুহূর্তে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত হবার অগৌরব, —কর্ণের এই নির্মম নিয়তি পঞ্চুরও আজন্ম সঙ্গী। ঝুমাকে যদি

না পাওয়া গেল জীবনে, আকাশ যেমন করে পায় ভোরের আলোকে, তাহলে খ্যাতি আর ঐশ্বর্যের তারার দীপ জ্বেলে কি হবে আর ?

নিজের ব্যর্থতাকে ঢাকতে গিয়ে তাকে আরও আলোকিত করা ছাড়া ওই দুটি দীপ্ত তারার কাজ কি তবে ?

তবু ভুলে থাকা। তবু মজে থাকা কাজের নেশায়। কাজ, শুধু কাজ। দিনের আলো ফুরিয়ে এলে আপাত অন্তহীন কাজ বাধ্য হয়ে আপাতত বন্ধ হয়। যে যার চলে যায় দিনের হিসেব চুকিয়ে দিয়ে। মুখোমুখী হয় দুলাল আর পঞ্চু। দুলাল হঠাৎ জিজ্ঞেস করে এক টাকা দশানা হবে তোমার কাছে ?

একটাকা দশানা ? কেন রে ?

দড়ি আর কলসি কিনব তোমার জন্যে ?

অপমান করছিস ?

তোমাকে অপমান ? কার সাধ্য করে ? অপমান তো পুরুষের হয়—

সব জেনে তুইও আমায় বলবি একথা ?

সব জেনেই তো বলব। না জানলে তো বলতাম তুমি কর্মবীর—

সুতনুকা আমার কে ? তার কাছে আমি যাব কেন ?

ঝুমা তোমার কেউ নয় ? তার কাছে যাবে না কেন ?

ঝুমা আজ সুতনুকা সেন হয়েছে, ডাকলেও শুনবে না আমার কথা—

ঝুমা তোমার কাছে ঝুমাই আছে। ডাকলে যে শুনবে না সে সুতনুকা সেন। পঞ্চু ডাকলে সাড়া না দিয়ে উপায় নেই যার, তার নামই ঝুমা—

সারা রাত না ঘুমোবার পর স্টুডিও ফ্লোরে যখন এসে ঢোকে সুতনুকা সেন তখন তার চোখ কালো সূর্যকাচে ঢাকা। মুখ ফোলা ফোলা সুতনুকার। কে যেন বলে : কাল খুব ঘুমিয়েছিলেন বুঝি ?

খুব—

ঘুমিয়েছিলে, না, কেঁদেছিলে?—চমকে কাচঢাকা খুলে ফেলে সুতনুকা। ওঃ তুমি? মায়া দেবী ছাড়া একথা সুতনুকাকে বলে টলিউডে এমন আর কে আছে? মায়া দেবী সুতনুকাকে যা ইচ্ছে তাই বলে। সুতনুকা শোনে চুপ করে। কোন জন্মে, মায়া দেবী, যার আসল নাম চম্পকলতা, যেন তার দিদি ছিল। যেদিদি এবারে থাকলে,—ঝুমার পঙ্কুকে পেতে দেরি হতো না একমুহূর্তও।

মেক আপ রুমে সুতনুকা বলে মায়া দেবীকে: কাঁদব কার জন্যে?

যার জন্যে জীবনে একবার অন্তত কাঁদার মানে হয়। সুতনুকা সেনের হয় না; ঝুমার হয়। সারা জীবন কাঁদার মানে হয়—

সুতনুকার চিবুক তুলে ধরে মায়া দেবী। ঝুমার চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে সুতনুকার মুখোস। সে চোখে গ্লিসারিন নেই। একটুও নেই।

আকাশের দিকে তাকিয়ে, পঞ্চুর ওখান থেকে ফিরে, চুপ করে বসেছিল যে, সে সুতনুকা সেন নয়; ঝুমা। গোটা আকাশটা আজ জ্যোৎস্নার ঝিল। সেই ঝিলে ঝুমার মুখ দেখছিল সুতনুকা সেন একবার। আরেকবার সুতনুকা সেনের মুখ দেখছিল ঝুমা। পঞ্চুর কথাগুলো চাবুকের মতো এসে পড়ছিল পিঠে। কি পাবে, কি পাবে, সুতনুকা সেন যেদিন পৌঁছবে আইসোলাবেলায়। মধ্যরাত্রির মেঘবিরল আকাশে মুখ টিপে হাসছিল পূর্ণচন্দ্র। ঝুমার মনের আকাশেও এই মাত্র ফেটে পড়েছে পূর্ণিমা। কি আছে ওই মোটার গ্যারাজের প্রায় নিরক্ষর মালিক যার আসল পরিচয় মিস্ত্রি বই কিছু নয় তার মধ্যে? চেহারাটা দৈত্যের মতো; রূপকথার রাজপুত্তুরের মতো নয়। লেখাপড়া এখন সুতনুকার পায়ের নখের যোগ্যও নয়। টাকা? সুতনুকা সেনের সম্ভাবনার সামান্য ভগ্নাংশও কি? তবে?

কামিনীফুলের গন্ধে চমক লাগা রাতে পুরোনো দিনের স্মৃতি এসে দাঁড়িয়েছিল মনের জানলা ধরে। বহুযুগের ওপার থেকে বস্তির একটি ভুলতে না পারা দিন এসে পৌঁছেছিল সেইমাত্র পায়ে হেঁটে। পার্ক স্ট্রীটের এয়ারকণ্ডিশনড্ ফ্ল্যাটে ছেঁড়া ময়লা পরিচ্ছদে বস্তির সেই দিনটি প্রবেশ করতে পথ পাচ্ছিল না, সুতনুকা সেন তাকে হাত ধরে টেনে এনে কাছে বসাল। সেদিনের মুখ তার মনে আজও টাটকা ঘায়ের মুখের মতোই দগদগে। ভারি ভালো লাগছিল আজ পেছনের দিকে তাকাতে। বস্তির অন্ধকার ভয়ঙ্কর সেই মুখ আজকের প্রসাধিত জীবনের উজ্জ্বল আনন্দের চেয়ে কত বেশি দুর্বার

আকর্ষণের ছিল সেকথা সেদিন একবারও মনে হয়নি। সেদিন কেবল মনে হয়েছে দারিদ্র্যের কুৎসিত কালো অন্ধকার ওই বিবর থেকে কতক্ষণে বেরুবে রৌদ্রস্নাত রাজপথে। যেপথ দিয়ে সে একদিন পৌঁছবে আইসোলা বেলার চূড়ায়, যেখানে দাঁড়ালে তারার আলোর আগুন মনে হয় ধরে যাবে চুলে। নিরবধিকাল ধরে বয়ে যাওয়া জীবনের নদীর ওপার সেদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, এপারে সকল সুখ,—এই তার বিশ্বাস। আজ, সেই এপারে উত্তরণের সোনার তরীতে যখন পা দিয়েছে সুতনুকা সেন, তখন কেন মুখর হলো ওপারে ফেলে আসা দুঃখের দিনের জন্য স্মৃতির কেকা ওই!

কে জানে, পঞ্চুর কথাই ঠিক কি না,—'সুতনুকা সেন কোনওদিন তা পাবে না ঝুমা যা অনায়াসে পেতে পারত।'

যতবার পঞ্চুর কথায় মিইয়ে যায় সুতনুকা সেন, ততবার বস্তির একটি দিনের কথা মনে করে জেগে ওঠে ঝুমা। না। পঞ্চুর কথা ঠিক নয়। টাকা, সেক্স, মৃত্যু,—জীবনের তিন নির্মম সত্য শুধু এই। ভালোবাসা, ভয় আর ভগবান,—তিন মনোহর মিথ্যে জীবনের। নাহলে কেন গাঙ্গুলীদের বেচে দেওয়া পাঁচ নম্বর বস্তির নরকে পচে মরবে ফতিমা বানু। কি পাপ করেছিল তাজমহল টি এস্টেটের ম্যানেজারের অপুত্রক বিবি ওই ফতিমা। একমাত্র অপরাধ তার এই ছিল যে একটি দরিদ্র ঘরের এক পাল ছেলের মধ্যে একটি,—গণেশ ভদ্রকে সে পুষ্যি নিয়েছিল। লোকে বলেছে, ফতিমার মুখেও শুনেছে ঝুমা কতবার নিশ্চয়ই এই শাস্তির প্রয়োজন ছিল তার। খোদা যা করেন তা ভালোর জন্যেই করেন, ফতিমার এই বিশ্বাস পাঁচ নম্বর বস্তির নরক-পালও কেড়ে নিতে পারেনি বৃদ্ধার অন্তর থেকে। কিন্তু ঝুমা সেদিনও যেমন আজও তেমনই জানে ওকথা কতদূর মিথ্যে। রবি ঠাকুরের জীবনের ধন কিছুই যাবেনা ফেলা, জীবনে যে 'সাকসেস' তার মুখে মানায়। যে ফেলিয়ার তার মুখে ও কোটেশন তো ফ্রাস্টেশনের

পচা শবের দুর্গন্ধ দুর্বোধ্য বাণীর কুয়াশায় মোড়া ইভনিং ইন্ প্যারিস টেম্পরারি সুরভি দিয়ে ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা।

গণেশ ভদ্রকে পুষ্যি নিয়েছিল ফতিমা বিবি,—একথা বললে ফ্যাক্ট স্টেট করা হয়ত হয়, কিন্তু বেয়ার ফ্যাক্টই হয়,—গণেশের জন্যে তৃষিত মাতৃ-হৃদয়ের উজাড় করে নিজেকে ঢেলে দেবার চেহারার এতটুকুও আভাস দেওয়া যায় না। নিজের ছেলে না হলেই হয়ত ওরকম মা হওয়া যায়। গণেশকে যখন তার বাবার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন ফতিমা তখন গণেশ ফুটফুটে একরত্তি ছেলে। ভালো করে কথা বেরোয় না। গাল টিপলে দুধ বেরোয় না, রক্ত ফেটে পড়ে গালে। দুধে-আলতায় গোলা রং হয় সেই গালের। আবার টিপতে ইচ্ছে করে একটু বাদে। গণেশ অনেক বড় হয়ে তবে জেনেছিল ফতিমা তার মা নয়, সে হিন্দুর ছেলে। ফতিমা তাকে কেড়ে নিয়েছিল বটে তার মা-বাবার কাছ থেকে কিন্তু তাকে মানুষ করেছিল মুসলমানের বাড়িতে হিন্দুর মতো করেই। ঘরে হিন্দুদের দেব-দেবীর ছবি থেকে শুরু করে, পড়াশুনো আচার-বিচার হিন্দুত্বের গায়ে হাত দেয়নি কখনই।

নিজেদের সমাজের সবাই ক্ষুণ্ণ হয়েছিল বিধর্মী সমাজের সন্তানকে নিজের ছেলের মতো মানুষ করার কারণে, ফতিমার ওপব। ফতিমা সেই অপ্রীতি ঝেড়ে ফেলেছিল মন থেকে গায়ে ধুলো লাগলে যেমন ভাবে ঝেড়ে ফেলে সবাই তার চেয়েও অনায়াসে। কান দেয়নি কারুর কথায়। গণেশ যদি মুসলমান হতো তাতে ফতিমার মন সে কিছু বেশী কাড়ত না। পাশের বাড়ির এই বাচ্চাটাকে জন্মাতে দেখেছে সে। একপাল ছেলে নিয়ে নিকটতম প্রতিবেশী। দরিদ্র স্কুল মাস্টার অন্নদা ভদ্র হিম সিম খাচ্ছিলেন। ফতিমার প্রস্তাবে আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন তিনি। মুসলমানের বাড়িতে ছেলেকে পুষ্যি দিতে লাগতে পারত যাঁর, অন্নদা গৃহিণী, তিনি উদুরিতে ভুগে মারা গেলেন আরও সন্তান ও আরও দারিদ্র্যের হাত থেকে।

ফতিমার হাতে গণেশকে লিটারালি গচিয়ে দিয়ে অন্নদা ভদ্র বাকী পোলাপানদের নিয়ে কোথায় গা ঢাকা দিলেন তা পাওনাদারকুলের কাক-পক্ষীতে পর্যন্ত টের পেল না।

তাজমহল টি এস্টেটের ম্যানেজার আকবর বানুর কাছে গণেশ হিন্দু না মুসলমান,—এপ্রশ্ন ওঠেনি কখনও। নিঃসন্তান ফতিমার রুদ্ধ আবেগ উদ্বেলিত হবার উৎস তাঁর কাছে জাতিধর্মের চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। গণেশ ভদ্রকে ভালো লেগেছিল তার চেহারা জ্যোৎস্নার মতো ফুটফুটে একারণে নয়। কিংবা গণেশ ভদ্রর বাবা দরিদ্র ও সন্তানবহুল,—একটি ছেলেকে পুষ্যি নিলে তাঁর ভার লাঘবই হবে বরং এ আঙ্কিক নিয়ম মেনেও একাজ করেননি তিনি। করেছিলেন যাঁর মুখ চেয়ে সেই ফতিমা গণেশকে ভালোবাসত। সেইটেই যথেষ্ট বড় কারণ ছিল। অন্য যুক্তি তর্ক সুবিধা-অসুবিধার কথা অর্থহীন।

কোনো এক সময় আকবর বানু তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ফতিমা বানুর নামে লিখে দিলেন। ফতিমা বানু তৎক্ষণাৎ তা ট্রান্সফার করে দিলেন গণেশের নামে। কেউ কেউ বারণ করেছিল যে বৃদ্ধ বয়সে নিজের জন্যে কিছু না রেখে সব সম্পত্তি পোষ্য ছেলেকে না দেওয়াই কর্তব্য। ফতিমা বলেছিলেন গণেশ তাঁর নিজের ছেলে হলে তিনি শুভানুধ্যায়ীদের কথাটা ভেবে দেখতেন। কিন্তু গণেশ তাঁর নিজের ছেলের চেয়েও বেশি। যদি ফতিমাকে সে দুমুঠো খেতে না দেয় দুবেলা তাহলে তিনি জানবেন সে দুর্ভাগ্য তাঁর নসিবে ছিল। গণেশকে সমস্ত সম্পত্তি লিখে না দিলেও অন্য কোনও ভাবে ওই একই হালে গড়াতেন তিনি। কথাটা সবাই ভুলে গিয়েছিল। মনে রেখেছিল দুর্ভাগ্যর দেবতা। আকবর বানু মারা গেলেন রহস্যজনক ভাবে এক রাতে। আকবর বানুর দাসীর কথা যদি মানতে হয়, না সেকথা না বলাই ভালো, তাহলে গণেশ ভদ্রই তার জন্য দায়ী। তাকে যদি বেনিফিট অভ ডাউট দেওয়া যায় এ

ব্যাপারে তবুও একথা না বলে উপায় নেই যে আকবর বানুর পারলৌকিক কার্য সম্পর্কে তো বটেই, শেষকৃত্যও গণেশ ভদ্র করেনি। তাজমহল টি এস্টেটের মালিকরা খবর না পেলে তাঁদের প্রিয় ম্যানেজারের কবরের কি হতো বলা শক্ত।

আর তারপরেই ফতিমার ওপর গণেশ ভদ্রর আচরণে বোঝা গেল সে আর যাই হোক ভদ্র নয়। কলকাতায় গাঙ্গুলীদের পাঁচ নম্বর বস্তিতে এসে উঠতে হলো একদিন তাজমহল টি এস্টেটের ম্যানেজারের বিবিকে। তাঁর শেষ গয়নাটা গণেশ হাতাবার পর নিজের বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে তিনি এলেন এই বস্তিতে। তার আগে টুকিটাকি যা জিনিস ছিল তা বেচে বেচে নিজের সামান্য খরচা তিনি চালিয়েছেন।

ঝুমার বয়স তখন কত হবে, বারো প্লাসও নয়। গেঁথে আছে মৃত্যুশয্যায় শায়িত ফতিমার সেই কথাটা। তাজমহল টি এস্টেটের একজন কর্মচারী এসেছিল সাহায্য নিয়ে। ফতিমা বিবি তাকে বলেছিলেন: গণেশকে, দেখা পেলে বলো ঠিক সময়ে যেন খায় দায়, ওর শরীরে অনিয়ম সয় না।

নশ্বর পৃথিবীতে অবিনশ্বর একটি মানুষের এই ছিল শেষ কথাও বটে। এর পর বাক রোধ হয়ে ফতিমা বিবি মারা যান ওই বস্তিতেই।

ঝুমা সেদিনই প্রথম সুতনুকা সেন হবার স্বপ্ন দেখে। না। স্বপ্ন নয়। প্রতিজ্ঞা করে, ফতিমা বিবিকে ভাগ্য যা থেকে বঞ্চিত করেছে, ভাগ্যের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেবে ঝুমা। হার মানবে না। হার মানাবে সবাইকে। ভালোবাসা, পাপপুণ্যের ভয়, ভগবান মানবে না সে। অর্থ, খ্যাতি, কামনা, এই তিন সত্যকেই কেবল স্বীকার করবে।

সেই প্রতিজ্ঞা থেকে এক পা নড়েনি এখনও পর্যন্ত সুতনুকা সেন।

আরও একটি ঘটনা, একটি দুর্ঘটনা, ওই বস্তিতেই তার মনে

চিরস্থায়ী কীর্তির চিহ্ন রেখে গেছে। তখন আরও বছর দুই বেড়ে গেছে তার বয়স। পঞ্চু এসে গেছে; প্রিন্স আসব আসব করছে। বস্তিতে একটি ষাট বছরের বুড়োর পায় লুটিয়ে পড়েছে সবাই তখন। সাধু পুরুষ। বস্তির লোকেদের নৈতিক উন্নতির জন্য শহর কলকাতার প্রাসাদ ছেড়ে এসেছে পর্ণ কুটিরে। বস্তির দরজায় তার জন্য যেসব গাড়ি এসে দাঁড়ায়, সেই সব গাড়ি থেকে নেমে আসে যারা তারা কোন্ কল্পলোকের বাসিন্দা কে জানে। দামী পাথরে তারা ঝলমল করে। হাসলে তাদের দাঁত থেকে মুক্তো ঝরে, কাঁদলে মনে হয় হীরাপান্নার ফুল ফুটছে। সেদিন জানত না, আজ জেনেছে সুতনুকা। অমন হাসি শুধু ফল্‌স টিথেই হাসা যায়; ওরকম মুহূর্তের মধ্যে কান্না গড়ানো চোখের কর্ম নয়,—গ্লিসারিনের কীর্তি।

সেই ষাট বছরের ঋষিতুল্য মানুষটির ঘরে গিয়েছিল ঝুমা একদিন। মনে তার পাপ ছিল। ভয়ে তার বুক টিপটিপ করছিল। একটু বাদে ঘর থেকে বেরুবার সময় ঝুমার হাসিতে বস্তির অন্ধকার আলো হয়ে গিয়েছিল। আড়ি পাতলে কেউ, সে শুনতে পেত, ষাট বছরের বুড়ো কিশোরীর হাত ধরে বলছে; কাউকে বলো না।

ঘর থেকে বেরিয়েই সেকথা ঝুমা মালিনী মাসীকে বলেছিল। মাসী,—এরকম অভিজ্ঞতায় জীবনে অনেক অভ্যস্ত যে, সে পর্যন্ত চোখ কপালে তুলেছিলঃ বলিস কি মেয়ে?

ঝুমা হাসছিল এতক্ষণ। এবার হাসি চেপে দারুণ গম্ভীর হয়ে বলেঃ ঠিকই বলি মাসী। সব লোকের মুখই—আসলে মুখোস!

পঞ্চুর মুখও কি তাই? এখনও পর্যন্ত ব্যতিক্রম কেবল পঞ্চু! কী চায় সে? কী পাবে সুতনুকার কাছে আর? না। সুতনুকার কাছে তো পঞ্চু কিছু চায়ই না। যার কাছে চায় তার নাম তো ঝুমা। ভুলেই গিয়েছিল সেই কিশোরীর নাম, সুতনুকা সেন আজকে। ঝুমা মরে গেছে। পঞ্চুর পথ থেকে সুতনুকার পথ বেঁকে গেছে অনেকদূর। সুতনুকার ফুলে ঝুমার পূজো সম্ভব হবে না আর। তবু। তবু পঞ্চুর

কথা মনে করে, ওই অক্ষমতার ব্যথা দেখে মন উদাস হয়ে যায় সুতনুকার। প্রতিজ্ঞা শিথিল হয় সুতনুকা সেনের। মনে হয় হঠাৎ, ভুল সব ভুল। এই খ্যাতি, অর্থ কামনা নিয়ে কি করবে যদি ঝুমার জন্য পঞ্চুর, পঞ্চুর জন্য ঝুমার সব কান্না ব্যর্থ হয়ে যায়। সুতনুকা সেন তো আলেয়া ; আলো তো সেই ঝুমা।

মনের বেহালায় ব্যথার কাঁপনের সুর কেটে যায় জোয়ারদারের গাড়ির তীক্ষ্ণ হর্নের আওয়াজে। সুতনুকার সামনের টেবলে বিছিয়ে দেয় কয়েকখানা শাড়ি জোয়ারদার। শাড়ির দামের কোনো টিকিট খোলা হয়নি। জোয়ারদার যাই হোক, শাড়ীগুলো যা-তা নয়। সাড়ে তিন হাজার টাকা দামের শাড়ির দিকে একবার তাকায় সুতনুকা। আরেকবার জোয়ারদারের মুখের দিকে। সুতনুকার বিয়ে হচ্ছে না নিশাকর মজুমদারের সঙ্গে,—এ খবর কনফারমেশনেরই কৃতজ্ঞতার বাহন এই শাড়ি।

আরও একটি গাড়ির হর্নে চমকে উঠলেন জোয়ারদার। এবাড়িতে পায়ে হেঁটে এসে কেউ সামনে দাঁড়ালেও তিনি চোখে নেন না তার উপস্থিতি। গাড়িতে এলে উৎকর্ণ হন। ধৈর্য কথা শোনে না। জানলার পর্দা খুবই ঈষৎ ফাঁক করে তাকান। তারপর বলেন সুতনুকাকেঃ এই লোকটাই কি সব উদ্ভট ছবি করে না ?

সুতনুকা তাঁর কথা কানে নেয় কি না বোঝা শক্ত। তার মুখ দিয়ে শুধু বেরোয়ঃ মাণিক্য ?

মাণিক্য মিত্র,—চলচ্চিত্রে নূতন যুগের, সুতনুকার ভাষায়, নতুন হুজুগের ক্রিয়েটর। হঠাৎ সুতনুকা সেনের বাড়িতে কেন ? সুতনুকা সেন তো বক্স অফিস, আর মাণিক্য তো প্রেস্টিজ মেকার। দুয়ের মধ্যে যত তফাত এত ফারাক বো আসমান-জমিনেও নেই। তবে ?

জোয়ারদার প্রস্থান করল রঙ্গমঞ্চ থেকে; প্রবেশ করল মাণিক্য মিত্র। একা।

মাণিক্য মিত্র চলে যাবার পর কতক্ষণই বা হবে, ফোন ডাকল: আমি অজিত চৌধুরী—

জানতাম—

কি জানতে?

তুমি ফোন করবে—

বাজে কথা বলো না—

তুমি বাজে কথা বলো না। মাণিক্যকে কে পাঠিয়েছিল এখানে?

মাণিক্য? মাণিক্য কে?

আচ্ছা! মাণিক্য মিত্রকে ফোন করে বলি যে অজিত চৌধুরী তার নাম শুনে আকাশ থেকে পড়ার ভান করেছে—

মাণিক্যকে আমি পাঠিয়েছি, একথা মনে করবার কারণ?

কারণ দিলে,—মানবে?

মানব—

মাণিক্যকে জিজ্ঞেস করলাম—এ ছবির প্রডিউসার কে? মাণিক্য বলল—এখনও কথা পাকা হয়নি। হলে বলব—তাতেই বুঝলাম—

হয়েছে, হয়েছে। হার মানলাম—, এখন বলো, মাণিক্যকে কেমন লাগল?

সব শেয়ালের এক রা শুনলাম। একটু লম্বা,—এই যা—

কি করে বুঝলে?

যা করে বরাবর বুঝি। হাঁটুতে হাঁটু দিয়ে চাপ দিলাম,—হাঁটু সরাল না একবারও। পাঁচ মিনিটের কথা বলতে এসে পঞ্চান্ন মিনিট কাটিয়ে গেল। আর কি প্রমাণ চাও?

মানুষকে এত অবিশ্বাস কোর না। জানো, রবি ঠাকুর বলেছেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ?

ঠাকুরবাড়িতে জন্মালে বলা যায়। বস্তিবাড়িতে বড়ো হলে বলতেন,—মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখা পাপ—

থাক, থাক, ওসব কথা। এখন বলো, মাণিক্যের ছবিতে কাজ করতে আপত্তি নেই তো?

আমি পেশাদার আর্টিস্ট। টাকা পেলে কারুর ছবিতেই আপত্তি নেই—খাঁটি বা ঝুটো মাণিক্য সে যে-ই হোক। আপত্তি কেবল ওঁর একটি কথায়?

কি কথায়?

ওঁর ছবিতে কাজ করার সময় অন্য ছবির কাজ করতে পারব না—

তুমি ভুল করছ ঝুমা—

কিছুই ভুল করছি না—

মাণিক্যের ছবিতে নামলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের পুরস্কার তুমি পেতে পার—

পেতে পার না,—পাবই। যে কোন লোকের ছবিই তার জন্যে যথেষ্ট—

এত অহঙ্কার?

এত নয়,—বল এতটুকু?—মাণিক্য মিত্রের যেমন প্রাইজ ছবি করবার জন্যে বক্স-অফিস আর্টিস্ট দরকার হয় না। তেমনই বেস্ট অ্যাকট্রেস এওঅর্ড পাবার জন্যে সুতনুকা সেনেরও প্রেস্টিজ মেকারকে দরকার হবে না।

দম করে রিসিভার নামিয়ে দেয় সুতনুকা। সুতনুকা সেন।

দারুণ খুশী হয় অজিত চৌধুরী। মাণিক্য মিত্রের 'জবাব' এতদিনে খুঁজে পেয়েছে সে। যথার্থ জবাব! মাণিক্যের জন্যে কি না করতে পারত অজিত চৌধুরী। লোকটা যত বড় চিত্র পরিচালক, ঠিক ততখানিই ছোটো মানুষ।

সুতনুকা সেন মাণিক্য ছাড়াই প্রাইজ পাবে,—বেস্ট অ্যাক্ট্রেস-

এওঅর্ড,—যেদিন, সেদিনটা যতখানি সুতনুকা সেনের,—ততখানিই অজিত চৌধুরীর হবে।

সুতনুকা সেন ছায়াছবির অভিনেত্রী না হয়ে নেতৃস্থানীয় কেউ হলে তার সারাদিনের কাজকর্মের ফিরিস্তি খবরকাগজের কলাম হতো; আলাপ অথবা তর্কের হতো মুখরোচক বিষয়। সকাল বেলায় হিন্দি শেখা। দশটা থেকে শুটিং। সন্ধ্যে বেলায় গানের গলা সাধা। সপ্তাহে দুদিন নাচের ট্রেনিং। ভোর রাতে উঠে যৌগিক ব্যায়াম,—শীর্ষাসন। কখনও কখনও সারারাত ধরে কোনও ডিফিকাল্ট রোলের একা একা মহলা দেওয়া। এর মধ্যে জোয়ারদার নবারুণকুমার, প্রোডিউসারদের আসা-যাওয়া, সবাইকে সব কিছুকে সামলাতে হয়। সত্যি সত্যি, মরবার সময় নেই সুতনুকা সেনের এখন। মৃত্যুদেবতাকে দুয়ার হতে দণ্ডায়মান দেখলে জোড়হাত করে সুতনুকাকে বলতে হবেঃ মরবার সময় নেই এখন; একটু দাঁড়াও। ওপরের তালিকা ছাড়াও রয়েছে ইনকাম ট্যাক্সেব ঝামেলা, একটি ভাইকে মনের মতো করে মানুষ করা। নিজের ভাই নয়; তবু ভায়ের চেয়ে বেশি,—গাঙ্গুলীদের পাঁচ নম্বর বস্তিতে পাশের ঘরে থাকত বরাবর ঝুমাদের। সবাই বলতো খোঁড়া অম্বর। স্লাইট খুঁড়িয়ে চলত ছেলেটা। ঝুমা যেদিন সুতনুকা সেন হলো সেদিন থেকেই খোঁড়া অম্বর জীবনে চলবার শক্ত ক্রাচ পেল সেই প্রথম। পড়াশুনোর এমন আকুল তৃষ্ণা সুতনুকা কারুর মধ্যে দেখেনি। পাঠ্য বইয়ের নয়; অ-পাঠ্য বইয়ের। সুতনুকার নিজের ভাই থাকলে সুতনুকা যা করত খোঁড়া অম্বরের জন্যে সে যা করে তা তুলনায় অনেক বড়ো। তার কারণ, অম্বর খোঁড়া বলে নয়, তার কারণ, অম্বর তার নিজের ভাই নয়। নিজের ভাই হলে সে সুতনুকার টাকায় ছিনিমিনি খেলত। নিজের ভাই নয় বলেই অম্বর অতি কুঁকড়ে থাকে কৃতজ্ঞতায়। পরের ক্রাচ বলেই খোঁড়া পা চলে পদস্খলন বাঁচিয়ে।

সময় হয় না কেবল স্নুতনুকার নিজের দিকে তাকাবার। সংসারে সকলেরই প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন নেই কেবল স্নুতনুকা সেনের। বিশ্রামের প্রয়োজন নেই, নেই হৃদয়ের দাবি। শুধু অভিনয় করে যাও। টাকা, টাকা. আরও টাকা। অজস্র, অফুরন্ত কুবেরের ঐশ্বর্য এনে জমা করো মাটির তলায় চারের কালো তিন ভাগ। এক ভাগ সাদা রাখো ব্যাঙ্কে। স্নুতনুকা জেনে গেছে, এই পৃথিবীর তিনভাগ জল, আর এক ভাগ ব্ল্যাক মার্কেট। মা, না, দিদিমা সরলা, যেদিন স্নুতনুকা ঝুমা ছিল, সেদিন যত কাছে ছিল তার আজ ঠিক ততখানিই দূরে। ঝুমা যখন থেকে স্নুতনুকা সেন হতে আরম্ভ করেছে ঠিক তখন থেকেই মালিনী মাসীও আর মনের কথা জানতে চায় না ঝুমার। গাঙ্গুলীদের বেচে দেওয়া পাঁচ নম্বর বস্তির কেউ কেউ আসে প্রত্যেক মাসের পয়লা। স্নুতনুকা সেনের সঙ্গে তাদের দেখা হয় না। দেখা হয় স্নুতনুকার কর্মচারীর সঙ্গে। মাসোহারা নিয়ে তারা প্রকাশ্যে মঙ্গল, মনে মনে স্নুতনুকার মুণ্ডপাত করে। স্নুতনুকা তা জানে। তবু স্নুতনুকা যে মাসোহারা বন্ধ করে না তার কারণ স্নুতনুকা মহিয়সী মহিলা বলে নয়, স্নুতনুকা দিয়ে স্যাটিসফায়েড হয়। সে স্যাটিসফ্যাকশন,—পিতৃ-পরিচয় দিতে না পারা একজনের দারুণ আত্মতৃপ্তি, পিতৃ-পরিচয় আছে এমন অনেককে দয়া করতে পারার দারুণ জ্বালাকর উপশম।

মাণিক্য মিত্র চলে যাবার পর, অজিত চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ফোন রেখে দেবার পর, একা বসেছিল স্নুতনুকা অনেক্ষণ। একটু দীর্ঘ বিরল একটি একাকীতম পাখী হয়েছিল স্নুতনুকা। শীতের হাওয়া ছুটে এসেছিল হঠাৎ, মনের যত টুকরো, তাকে ছড়িয়ে এলোমেলো করে দিতে; ভাসিয়ে দিতে শুকনো পাতার স্রোতে। একখানা চিঠি হাতে করে বসেছিল স্নুতনুকা। ঝমাকে লেখা পঞ্চুর প্রথম চিঠি। সে চিঠি আজও পড়া শেষ হয়নি ঝুমার। কতদিন আগের লেখা তার প্রমাণ চিঠিতে আছে; মনের কোথাও

নেই। মনে কেবল আছে এইটুকু,—সে আরেকযুগের, অন্য এক কালের সখা তার পঞ্চুর। আজও তার একার।

অজস্র বানান ভুলে ভরা অক্ষর সব বাঁকা। চিঠির আরম্ভে ঝুমার নামটুকুও ছিল না। পঞ্চু ভেবে উঠতে পারেনি, কি নাম দেবে; কি নাম দেওয়া যায়। বিদ্যেয় কুলোয়নি বলে নয়; নার্ভাসনেসে। নার্ভাস হয়েছিল ঝুমাও। পঞ্চু কোনওদিন চিঠি লিখবে তাকে ভাবতে পারেনি ঝুমা। সেই অভাবিত ঘটনা যখন ঘটল তার অনেক আগে পঞ্চুর সঙ্গে তার আলাপ, অনেকবার দেখা, অনেক অনেক কথা হয়েছে। মনের কোণে ভীতু একটা আশা কখনও দেখা দিত কখনও অসম্ভব কুয়াশায় ঢেকে যেত কালোয়। সেই কালোয়, একটি চিঠির কয়েকটি কাঁপা বাঁকা বাঁকা অক্ষরে, কি ছিল কে বলবে, আলো হয়ে গিয়েছিল সমস্ত হৃদয় ভোরের আকাশের মতো। সে আলো আজও মনের পড়ে আসা বেলায় ম্লান হয়নি এতটুকু। চিঠিতে কিছুই ছিল না। ঝুমা পর পর পাঁচ হপ্তা পঞ্চুর সঙ্গে দেখা করেনি। তাই নিয়ে অভিযোগ। না। তাই নিয়ে অভিমান। চিঠিটা প্রত্যেকবার হাতে নিয়ে বসে বটে সুতনুকা। তবু তা খুলতে হয় না একবারও। তার প্রত্যেকটি অক্ষর রেডিয়মের মতো আজও সাফল্যের অন্ধকারে ব্যর্থতার মতো জ্বলে। প্রচুর বিত্তের রক্তাক্ত ঘায়ের মুখে সে চিঠি আজও ছুঁচের মতো বিঁধে আছে। ঝুমার বুক থেকে কোনওদিন তাকে আর তুলতে পারবে না সুতনুকা সেন। যেদিন মরে যাবে সেদিনও রক্ত ক্ষরিত হবে অন্তস্তলে। বাইরে থেকে কেউ টের পাবে না। ঈর্ষা করবে সাফল্যের চুড়ায় পৌঁছে সুতনুকার স্বেচ্ছামৃত্যুকে। আত্মহত্যা ছাড়া ঝুমার বাঁচবার পথ নেই যে, তা যে জানে, সেই সুতনুকা সেনকে জানে না কেউ। না। জানে। যে একজন জানে সেও জানেনা যে স্বেচ্ছামৃত্যুর মুহূর্তে যাকে খুঁজবার জন্যে টেলিফোন হাতে কথা বলবার আগেই কথা বন্ধ হয়ে যাবে চিরকালের মতো সুতনুকার, সে পঞ্চু। লোকে বলবে,

বাঁচবার শেষ আকুল তৃষ্ণায় সুতনুকা সেন ডাক্তারকে ফোন করতে চেয়েছিল। কাগজে লিখবে, হিরোইন হবার বেলা পড়ে আসছিল বলে সুতনুকা সেন স্যুইসাইড করেছে। সে কথাটা কেউ বলবে না, যেকথা জানবে না কেউ, সেই একজন ছাড়া। সেই একজন যার বুকে মাথা রেখে ঝুমা বাঁচতে পারত, মরতে চাইত না সুতনুকা সেন।

সুতনুকা সেনকে জোব করে সেই পারত বুকে টেনে নিতে। না। সুতনুকা সেনকে নয়। ঝুমাকে! ঝুমাকে বাঁচাতে পারত শুধু সে ই সুতনুকা সেনের অপমৃত্যু থেকে। মায়ের প্রতি বাবার অন্যায়েব শোধ নিতে গিয়ে, নিজের ওপর, আর সেই একজনের ওপর, যে অন্যায় ঝুমা করেছে, তার সব দেনা থেকে শোধ করতে হবে সেচ্ছ...ভুল প্রায়শ্চিত্তে তাব জন্যে সেদিন পঞ্চুর বুকও শূন্য হয়ে যাবে না? তবে কেন? কেন? কেন? কেন পঞ্চু তবে তার গায়ের জোরে সুতনুকা সেনের চোরাবালি থেকে ঝুমাকে টেনে তুলল না!

সেই অব্যক্ত ইতিহাস সুতনুকা সেনের কোনও জীবনীতে কোনওদিন পাওয়া যাবে না। সে কথা মরে গেলেও যারা কেউ কারুর কাছে স্বীকার করবে না তারা মিস্ত্রি আর বস্তির পঞ্চু আর ঝুমা নয়। তারা অটোকিওরের মালিক পি-কে, এবং বক্সঅফিস সাকসেস,—সুতনুকা সেন।

তাদের কথা আজ প্রথম নয়, আজ আবার শীতের হাওয়ায় হঠাৎ ছুটে এল, গানের বেলা শেষ না হতে হতে। মনের কথাব টুকরো তারা ভাসিয়ে দিল আজ শুকনো পাতার স্রোতে।

একটি যুগের ওপার থেকে এসে দাঁড়াল আজ আবার সেই মুহূর্তটি। দুষ্মন্তর শকুন্তলাকে চিনতে না পারার সেই অভিশপ্ত গোধূলি। ঘড়ির কাঁটা অবশ্যই গোধূলি পার হয়ে গিয়েছিল। পঞ্চুর বাড়িতে ঝুমা সেদিন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পঞ্চু বলেছিল: আর না। এবার বাড়ি যাও—

'আর না,'—পঙ্কুর মুখের এই দুটো কথা যে তার মনের কথা নয় ঝুমার চেয়ে তা বেশি কে জানত! তবুও ঝুমা বসেনি। পঙ্কু কি বলে ফেলেছে, পঙ্কু যা বলতে চায়নি, পঙ্কুর চেয়ে বেশি তা কে জানত! তবুও, পঙ্কু ঝুমাকে আটকায়নি।

দুর্বাসার অভিশাপ মূর্ত হয়েছিল কয়েকদিনের মধ্যে। ঝুমার কাছে এসেছিল সুতনুকা সেন সাজবার প্রথম প্রস্তাব। সেদিন দেখা করায় বাধা ছিল। লাজে ভয়ে ত্রাসে আধো বিশ্বাসে আধোখানি ভালবাসার দিনে ঝুমা ভাবত আর একদিনের কথা, যেদিন দুজনের মধ্যে দেখা হতে বাধা থাকবে না কোনও। কত কথা কত কল্পনাতীত কল্পনার অবাধ আসা যাওয়া ছিল দুটি বিরহবিষণ্ণ হৃদয়ের বাতায়নে। আজ যখন দেখা হবার বাধা দূর হয়েছে, তখনই দূরে গেছে, অনেক দূরে বেঁকে গেছে দুজনের পথ।

দুর্বাসার অভিশাপ-মুক্ত দুষ্মন্ত-শকুন্তলার দেখা হয়েছিল আবার। পঙ্কু আর ঝুমারও দেখা হবে আবাব। সুতনুকা সেন স্বেচ্ছায় মরবে সানন্দে। কিন্তু পঙ্কু? পঙ্কু কি জানবে সেদিন, যে মরেছে সে সুতনুকা সেন। ঝুমা মবে গেছে,—একথা যে কত মিথ্যে,—সুতনুকা সেনের মৃত্যুতে পঙ্কু সেদিন তা জানবে। সেইদিন পঙ্কুর,—'আর না' বলার শোধ নেবে সুতনুকা সেন। না। সুতনুকা সেন নয়; পঙ্কুর ঝুমা—

কৃষ্ণকান্তের উইল ছবিটা ঠিক এই সময়ে ছবির পর্দায় দেখা দিয়েই চায়ের কাপে তুফান তুলল। বই, লেখক, পরিচালক নিয়ে সেই বিতর্কের ঝড় বইল না। আলোড়নের মক্ষীরাণী হলো সুতনুকা সেন। রোহিণী এবং ভ্রমরের দ্বৈত ভূমিকায় তার অভিনয়ের

যৌক্তিকতা, সাফল্য এবং অনিবার্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। একদিন যা কেবল মাণিক্য মিত্রর ছবির বেলায় বাঁধা ছিল, সুতনুকা সেনের অভিনয় প্রসঙ্গে তা প্রথম মাথা তুলল। এতদিন সুতনুকা-নবারুণ-কুমার তারকায়িত ছবির পক্ষে বক্স-অফিস ষণ্ডের চক্ষু বিদ্ধ করার ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় চোখ বন্ধ করে করা যেত। মাণিক্য মিত্রর ছবির প্রাইজ পাওয়ায় আর সুতনুকা-নবারুণকুমারের ছবির সুপারহিট হওয়ায় সাপ্রাইজ ছিল না আর কিছু। কতবার প্রথমে মনে হয়েছে সুতনুকা-নবারুণকুমারের ছবি আর সে ডিভিডেণ্ড দেবে না। কাগজে কাগজে ছবির গল্পকে গালাগাল দেবার পর দেখা গেছে বছরের সর্বাধিক বিক্রীত ছবির শিরোপা ওই যুগলের ছবির কপালেই জুটেছে। প্রমাণ হয়ে গেছে যে লোকে ছবি দেখতে যায় না, গল্প শুনতে যায় না, যায় সুতনুকা আর নবকুমার অভিনীত চরিত্র দুটি কেমন করে প্রথমে ঝগড়ার মধ্যে দিয়ে কাছাকাছি আসে, তারপর দুর্বিপাকে দুজনে দুজনের থেকে দূরে চলে যায় এবং ছবি শেষ হবার মুহূর্তে বিরহ মিলনে প্রত্যাবর্তন করে অলিখিত নির্দেশ হাসিতে বিজ্ঞাপিত করে যে They lived happily ever after। আবাল-বৃদ্ধবনিতারা একদল নিজেকে নবারুণ, আরেকদল নিজেকে সুতনুকা অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে আইডেন্টিফাই করে মনোমৈথুনগত সুখ পায়। সেই সুখ এই প্রথম চিড় খেল।

সুতনুকা সেন এই প্রথম নবারুণকুমারকেও সরিয়ে দিল সকলের মন থেকে। একা রইল ছবির এবং দর্শকদের মনের পর্দা জুড়ে। তার প্রথম রিয়্যাল রোল। দুটি ভিন্ন চরিত্রে একই সঙ্গে অবতরণের দুঃসাহসে দীপ্ত সুতনুকা এতদিনকার সুতনুকা সেনকে এক ধাক্কায় স্থূল সাকসেসের চূড়ো থেকে ফেলে দিল। দাঁড় করিয়ে দিল মাটিতে। বিতর্কে রৌদ্ররুক্ষ সমালোচনার মাটিতে। হাসি দিয়ে, ঢলে পড়ে, গদগদ হয়ে কিংবা ন্যাকামি বা কটাক্ষে দশানার দর্শকদের জগৎ ভিনি-ভিডি-ভিসি নয়। প্রত্যেকটি মুহূর্ত অভিনয়ে ভরে

দিল। কখনও রোহিণীর কামনায় কালো বাসনা রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়, আবার তার পরের মুহূর্তেই ভ্রমরের ভালোবাসার অতল থেকে উঠে আসা ভর্ৎসনা: বিনা দোষে তুমি আমাকে ত্যাগ করলে…, ছিঁড়ে দিল স্থূলতার জালকে। যারা পুরোনো স্বতনুকাকে আশা করে গিয়েছিল তারা হতাশ হলো। যারা পুনরাবৃত্তির আশা করে এসেছিল হাসবে বলে তারা অবাক হলো। স্বতনুকা সেন যে সিয়েরিয়াস নোটিশের যোগ্য একথা যাদের একবারও মনে হয়নি তাবা নড়ে বসল।

দৈনিক কাগজে, সর্বাধিক বিকৃত দৈনিকে, বিখ্যাত ছদ্মনামে, ত্রিপাঠী লিখল:

যেদৃশ্যে ভ্রমরের বেশে স্বতনুকা সেন গোবিন্দলালরূপে নবারুণ-কুমারেব পায়ে পড়েছে সেদৃশ্যে শ্রীমতী সেনকে মৃগীরোগী বলে মনে হয়েছে। তিনি পড়ে মেঝেয় গড়াগড়ি দিতে গিয়ে তাঁর পায়েব আঙ্গুল কামড়াচ্ছিলেন। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্যেব সবই দর্শকচমৎকৃতকার্য বটে, তবে বাস্তবজীবনে অসঙ্গত। মনোহর মিথ্যায় মাত্র পর্যবসিত।

স্বতনুকা সেন তখন বোম্বায়ে। সেখান থেকে তাঁর নির্দেশে অ্যাটর্নি লাইবেলের মামলায় হুমকি দিল দৈনিক কাগজের মালিক দিবাকর মজুমদার এবং ছদ্মনামী লেখক নিকুঞ্জ ত্রিপাঠীকে। মামলা উঠল নভেম্বরে। মিস্টার জাস্টিস উপাধ্যায়ের কোর্টে। কাগজের পক্ষে বামদেব চৌধুরী, সমালোচকেব হয়ে দাঁড়ালেন অরুণাভ দত্ত। মামলার মূল নিষ্পত্তির বিষয় হলো, এই সমালোচনা ন্যায্য হয়েছে কি না। যদি, সমালোচনায় যা বলা হয়েছে, ছবির পর্দায় তা ঘটে না থাকে, তাহলে তা 'fair comment' হয়নি; তাহলে তা হয়েছে, 'misstatement of fact'।

স্বতনুকা সেন তার প্লেন্টে বলেছে যে সে মেঝেয় পড়ে গেছে কিন্তু গড়ায়নি, তার পায়ের নখ কামড়ায়নি এবং এমন কিছু করেনি

যাতে মৃগীরোগী বলে কেউ মনে করতে পারে। মেঝেয় পড়া মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের দৃশ্যটি ফেড আউট করে, ফলে কারুর পক্ষেই ওই মন্তব্য করা সম্ভব নয়। বামদেব চৌধুরী অন্যপক্ষে বললেন, সমালোচনাটিকে আক্ষরিক অর্থে ধরলে অন্যায় করা হবে।

বোম্বাই থেকে হাওয়াই জাহাজে উড়ে এলো স্নুতনুকা সেন। তাকে জেরা করবেন কাগজের পক্ষ থেকে বামদেব চৌধুরী—পরবর্তী কালে মিস্টার জাস্টিস চৌধুরী।

আপনি কৃষ্ণকান্তের উইলে আপনার অভিনয় দেখেছেন?

হ্যাঁ।

আপনার একবারও স্ট্রাইক করেনি যে, যেদৃশ্যে আপনি মেঝেয় পড়ে গিয়েছিলেন সেদৃশ্যে লোকে ভাবতে পারে আপনি আপনার পায়ের আঙুল কামড়াচ্ছিলেন?

মৃগীরোগী হলে তবেই কেউ এমন উদ্ভট কিছু ভাবতে পারে—

এই সমালোচনায় আপনি পড়েছেন যে নবারুণ-কুমার বাঘের মতো পায়চারি করছিলেন বলে লেখা হয়েছে। তার মানে কি আপনি বলতে চান যে বাঘের পোশাক পরে নবারুণকুমার তার লেজ ঝাপটাচ্ছিল?

না। ওরকম মানে করলে তা অস্বাভাবিক হতো। কিন্তু আমাকে মৃগীরোগী বলা হয়েছিল—

মিস্টার জাস্টিস উপাধ্যায় ইণ্টারভিন করলেনঃ আপনি বলতে চাইছেন যে সমালোচকের মতে আপনি মৃগীরোগী যেমন করে, তেমনই করেছিলেন?

হ্যাঁ। কিন্তু আমি পায়ের আঙুল কামড়াতাম না কখনই—

বামদেব চৌধুরী গলা চড়ালেন একটুঃ পায়ের আঙুল চুলোয় যেতে দিন—

না। স্নুতনুকা সেন গোঁ ছাড়ল নাঃ না। ওই কথাতেই আমার আপত্তি—

যদি বঙ্কিমচন্দ্র লিখতেন ভ্রমর মৃগীরোগীর মতো ইত্যাদি,—অভিনয় করতেন ?

না।

এই সময় সেদিনকার মতো সুতনুকাকে ফার্দার জেরা মুলতুবি রইল। সুতনুকা সেনের জরুরী অ্যাপয়েন্টমেণ্টের জন্যে।

পরের দিন বামদেব চৌধুরী একেবারে অন্যদিক থেকে আক্রমণ শুরু করলেন: মিস সেন, আপনি রাস্তায় দৈনিকের বিজ্ঞাপন দেখেছেন? বড় বড় পোস্টার পড়েছে কাগজের বিরুদ্ধে বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রীর মানহানির মামলা ?

না।

এধরনের বিজ্ঞাপনে আপনাদের বাজারদর বাড়ে ? না ?

না। মনে হয় না—এধরনের বিজ্ঞাপনে অন্তত নয়।

এ রিভ্যু পড়ে আপনাকে কেউ যা মনে করত, তার চেয়ে খারাপ কিছু মনে করতে পারে ?

ক'জন পড়েছে এই রিভ্যু তাই আমি জানি না। আমার এক বন্ধু এই রিভ্যুটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে,—কোর্টকে এই সময় জানায় সুতনুকা। তাতে জজ বলেন যে সাধারণত বন্ধুরাই কেউ এধরনের ভূমিকায় অগ্রণী হয়।

আপনার বন্ধুরা কেউ এ রিভ্যু সম্পর্কে খারাপ ধারণা করেছে ?

সবাই ও প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলে। তবে এটা ঠিক যে যেকেউ ও রিভ্যু পড়ে নিশ্চয়ই ভাবতে পারে যে একজন মেয়ে নিদারুণ বিকৃতি প্রদর্শন করেছে অভিনয়ের নামে—

আপনি মামলা করেছেন কেন ? ড্যামেজ চান, না ক্ষমাপ্রার্থনা করাতে চান ?

লোকের কাছে প্রমাণ করতে চাই যে সমালোচনায় যা বলা হয়েছে আমার অভিনয়ে তা ছিল না—

অর্থাৎ প্রমাণ করতে চান যে সমালোচক ভুল করেছেন ?

হ্যাঁ।

আপনি যে একজন সু-অভিনেত্রী তার জন্যে সাক্ষী ডাকতে চান কি আদালতে?

সেজন্যে নয়। আমি কোনও বিকৃতি প্রদর্শন করিনি, তাই প্রমাণ করতে চাই—

আপনি রোলটা যেমন করা উচিত তেমনই করেছিলেন,—এই বলতে চান?

হ্যাঁ।

আপনার ওই দৃশ্যের অভিনয়ে কেউ যদি মনে করে আপনি মেঝেয় পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন,—সে কি ভুল করবে?

আমি মেঝেয় গড়াগড়ি দিইনি—

মেঝেয় পড়ে গেছিলেন?

পড়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু মেঝেয় গড়াগড়ি দিই নি—

একজন সমালোচক লিখেছেন চৌকি থেকে পেছন মুখ করে আধো চেতন আধো অচেতন ভাবে আপনি পড়ে গেছিলেন?

না।—মনে হয় না ওরকম কিছু করেছিলাম।

কি রকম ভাবে পড়েছিলেন তবে?

যেমনভাবে লেখা ছিল চিত্রনাট্যে,—চৌকিতে বসেছিলাম, সেখান থেকে মেঝেয় পায়ে পড়েছিলাম গোবিন্দলালের—

আপনার কি মনে হয় না যে, সমালোচক কেবল এইটুকুই বলতে চেয়েছিলেন যে আপনি বাড়াবাড়ি করছেন অতিবাস্তব করতে গিয়ে ওই দৃশ্যকে?

না। কোনও মেয়ে যদি তার নিজের পায়ের আঙুলের নখ কামড়ায় তাকে বাড়াবাড়ি বলে না। তাকে অত্যন্ত বিকৃত মনোভাবের পরিচয় দেওয়া বলে—

ক্ষেপে যাওয়া বেসামাল মৃগীরোগী বললে নাট্যসমালোচনায় তার মানে কি দাঁড়ায়?

মানে দাঁড়ায়, আমি অস্বাভাবিক আচরণ করেছি, বদ্ধ উন্মাদের মতো—

জাস্টিস উপাধ্যায়ঃ কামড়ানোকে আমি পাগলের কাণ্ড বলেই মনে করি—

ব্যারিস্টার চৌধুরীঃ কোনও উকিল যদি নির্দেশ মতো মামলা না চালায় এবং কেউ যদি বলে যে সে উকিল গর্দভের মতো আচরণ করেছে তাহলে কি তা মানহানিকর হবে?

সুতনুকা সেনঃ আমাকে যদি ত্রিপাঠী বলতেন যে আমি গর্দভের মতো আচরণ করেছি তাতে আমার কিছু এসে যেত না—

ব্যারিস্টার চৌধুরীঃ মিস সেনের এই স্বীকৃতি ভবিষ্যৎ-সমালোচকদের কাজে লাগবে—

নিকুঞ্জ ত্রিপাঠীর পক্ষের ব্যারিস্টার অরুণাভ দত্ত উঠলেন এবার। সুতনুকাকে জেরা করবার আগেই ব্যারিস্টার দত্ত, নিকুঞ্জ ত্রিপাঠী সুতনুকা সেনের অন্যান্য ছবিতে যেসব অভিনয়ের প্রশংসা করেছিল সেগুলি পড়লেন। সুতনুকা জানাল, তার একটিও সে পড়েনি। মিস্টার জাস্টিস উপাধ্যায় কোনও মুহূর্তই বৃথা যেতে দেন না। তিনি মন্তব্য করলেন: না পড়বারই কথা। কারণ বন্ধুর প্রশংসার কথা পেলে বন্ধুরা দেখা গেছে প্রায়ই চেপে যায়—।

সুতনুকা সেন আদালতকে তার বক্তব্য জানাল। তার ধারণায়, নিকুঞ্জ ত্রিপাঠীর এই সব লেখার কারণ আছে। কারণ আর কিছুই নয়, কারণ কেবল এই যে, এর আগে যিনি ত্রিপাঠীর জায়গায় ছবির সমালোচনা করতেন ওই দৈনিকে তিনি সুতনুকা সেনের অভিনয়ের দারুণ অনুরাগী ছিলেন। কৃষ্ণকান্তের উইলের আগে রবীন্দ্রনাথের গোরা-য় সুচরিতার ভূমিকায় সুতনুকার অভিনয়কে তিনি সাংঘাতিক নন্দিত করেন। ত্রিপাঠীর সুতনুকাকে মৃগীরোগী প্রতিপন্ন করার প্রয়াসের তাই হলো প্রধান উৎস।

কিন্তু সুতনুকা যখন বলল সুচরিতার ভূমিকায় তার অভিনয়

অভিনন্দিত হলে সেটি প্রচার-পুস্তিকায় ছাপা হয়েছিল, তখনই বাঘের মতো লাফিয়ে পড়লেন নিকুঞ্জ ত্রিপাঠীর পক্ষে ব্যারিস্টার অরুণাভ দত্ত ঃ

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সমালোচকরা আপনাদের প্রশংসা করলে তা সঙ্গে সঙ্গে ছাপেন, কিন্তু দোষ ধরলেই তা মানহানির মামলা—?

শুকনো ঠোঁটটা জিব দিয়ে চাটা ছাড়া সুতনুকার আর কিইবা করবার ছিল তখন? সুতনুকা তাই করলো বার দুয়েক। তারপর কোনও রকমে বার করলো গলা দিয়ে একটা ছোট্ট প্রায় অস্ফুট,—'না'—। দ্যাটস ওল।

অরুণাভ দত্ত এবার কামানের মুখ খুললেন ঃ নিকুঞ্জ ত্রিপাঠীর আগে যিনি আপনার অভিনয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন, তিনি আপনার সম্পর্কে লিখছিলেন—"ছায়াচিত্রাভিনয়ের সীমা অতিক্রম করে মাত্রাতিরিক্ত অভিভূতির প্রদর্শনে শ্রীমতী সেনকে কিঞ্চিৎ ভালগার মনে হয়েছে।"—মনে পড়ছে?

না।

তিনি আরও বলেছিলেন যে, সুতনুকা সেন বইতে সৃষ্ট চরিত্র পর্দায় নতুন করে সৃষ্টি করেন। শ্রীমতী সেনের মধ্যে থেকে আপনা-আপনি বেরিয়ে আসে অন্য এক সত্তা—

ঠিক বলেছেন তিনি—

আপনার অভিনয় সম্পর্কে আরেকজনের মত শুনুন ঃ বাঘিনীর মতো লাফিয়ে পড়লেন শ্রীমতী সেন; পাশবিক আবেগের প্রতিমূর্তিরূপে প্রতিভাত হলেন আমার চোখে—

মিস্টার জাস্টিস উপাধ্যায়ের ধারালো জিভ লকলক করে উঠল ঃ দেখা যাচ্ছে, উপমার জন্যে সমালোচক মাত্রই চিড়িয়াখানার শরণ নেন—

বামদেব চৌধুরী কনক্লুড করলেন এই বলে যে কৃষ্ণকান্তের উইল ছবিটি আবার রিলিজ করতে হবে বলে মনে হচ্ছে—

সুতনুকা সেনের হয়ে সাক্ষীর সংখ্যা কম হল না। বিখ্যাত অভিনেত্রী তন্দ্রাবতী তাঁর মত দিলেন সুতনুকার অভিনয় সম্পর্কে: সুতনুকার মানসিক বিপর্যয়ের অভিব্যক্তি অপরূপ বলে মনে হয়েছে ওই দৃশ্যে। বাড়াবাড়ি করেনি সে। বরং স্থূলতাকে পরিহার করেছে এলিমিনেট করে নিজের ব্যক্তিসত্তা। খাট থেকে মেঝেয় পড়েছে সুতনুকা, পড়া দেখে মনে হয়েছে সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না তখন। কোনও মেয়ে যার মনের ভাব এমনই ভয়াবহ, সে কখনও মৃগীরোগীর মতো ব্যবহার করতে পারে, আমি বিশ্বাস করি না, —প্রচুর মদ খেয়ে শুটিং না করলে—

বামদেব চৌধুরী: সমালোচকরা এরকম বিচিত্র উক্তি করে থাকেন না মাঝে মাঝে?

তন্দ্রাবতী: সমালোচকদের এ রকম উক্তি সম্পর্কে আদালত কি আমার অভিমত চাইছেন?

বামদেব চৌধুরী: আপনি কি জানেন যে আপনার সম্পর্কে একবার লেখা হয়েছিল যে তন্দ্রাবতীকে রাণী লছমীর ভূমিকায় একটি দৃশ্যে গেলাস হাতে ঝি-ঝি মনে হচ্ছিল?

মিস্টার জাস্টিস উপাধ্যায়: এ লেখাটা কার?

চৌধুরী: দীপ্তেন সান্যালের—

জাস্টিস উপাধ্যায়: ওঃ।

বামদেব চৌধুরী আবার বলেন: ওই একই সমালোচক একবার ওই একই অভিনেত্রী সম্পর্কে বলেন যে একটি দৃশ্যে তাঁকে সমালোচকের ডাকবাক্স বলে ভুল হয়েছিল; ইচ্ছে হয়েছিল সমালোচক একটি চিঠি ফেলে দেন সেখানে—

তাহলে গলার মধ্যে চিঠি গুঁজে দিতে হতো।—উপাধ্যায়ের প্রত্যুক্তি পত্রপাঠ।

এরপর একজন মৃগীরোগী-বিশেষজ্ঞ সাক্ষ্য দিলেন। বললেন: সুতনুকার অভিনয়ে কোথাও মৃগীরোগীর ভূমিকা ছিল না।

আদালতে নাটক জমে উঠল এর পরেই। বিখ্যাত প্রযোজক কুমারকান্তি মিত্র দাঁড়ালেন সাক্ষীর কাঠগড়ায়। বামদেব চৌধুরী পেরে উঠলেন না তাঁর সঙ্গে।

বামদেবঃ ওই বিশেষ দৈনিকের ওপর আপনার একটু ঝাঁঝ আছে? তাই না?

কুমারকান্তিঃ একটু নয়, বিশেষ ঝাঝ আছে।

বামদেবঃ নিকুঞ্জ ত্রিপাঠীর ওপরেও?

কুমারকান্তিঃ অনেক বেশী—

বামদেবঃ আপনার কানে এলো যখন কথাটা, যে ওই দৈনিক এবং ত্রিপাঠীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা হতে পারে, তখন না কি আপনি সোল্লাসধ্বনি করে ওঠেন, শোভানাল্লা বলে!—সত্যি?

না। আমি খুশি হলে বলে উঠি, হা-হা! শোভানাল্লা তো আপনার উল্লাসধ্বনি? তাই না?

জাস্টিস উপাধ্যায়ঃ কী করে জানলেন?

কুমারকান্তিঃ ওঁর লেখা একটি চিত্রনাট্যে পড়েছিলাম—

উপাধ্যায়ঃ আপনি চিত্রনাট্যকার মিস্টার চৌধুরী?

কুমারকান্তিঃ আমাকে ওঁর দুখানা চিত্রনাট্য পাঠিয়েছিলেন ছবি করার জন্যে—

উপাধ্যায়ঃ আপনি নিয়েছিলেন সে চিত্রনাট্য?

কুমারকান্তিঃ না। ওয়েস্ট পেপার বাসকেটে ফেলে দিয়েছিলাম—

সুতনুকা সেনের পক্ষের ব্যারিস্টার এতক্ষণে মুখ খোলেনঃ খুশি হলে মিস্টার বামদেব চৌধুরী 'শোভানাল্লা' বলে চীৎকার করে ওঠেন! বেকায়দায় পড়লে চৌধুরী কি স্বগতোক্তি করেন শোনবার জন্যে কান পেতে রইলাম।

কুমারকান্তি মিত্রের মোদ্দা কথা এর পর জানা গেল। তাঁর মতে, নিকুঞ্জ ত্রিপাঠীর সমালোচনা গঠনমূলক নয়।

গঠনমূলক সমালোচনা কাকে বলেন আপনি ? জানতে চাইলেন আদালত।

যে সমালোচনা আমার ভুল দেখিয়ে দেয় এবং কি করলে ভালো হয় তাই বলে—

মিস্টার জাস্টিস উপাধ্যায় এবার আপসকারীর ভূমিকা নেন : এ মামলা আর কদিন চলবে ?

সুতনুকার ব্যারিস্টার বলেন : ক্ষমা চাইলেই মিটে যায়—

বামদেব চৌধুরী : সে কথা তো একবারও বলেননি আপনি—

এখন বলছি—।

শেষ পর্যন্ত দৈনিক কাগজে বেরুল যে সমালোচনায় যদি সুতনুকা সেন দুঃখ পেয়ে থাকেন তাহলে তাঁরা অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্যে মার্জনা চাইছেন।

কোর্ট থেকে মামলা জিতে বাড়ি ফিরে যাকে বসবার ঘরে দেখতে পেল তার জন্যে সুতনুকা তৈরী ছিল না। নিকুঞ্জ ত্রিপাঠী বসে আছে।

আপনি ? শত্রুপক্ষের শিবিরে ?—যতখানি সপ্রতিভ অভিনয় করা যায় তাই করে সুতনুকা সেন জিজ্ঞেস করল।

জাত-সমালোচক আর জাত-শিল্পী কখনও কেউ কারুর শত্রু নয়। দে আর বেস্ট অব প্যাল্স্। তারা দুজনেই স্রষ্টা—।

হাত বাড়িয়ে দেয় নিকুঞ্জ ত্রিপাঠী। সে হাত না ধরে উপায় থাকে না সুতনুকার। নিকুঞ্জ দেখে, সুতনুকার হাত কাঁপছে।

একটু জোরে চাপ দেয় সুতনুকার হাতে নিকুঞ্জ ত্রিপাঠীর হাত।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সুতনুকা সেন হাসে। সেই আশ্চর্য সেক্সী হাসি। পুরুষের শরীর যা মুহূর্তে গরম করে দেয়। নিকুঞ্জ ত্রিপাঠীর বুকে হাতুড়ির ঘা পড়তে শুরু করে দিয়েছে। সুতনুকা সেনের অ্যাবসেন্সে তার সম্পর্কে লেখা যায়,—মৃগীরোগী বলে মনে হয়েছে শ্রীমতী সেনকে। সুতনুকার সামনে বসে ভাবা পর্যন্ত যায় না কোনও

কথা। নিজের দুরবস্থা মৃগীরোগীর চেয়ে কিছু কম ভয়াবহ মনে হয় না! লাল শাড়ী, লাল ব্লাউস, কানে লাল দুল। হাতে লাল ভ্যানিটি ব্যাগ, ঘরের পর্দা থেকে আসবাবের ঢাকা লাল। লজ্জার আর রক্তের মতো টকটকে লাল। নিকুঞ্জ ত্রিপাঠীকে দেখে সুতনুকা হাসে। দেওয়ালের টিকটিকি কাচ-পোকাকে উড়তে দেখে যেমন হাসে। হাসিমুখেই জিজ্ঞেস করে সুতনুকাঃ কি ড্রিংক দেবে আপনাকে?

ড্রিংকের দরকার হবে না, নিকুঞ্জ নর্মাল হবার চেষ্টা করেঃ এমনিতেই নেশা লাগছে—

আমার একটুও লাগছে না, স্টেল লাগছে ভীষণ, দাঁড়ান আসছি—সুতনুকা বেরিয়ে যেতে নিকুঞ্জ ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল। রেডিও চলছিল ঘরে। পল্লীমঙ্গল আসরে নাটক হচ্ছিল কোনও। বাঁশির বাজনা বাজছিল নাটকের আবহসঙ্গীত হিসেবে। নিকুঞ্জ রেডিওর নব ঘুরিয়ে তার মুখ চাপা দিল।

বেডরুমে বিছানার পাশে সুতনুকার কনফিডেনশ্যাল টেলিফোন। সেই ফোনে সে নবারুণকুমারকে ডাকল। টেলিফোনের অপর প্রান্তে নবারুণ হাতে স্বর্গের চাঁদ পেলঃ কার মুখ দেখে আজ উঠেছি?

শোবার ঘরে তোমার আয়না নেই?—সুতনুকা ন্যাক সাজে।

আছে। মস্ত বড় আয়না—

তাহলে আজ কার মুখ দেখে উঠেছি—প্রশ্ন করছ কেন? ম্যাটিনি আইডলের মুখ দেখে উঠেছ আজ। মনে মনে সুতনুকা বলে সম্পূর্ণ অন্য কথা। মনে মনে বলে, তাহলে, মেনিমুখো কারুকে দেখে উঠেছ আর কি.

রসিকতা করছ?

তোমার সঙ্গে রসিকতা করব? না। স্বয়ং বররুচি বারণ করে গেছেন—

বররুচি কে আবার ?—নবারুণকুমার ঘাবড়ায়।

ও কেউ নয়, একজন রাশ্যান অ্যাক্টোনটের নাম—

তাই বলো, আমি ভেবেছিলাম—

আর কেউ উড়ে এসে জুড়ে বসেছে তোমার জায়গায় ?

না, না—

নাগো বোকা ছেলে, সুতনুকার মনে তোমার জায়গা চিরকালের, কেউ কেড়ে নেবে না—

নবারুণকুমার কি বলবে ভেবে পেল না। আর সেই অবসরে সুতনুকা আসল কথাটা বলল ঃ

একবার চলে এস তো চট করে ?

এখনই ?

এখনই—

কোথায় ?

আমার এখানে—

এ ঘরে ফিরে এল যখন, তখন নিকুঞ্জ ত্রিপাঠী একা নয়, ব্যারিস্টার বামদেব চৌধুরী এসেছেন। এবং একটু বাদে এলেন মিস্টার জাস্টিস উপাধ্যায়। ত্রিপাঠী, চৌধুরী, উপাধ্যায় একসঙ্গে এসে পড়ে একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন প্রত্যেকেই। সুতনুকা শুধু নির্বিকার। নবারুণকুমার আসতেই বলল,—এই শোনো, কৃষ্ণকান্তের উইলের ওই গোবিন্দলালের পায়ে পড়ার সিনটা এঁদের একটু করে দেখাব,—গেট রেডি—

নবারুণকুমার নার্ভাস হয়। ও সিনে তার করবার কিছু নেই। কাঠের পুতুলের মতো কেবল দাঁড়িয়ে থাকবার আছে। এতগুলি ডিসটিংগুউইশড্ দর্শকের সামনে সুতনুকা প্রমাণ করে দেবে যে নবারুণকুমার কিছু নয়, সুতনুকাই সব। এতক্ষণে তার নিরেট মাথায় সুতনুকার টেলিফোনের আসল মর্ম প্রবেশ করে। এরই জন্যে আয়না, ম্যাটিনি আইডল ইত্যাদি বলেছিল সুতনুকা সেন। কিন্তু

এখন আর ভেবে লাভ নেই। কল পাতা হয়নি কেবল ; সে কলে ইঁদুর ধরা পড়েছে যথারীতি।

ডিসটিংগুউইশ্‌ড্‌ গেস্টদের অবস্থা আরও শোচনীয়। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে মিস্টার জাস্টিস উপাধ্যায়ের। বামদেব চৌধুরীর গণ্ডদেশ থেকে থেকেই বেগুনে হচ্ছে। নিকুঞ্জ ত্রিপাঠীর ওপরই তাদের রাগ হয়। ব্যাটাচ্ছেলে মরতে এখানে না এলে এভাবে বলির পাঁঠার মতো ওই সঙ্গে তাঁদেরও মরতে হতো না।

একটু বাদে এই মামলার অন্য পাত্ররাও এসে হাজির হলো। বোঝা গেল স্বতনুকা ফোনে ডেকে এনেছে সবাইকে। স্টেজ সেট ফর মেকিং ফান অব জাস্টিস—এ বার্তা আর অগোচর রইল না ঘরের টিকটিকিটারও।

কিন্তু তবুও। তবুও একটু বাদে উপাধ্যায়, চৌধুরী এবং প্রভৃতিদের মনেও রইল না যে তাদের অপ্রস্তুত করবার জন্যেই এ আয়োজন। অন্য পৃথিবীতে উত্তীর্ণ হলো তারা। সেই একই সূর্যাস্তের মতো রাঙাবাস পরা স্বতনুকা পার্ক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে কোনও দৃশ্যসজ্জা, লাইট, সাউণ্ড ক্যামেরা ছাড়া শুটিং করে গেল। মুহূর্তের মধ্যে উঠে এল কৃষ্ণকাণ্ডের উইল থেকে একটি পাতা। চৌকি থেকে মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল ভ্রমর গোবিন্দলালের পায়ে। একটি কি দুটি কথা বড় জোর।

জাস্টিস উপাধ্যায়েব মনে হলো, বঙ্কিমচন্দ্র বেচে থাকলে উপলব্ধি করতেন স্বতনুকা সেনের জন্যেই ভ্রমরের জন্ম হয়েছিল। না। ভ্রমরের জন্যেই জন্ম হয়েছিল স্বতনুকা সেনের।

দর্শক-নিষ্ক্রান্ত প্রেক্ষাগৃহের চেহারা ভারি করুণ। ভয়ঙ্কর অর্থহীন। সবাই একে একে বেরিয়ে যাবার পর তীব্র অবসাদে একা সুতনুকার ভয় করতে লাগল। সাফল্যের উত্তেজনায়, প্রতিপক্ষের মুখ মাটিতে রগড়ে দেবার খুশির বেলুন মুহূর্তে চুপসে এতটুকু হয়ে গেছে। এখন যদি সেই ঘরে দৈবাৎ কোনও দর্শক ঢুকে পড়ে তাহলে সে বলবে সুতনুকা হোক যত বড় অভিনেত্রী, সবটাই তার অভিনয় নয়। গ্রীনরুমে মেকাপ তোলা অবস্থায় ম্যাটিনি আইডলকে দেখবার দুর্ভাগ্য যদি কারুর হয়ে থাকে তবে কেবল সেই বুঝবে এখন সুতনুকা হচ্ছে মুখোস। মুখ হচ্ছে ঝুমার। সেই ঝুমা বস্তি থেকে যে আইসোলা বেলায় পৌঁছে গেছে প্রায়। পৌঁছে গিয়ে এখন শুরু হয়েছে আরও কিছু হতে না পারার যন্ত্রণা। শুধু সাফল্য, শুধু অর্থ, শুধু খ্যাতি, মানুষকে মেসিন করে, সর্বদাই মুখোস এঁটে থাকতে বাধ্য করে। তার বেশি কিছু করে না। একা, ভয়াবহ রকমে একা হলেই, একটা ভয়ঙ্কর চিন্তা ভূতের মতো ভর করে সুতনুকার ওপর। পঞ্চুর সঙ্গে বোম্বে যাবার সময়ে ঝগড়া হয়েছিল ঝুমার।

পঞ্চু বলেছিল ঃ তুমি বোম্বে যেও না ঝুমা—

কেন ?

ও জায়গা অভিনয়ের জন্যে নয়, পয়সা রোজগারের জন্যে।

পয়সা চাই না ?

চাই। কিন্তু শুধু অর্থ তোমাকে কি দেবে ?

সামর্থ্য দেবে। কমফর্ট দেবে। কনফিডেন্স দেবে।

কোনটার অভাব তোমার আজকে ?

ও অভাব কখনও মেটে না। যার মেটে সে আর বেঁচে নেই—

জীবনে ঘর বাঁধার, ছেলেপিলের মুখ দেখার, মা হবার প্রয়োজন নেই কোনও ?

শিল্পীর নেই। পর্দার জীবনই আমার জীবন। পর্দায় মা সাজাই আমার যথেষ্ট—

সে তো অভিনয়—

আমি তো অভিনয়-শিল্পী-ই। অভিনয়ই আমার জীবন। জীবনের চেয়েও সত্য—

এ তো স্থতনুকা সেনের কথা। আমি ঝুমার কথা শুনতে চাইছি—

ঝুমা ম... ভূত হয়ে গেছে সেই মুহূর্তে, যে মুহূর্তে জন্ম নিয়েছে স্থতনুকা সেন—

যেদিন স্থতনুকা সেন যা যা চেয়েছে জীবনে তাই তাই পাবে সেদিন কি করবে সে ?

তার এখন দেরি অনেক,—

আমি সেইদিনের জন্যে অপেক্ষা করব,—বলে পঙ্কু বেরিয়ে গিয়েছিল। এক মুহূর্ত দাঁড়ায়নি আর।

পঙ্কুর মুখে সব শুনে দুলাল বলেছিল : তুমি পুরুষ মানুষ নও ; তুমি মেয়েমানুষেরও অধম—

কেন ?

আমি হলে ঝুমাকে যেতে দিতাম না, গায়ের জোরে আটকাতাম নিজের জিনিসকে যে অপরের হাতে তুলে দেয় সে আবার কেমন ব্যাটা ছেলে ?

বোম্বেতে পা দিয়েই সুতনুকা বুঝেছিল পঞ্চুর কথা সাংঘাতিক সত্যি !

বোম্বেতে মানুষ নেই, আছে মেসিন। আর্ট নেই, শুধু ইনডাসট্রি। এরা সারাক্ষণ স্বপ্ন দেখে শুধু টাকার। টাকাই শিরায় রক্ত, ফুসফুসে বাতাস দিচ্ছে, চোখে দেখবার, কানে শোনবার, নাকে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেবার ও ফেলবার শক্তি জোগাচ্ছে। জীবনের যুদ্ধে টাকাই জেতাচ্ছে হারাচ্ছে। একটা পাঁচ টাকার নোট দশটাকার নোটকে হিংসে করে ; দশটাকার নোট একশো টাকার নোটকে ; একশো টাকার নোটেরও ঈর্ষা হাজার টাকার একখানা নোটকে। রক্তাক্ত ডুয়েল চলছে টাকার মঞ্চে। যখন তখন যেখানে সেখানে। টাকাই বোম্বের কাব্য, তার সঙ্গীত, তার নৃত্যকলা। শেয়ার মার্কেট বোম্বের কুরুক্ষেত্র। রথী-মহারথী হচ্ছে লাখপতি আর মিলিওনেয়ার। এরাও মেঘের আড়াল থেকে লড়াই করে। কৃষ্ণবর্ণ সেই মেঘের আধুনিক নাম, কালো টাকা। কার কত কালো টাকা এবং কার টাকা কত কালো তা বলা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। এদের নিজেদের পক্ষেও অসম্ভব অনেক সময়েই।

সেই পৃথিবীতে পা দিয়েই সুতনুকা সেন বুঝল যে—সে সাপের গর্তে পা দিয়েছে। বোম্বের ফিল্ম ওয়ার্ল্ড, বিশেষ করে সেখানকার যারা আলেয়া, অর্থাৎ বাঁধা হিরোইন যারা, তারা এই আলোকে সহ্য করতে পারবে না জেনেই আগে থেকেই তৈরী হয়েছিল হেসে গড়িয়ে পড়বার জন্যে সুতনুকার হিন্দি উচ্চারণ শুনে। প্রথম দিন শুটিং-এর প্রথম ঘণ্টা শেষ হবার আগেই সুতনুকার হিন্দি ডায়ালগ মুখের হাসি ঠোঁটে দেখা দেবার আগেই বলল : হলট। সে হাসির কুসুমের কুঁড়িতেই কবর হয়ে গেল। দ্বিতীয় ধাক্কা এল, একটি দৃশ্যে সুতনুকার সাজ নিয়ে। প্রায় ল্যাংটো পোশাকে সে দৃশ্যে নামবার প্রস্তাব স্ক্রিপ্টে ছিল না। শুটিং করতে এসে সুতনুকা যখন শুনল সেই অভিনব সাজের কথা তখন সে বলল এ-রোলের জন্যে এ-পোশাক নিতান্তই

অপ্রয়োজনীয়। সাজে তার আপত্তি নেই, তার আপত্তির কারণ ঠিক জায়গায় ঠিক সাজ হচ্ছে না বলে। এ কেবলই সেক্স অ্যাপিলে বাজি মারবার কারণে কল্পিত। ডিরেক্টর শিকন্দর সিং তালিব ক্ষেপে গেল। লাল কাপড় দেখে যেমন তেড়ে যায় শিং নেড়ে পাগলা ষাঁড় তেমনই চার্জ করল সুতনুকা সেনকে স্থানকাল বিস্মৃত হয়ে সকলের সামনে লাইট অন করা স্টুডিও ঃ ফ্লোরেই এ-ছবির ডিরেক্টর আমি না আপনি ?

এ ছবির আদৌ কোনও ডিরেক্টর আছে বলে আমার মনে হচ্ছে না।

আমি যদি বলি এই পোশাকে আপনাকে আসতে হবে ফ্লোরে আপনি সেকথা শুনতে বাধ্য কি না ?

আপনি যদি আমাকে তিনতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে মরতে বলেন তো তা শুনতে কেউ বাধ্য নয়—

এ দুটো আদেশ কি এক ?

ঝাঁপ দিয়ে পড়ার চেয়েও আপনার রুচি মাফিক কাপড় পড়ার আদেশ অনেক বেশি খারাপ ; ঝাঁপ দিয়ে পড়লে বাঁচবার আশা আছে। ওই কাপড়ে ছবিতে নামলে আমার কেরিয়ার-এর বাঁচবার আশা নেই—

এর চেয়েও কম জামাকাপড় পরে অনেককেই ছবিতে নামতে হয়, কই তারা তো আপত্তি করে না,—

তাদের কিছু এসে যায় না, কারণ কিছু না পরে নামলেও তাদের দিকে কেউ তাকাবে না,—সুতনুকা সেন কথা বলার সঙ্গে তার ঘন কালো বড় একজোড়া চোখ অন্য মেয়েদের অপাঙ্গ প্যান করে আসে।

প্যাক আপ,—দুটি কথা কোনওরকমে মুখ দিয়ে বেরোয় রাগে আপেল হয়ে যাওয়া গণ্ডদেশ, তালিবের। শুটিং শেষ হয়, যুদ্ধ শেষ হয় না, ডিরেক্টর আর ফার্স্ট লেডির।

সমন আসে প্রোডিউসার অর্জুনশঙ্করের কাছ থেকে। জরুরী

তলব। তাজমহল হোটেলের স্যুইট নাম্বার সিক্স, তাজমহলের লেটেস্ট ও বেস্ট স্যুইটে দেখা হয় সুতনুকার সঙ্গে অর্জুনের। দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে দেখে। তৃতীয় কেউ উপস্থিত থাকলে তার মনে হতো, ছবিতে প্রথম দেখা হচ্ছে বুঝি নায়ক এবং নায়িকার। সুতনুকা তার বিখ্যাত লাল সোয়েটারে গিয়েছিল রীতিমতো গরমের মধ্যেও। চুল তৈরি করে গিয়েছিল টাবার্ন স্টাইলে। ক্রিমরঙের একটা পাঞ্জাবিতে অর্জুনের, ঝকমক করছিল চারটে হীরে। চুড়িদার আর কাজকরা নাগরায় তাকে নেটিভ স্টেটের প্রিন্স বলে মনে না করার কোনও কারণ নেই।

কী দেবে আপনাকে ? সফট ড্রিঙ্ক, না—

হোটেলে কিছু খাইনে আমি, থ্যাঙ্কস্—

দেন লেট আস কাম ডাউন টু ব্র্যাস ট্যাকস্।

ইয়েস—

ওই গাড়োলটার সঙ্গে আপনার কি নিয়ে লেগেছে ?

কার সঙ্গে বলছেন ?

সরি। আমার ছবির ডিরেক্টর, কী নাম যেন ?

শিকন্দর সিং—

হ্যাঁ। শিং,—একজোড়া শিং-ই ওকে মানায়, কী বলেছে ও ?

কিছু না। একটা পোশাক পরতে বলছেন, যেটার সঙ্গে রোলটার কোনও মিল নেই—

এখানে কোনও ছবিতেই গল্পের সঙ্গে নামের, মুডের সঙ্গে গানের, আর্থিক অবস্থার সঙ্গে সেটসেটিং-এর কিছুবই মিল নেই! শুধু ছবির পর্দায় নয়, রিয়্যাল লাইফেও সব দাঁড়কাক ময়ূর সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে. সারা ভারতবর্ষে বোম্বায়ের মতো সাজানো শহর তাই আপনি আর দুটি পাবেন না—

চুপ করে গেল সুতনুকা অর্জুনের কথা শুনে। লোকটা বাঙালী না কি ?

একটু বাদে স্তব্ধতার বরফ ভাঙ্গে অর্জুনশঙ্করই আবার : এই পোশাকটা পরে নামবার জন্যে আরও কত টাকা নেবেন আপনি? সুতনুকার ভুল মুহূর্তে ভেঙ্গে যায়। লোকটা আর যাই হোক কোনও জন্মে বাঙালী নয়। তার সমস্ত মুখ-চোখ প্রোডিউসারের প্রস্তাবে লাল হয়ে যায়। কুমারী মেয়ের কাছে যেন কোনও বুনো সেই আদিম প্রস্তাব করেছে। সুতনুকা একটু বাদে বলে : কোটি টাকা পেলেও ও পোশাকে নামতে পারব না—

কেন? আপনি বোম্বেতে কিসের জন্যে এসেছেন? টাকা করতে নয়?

না। শুধু টাকার জন্যে আমি কোথাও যেতে রাজি নই।

এখানে টাকা ছাড়া আর কোনও বড় জিনিসের আশা নিয়ে যদি এসে থাকেন তাহলে বলতে পারি মরীচিকায় মুখ থুবড়ে মারা পড়বেন। এক ফোঁটা জলও পাবেন না—

একথা বোম্বে আসবার আগে আমাকে একজন বলেছিল, কিন্তু আমি শুনিনি তার কথা, গায়ের জোরে এসেছিলাম, এখন দেখছি, ভুল করেছি—

আরও ভুল করবেন, রুচি অথবা সেক্স কিম্বা তুচ্ছ লজিকের জন্যে একগাদা টাকা না নিলে। টাকা এখানে পড়ে আছে, শুধু তুলে নেবার জন্যে। যে নেবে না সে ঠকবে—

আপনি কি বলেন আমাকে?

আমি বলি আপনার অভিনয়ের বিচার বোম্বের ছবিতে হবে না, তার জন্যে বাংলা ছবি যথেষ্ট। বোম্বেতে কেউ বিন্দুমাত্র ইনটারেস্টেড নয় জানতে কে কত বড় আর্টিস্ট, এখানে সবাই জানতে চায় কার এখন কত লাখে কণ্ট্রাক্ট হচ্ছে, তার মধ্যে কতটা ব্ল্যাক, কখানা ছবির কণ্ট্রাক্ট কার হাতে আছে—ছাটস ওল—

তাহলে কলকাতা থেকে আমাকে আনালেন কেন?

লোকসান দেব বলে।

লোকসান দেবার জন্যে ছবি করেন না কি আপনি ?

প্রত্যেকবার চেষ্টা করি, একটা পঞ্চাশ লাখের ছবি ফ্লপ করুক, সাঙ্ঘাতিক ফ্লপ,—একবারও করে না। আর সুপার ট্যাক্স দিতে দিতে আমার ব্যবসা লাটে ওঠবার দাখিল। তাই এবার এনেছি কলকাতা থেকে সুতনুকা সেনকে, যদি ফ্লপ করাতে পারি ছবিটা—

আমার পক্ষে কি এটা খুব শ্রুতিসুখকর কথা ?

সুয়া !

কি রকম ?

আপনি আর্টিস্ট বলেই বোম্বের ছবিতে আপনি হিরোইন হলে, তবে সে ছবির ফ্লপ হবার চান্স আছে, নইলে, এ ছবিও লেগে যাবে—

তাহলে আর ও পোশাকে নামবার জন্যে এত টাকা দিতে চাইছেন কেন ?

আপনাকে ও পোশাকে আপনার বেঙ্গলেও খারাপ লাগবে, বোম্বেতেও কেউ নেবে না আপনাকে।

কেন ?

কারণ, বেঙ্গলের আর্টিস্ট এসব করে না, বোম্বের ধারণা এই—

সুতনুকা উঠে পড়ে। হাতজোড় করে বলেঃ মাফ করবেন, এ আমার পক্ষে অসম্ভব—

দাঁড়ান, দাঁড়ান বসুন—অত অধৈর্য হলে ব্যবসা চলে ? শিকন্দরটাকে আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি। নতুন ডিরেক্টর নিয়ে আসছি, তার সঙ্গে একটু মানিয়ে নেবেন দয়া করে। আমি কথা দিচ্ছি, সে আপনাকে ওই পোশাকে নামতে বলবে না ছবিতে—

কিন্তু যদি আরও ইডিয়টিক কিছু বলে—

তার ইডিয়সির দাম আমি দেব, আপনি আরও টাকা পাবেন—

বোম্বের এয়ারকণ্ডিশনড মেরিন ড্রাইভ ফ্ল্যাটে ফিরে সুতনুকা দেখে দুলাল বসে। পঞ্চুর দুলাল।—কী ব্যাপার ? দুলাল চিঠি বার করে দেয়। পঞ্চু লিখেছে, শিকন্দর সিং লোকটা ভয়ঙ্কর পাজি।